শ্রীরাজমালা

। চতুর্থ লহর ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন

শ্রীরাজমালা।

[ত্রিপুর-রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত]

চতুর্থ লহর

সটীক ও সচিত্র

সেনাপতি রণচতুরনারায়ণ কথিত

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত

"প্রজা সুখে সুখী রাজা তদ্দুঃখে যশ্চ দুঃখিত।
ন কীর্ত্তিযুক্তো লোকেহ স্মিন্ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে।।"

— বিষ্ণু সংহিতা।

উপজাতি সংস্কৃতি ও গবেষণা কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার
আগরতলা

শ্রীরাজমালা
(ত্রিপুর-রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত)
চতুর্থ লহর

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জানুয়ারী, ২০০৩
তৃতীয় সংস্করণ ঃ জুন, ২০২০

ISBN : ৯৭৮-৯৩-৮৬৭০৭-৬৩-৫

মূল্য ঃ ৬০০ (ছয়শত টাকা)।

কম্পিউটার টাইপ ও সেটিং ঃ ধ্রুব দেবনাথ

মূদ্রন ঃ কালিকা প্রেস প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

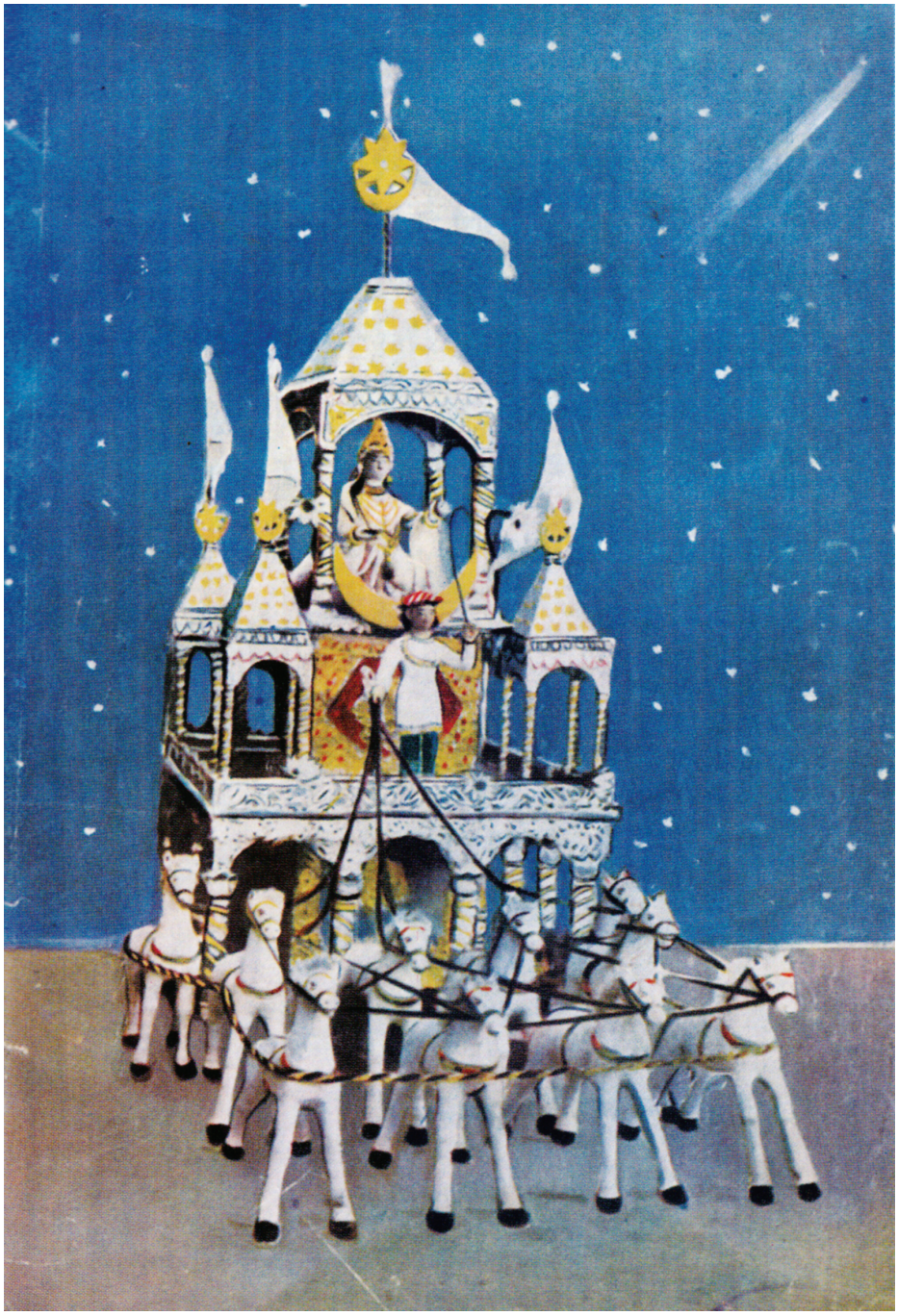

শ্রীশ্রীচন্দ্রমা দেব।
সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ং হস্তমাত্রয়ং সিতাম্বরম্।
শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্।।
দশাশ্বং শ্বেত পদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতম্।
জলপ্রত্যধিদৈবঞ্চ সূর্য্যাস্যমাহবয়েত্তথা।।

দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণের ভূমিকা

শ্রীরাজমালা বা রাজমালা ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন রাজবংশের এই ইতিকথা প্রথম লহর থেকে চতুর্থ লহর সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ রাজাদেশে নিবিষ্টচিত্তে সম্পাদনা করেন। এই মহাগ্রন্থ প্রকাশনার জন্য রাজধানী আগরতলায় রাজমালা কার্যালয় ছিল এবং সেখান থেকে এই মহান গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। রাজ-আমলে এই মহাকাব্যিক রাজ-ইতিহাস জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থান অধিকার করে। পার্বত্য ত্রিপুরাসহ চাকলা রোশনাবাদের রাজভক্ত জনসাধারণের প্রতিটি গৃহে এই গ্রন্থ শোভিত হত। রাজন্যবর্গের এই সুবৃহৎ বিস্ময়কর ইতিহাস শুধুমাত্র রাজাদের কীর্তিকাহিনী নয়, ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের ধারাবাহিক ইতিহাসের ফাঁকে ফাঁকে সমকালীন বৃহত্তর ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসও বর্ণিত হয়েছে এই সুমহান আকরগ্রন্থে, যা চিরকালীন গবেষণার বিষয় হিসেবে দেশে-বিদেশে সমাদৃত হয়ে আছে অত্যন্ত মোহনীয়ভাবে। সেই হিসেবে এই গ্রন্থ অতীব মূল্যবান হিসেবে প্রতিভাত।

ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের অবসানের পর প্রথমবার ২০০৩ ইংরাজীতে এই দুষ্প্রাপ্য সুপ্রাচীন জনপ্রিয় গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং এক সহস্র কপি ছাপানো হয়।

বর্ত্তমানে মুদ্রিত গ্রন্থ নিঃশেষিত হওয়ায় আবারও সুধী পাঠক সমাজের জন্য ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র শ্রীরাজমালার লহর চতুষ্টয় দ্বিতীয়বার পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বর্তমান অংশটি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত শ্রীরাজমালার অসমাপ্ত চতুর্থ লহর।

আশা করি, শ্রীরাজমালার পুনর্মুদ্রিত চতুর্থ লহরখানি সকল অংশের মানুষের প্রত্যাশা পুরণ করতে সমর্থ হবে।

ইতি
ভবদয়ী

২০.০৬.২০২০

(ধনঞ্জয় দেববর্মা)
অধিকর্তা
উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার।

আগরতলা
২০ জুন, ২০২০ইং

শ্রীরাজমালা

(চতুর্থ লহর)

বিষয়— গোবিন্দমাণিক্য হইতে কৃষ্ণমাণিক্য পর্য্যন্তের বিবরণ।
বক্তা— স্বর্গীয় জয়দেব উজীর ও দুর্গামণি উজীর।
শ্রোতা— মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য।
রচনাকাল— খৃঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদ।

॥ ওঁ নমঃ সরস্বত্যৈ ॥

শ্রী রাজমালা

—ঃ০ঃ—

(চতুর্থ লহর)

মঙ্গলাচরণ

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥

❀❀❀❀❀❀

পূর্ব্ব রাজমালা সংশোধন

পুরাতন রাজমালা আছিল রচিত।
প্রসঙ্গেতে অলগ্নিক ভাষা যে কুৎসিত ॥
পুর্ব্ব প্রসঙ্গ পরে পর পূর্ব্বে কত।
সেইত কারণে লোকে নাহি বুঝে যত ॥
ত্রিপুরা রাজ্যের নাম ত্রিপুর যে মতে।
ত্রিপুর রাজার প্রমাণ না লিখিছে তাতে ॥
বারশ আটত্রিশ সন ত্রিপুরা যখনি।
তাহাকে সুধিল (১) পুনি উজীর দুর্গামণি (২) ॥
মহাভারতাদি তন্ত্র করি অন্বেষণ।
প্রমাণ লিখিল তার বেদ নিরূপণ ॥
এহাতে দ্বিরুক্তি যদি কাহার জন্ময়।
পুরাণাদি দর্শিলে যে ঘুচিলে সংশয় ॥

---

(১) পূর্ব্ব রাজমালা সংশোধন করিল।
(২) দুর্গামণি উজীরের পরিচয় 'মধ্য-মণিতে' পাওয়া যাইবে।

পুরাতন রাজমালা আছয়ে বিদিত।
ইহা সঙ্গে মিলাইলে বুঝিবে নিশ্চিত ॥
কল্যাণমাণিক্য পরে যত রাজাগণ।
রাজা সব লিখা গেল, তার বিবরণ ॥
রাধা কৃষ্ণ দুর্গা শিব ব্রহ্ম পরায়ণ।
সরস্বতী ইষ্ট দেব করিয়া স্মরণ ॥
তান ভক্ত পদরেণু মস্তকে করিয়া।
কহিব পাঁচালি ছন্দ (১) তাকে উদ্দেশিয়া ॥

প্রস্তাবনা

জয়দেব উজীর ছিল জ্ঞান কলেবর।
তান হৈল দুই পুত্র এক সহোদর (২) ॥
রাজমণি উজীর জ্যেষ্ঠ ছিল গুণমণি।
দুর্গামণি কনিষ্ঠেতে বলিল আপনি (৩) ॥
গোবিন্দ মাণিক্যাবধি যত রাজাগণ।
কৃষ্ণমাণিক্য মহারাজা করি সমাপন ॥

---

(১) পাঁচালি— ইহাকে 'পাঞ্চালি'ও বলা হয়। প্রাচীনকালে পাঁচজনে মিলিতভাবে সুর সহযোগে যে-সকল পালা গান করিত, তাহাই 'পাঁচালি' নামে অভিহিত হইত। এই পাঁচালি নানা ছন্দে রচনা করিয়া, এক একটি দল বাঁধিয়া গান করা হইত। দলের প্রধান ব্যক্তি চামর হস্তে লইয়া নৃত্য সহকারে গান করিতেন, অপর ব্যক্তিগণ 'দোহার' হইত। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ পাঁচালি শ্রেণীতে পরিগণিত ছিল। দাশরথী রায়, মধুসূদন কাইন, ঘনরাম, কাণা হরি দত্ত, বিজয় গুপ্ত প্রভৃতি অনেক কবি নানা বিষয় অবলম্বনে পাঁচালি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গ ভাষায় পাঁচালি রচনার পদ্ধতি কত কালের, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন ; এই প্রণালী যে পাঁচ শত বৎসরের ঊর্দ্ধকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, মোটামুটিভাবে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। ইহা কোন প্রদেশ হইতে প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল, বর্ত্তমানকালে তাহা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার। কোনো কোনো ভাষাতত্ত্ববিদ্ বলেন, উক্ত প্রণালীর রচনা পদ্ধতি পঞ্চাল দেশ হইতে গৃহীত হওয়ায়, ইহার নাম 'পাঁচালি' বা 'পাঞ্চালি' হইয়াছে। এই কথা অভ্রান্ত কি না, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

(২) জয়দেব উজীরের দুই পুত্র এক মাতৃগর্ব্ভসম্ভুত ছিলেন।

(৩) জয়দেব উজীর স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন।

রামগঙ্গামাণিক্য স্থানে বলিছি পূর্ব্বেতে।
রাজমালা মধ্যাবৃত লিখহ তাহাতে ॥
পিতৃ আজ্ঞা দুর্গামণি বান্ধিয়া শিরেতে।
সেই সব রাজাগণ কহি সাবহিতে ॥

মহারাজা রামগঙ্গামাণিক্য নৃপবর।
জয়দেব উজীর স্থানে বলেন সাদর ॥
তুমি ত উজীর হয় কৃষ্ণমাণিক্যের।
বহুদর্শী হয় তুমি আমার বংশের (১) ॥
বয়োধিক আছ তুমি জ্ঞান সাবহিত।
নানা শাস্ত্র জ্ঞান আছে তোমার বিদিত ॥
কল্যাণ মাণিক্যাবধি শুনিছি রাজাগণ।
গোবিন্দ মাণিক্যাবধি কহিবা এখন ॥
রাজামালা বংশাবলী বংশের গৌরব।
রাজমালা বিনে বংশের না রহে সৌরভ ॥

নৃপ সম্বোধিয়া উজীর কহিল আপন।
মুকুন্দমাণিক্য ছিল নৃপতি যখন ॥
সেই কালে জন্মিয়াছি বলি মহারাজ।
তার পূর্ব্বে শুনিয়াছি বৃদ্ধের সমাজ ॥
যাহা শুনিয়াছি, যাহা দেখিল আপন।
সেই সব কহি আমি শুনহ রাজন ॥
কথা পূর্ব্বে, আমি বৃদ্ধ স্থবির সময়।
সব কথা মনে রাখা কহিতে সংশয় ॥
বহুজনা বহুকার্য্য এক কালে করে।
পূর্ব্বপরে না কহিলে একত্রে না পারে ॥
প্রসঙ্গের ক্রম গ্রন্থ পূর্ব্বপরে হয়।
জ্ঞানবান হৈলে তাহা বুঝয়ে নিশ্চয় ॥

---

(১) তুমি আমার বংশের বিবরণ সম্বন্ধে বহুদর্শী।

গোবিন্দমাণিক্য খণ্ড

পনর শ বিরাশি শক জ্যৈষ্ঠ মাস তাতে।
ত্রয়োদশ দিন ছিল বুধবার যাতে ॥
গোবিন্দমাণিক্য রাজা হইল রাজন।
গুণবতী মহারাণী বিখ্যাত ভুবন ॥

পরগণে নুরনগর ঝিল স্থান (১) ছিল।
মহারাণী সেই স্থানে সাগর খনিল (২) ॥
রাণী নিজ নামে গুণসাগরের নাম।
সাগর উৎসর্গিয়া রাণী পুরে মনস্কাম ॥
রাজার মহর শিব লিঙ্গ সংস্থান।
অন্য পৃষ্ঠে রাজা রাণী নামের ব্যাখ্যান ॥

রাজার বৈমাত্র ভ্রাতা নক্ষত্র ঠাকুর।
মুর্শুদাবাদেতে তুলে নবাব হুজুর ॥
গোবিন্দমাণিক্য রাজা রাজত্ব সাধন।
কত দিন সুখে কাল করেন ক্ষেপণ ॥
নবাব সনদ করে নক্ষত্রে সন্ধান।
রাজত্ব সনদ লৈয়া আসে ত্বরমাণ ॥
উদয়পুর নক্ষত্র আসয়ে যখন।
মন্ত্রিবর্গ নৃপতিতে করে নিবেদন ॥
যুদ্ধ কর মহারাজা না করিও ভয়।
কি করিতে পারে সে যে পরামর্শে লয় (৩) ॥
গোবিন্দমাণিক্য রাজা বলিল তখন।
ভাই সঙ্গে করি যুদ্ধ কিসের কারণ ॥
আত্ম কলহ হইলে প্রজা নষ্ট হয়।
পাপে ত হইব স্থিতি বলিল নিশ্চয় ॥

---

(১) জলময় ভূমিকে ঝিল বলে।

(২) বর্ত্তমান কসবা থানার অন্তর্বর্ত্তী জাজিয়াড়া গ্রামে এই দীর্ঘিকা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

(৩) পরামর্শে স্থির হইতেছে, যুদ্ধ করিলে প্রতিপক্ষ সুফল লাভ করিতে পারিবে না।

রাজত্ব করিল আমি বর্ষ পরিমাণ।
এখনি রাজত্ব জ্ঞান তাহান বিধান॥

পরেতে জিজ্ঞাসে রাজা বিস্তার করিয়া।
কহিবা যে সব কথা প্রচার করিয়া॥
ছত্রমাণিক্য রাজা হইল যখন।
গোবিন্দমাণিক্য রাজা বিদেশে গমন॥
কোন পথে গিয়াছিল কেবা সঙ্গে ছিল।
কিমত প্রকারে রাজার কালক্ষয় হৈল॥
কত দিন পরে রাজা দেশেতে আসিল।
পুনরপি রাজ্য ভোগ কিমতে করিল॥
কহ কহ উজীর তুমি জ্ঞানেতে বিহিত।
শুনিতে শ্রবণ সুখ বংশের চরিত॥

শুন মহারাজা তুমি এ সব কথন।
গোবিন্দমাণিক্যের যত কহি বিবরণ॥
উদয়পুর ত্যাগে রাজা গোবিন্দ নৃপতি।
রাণী সঙ্গে মন রঙ্গে রিহাঙ্গে (১) বসতি॥
রাজ্যভ্রষ্ট দেখি রাজা রিহাঙ্গিয়া প্রজা।
ভক্তি ভাবে না পূজিল সেই মহারাজা॥
রাণী কহে প্রজা তোরা অনেক হইলা।
তেকারণে গ্লানি ভাব আমার করিলা॥
এই শাপ আমি দিল তোমাগ উপর।
ঘর সহস্রাধিক হৈলে মরিবা অপর॥
এই রূপে শাপ দিল রাণী গুণবতী।
সেই হৈতে রিহাঙ্গিয়ার নাহি অব্যাহতি॥
হাজার ঘর ঊর্দ্ধ হৈলে রিহাঙ্গ প্রজার।
কোন মতে মারা পড়ে কুবুদ্ধি প্রচার (২)॥
এই মত প্রজা দুষ্ট নাহিক রাজার।
এই কথা ত্রিপুরাতে আছএ প্রচার॥

---

(১) রিহাঙ্গে — রিয়াং জাতির বসতি স্থানে। এই পার্ব্বত্য জাতির বিবরণ যথাস্থানে প্রদান করা হইবে।

(২) ইহাদের ধ্বংসের দ্বারা তাহাদের কুবুদ্ধির ফল প্রচারিত হইয়াছে।

চট্টগ্রামে চলিলেক সেই ত রাজন।
জগন্নাথ অনুজ সঙ্গে চলে সেই ক্ষণ॥
রামঠাকুর রাজপুত্র সুনীতি প্রচুর।
দ্বিতীয় তাহান ভ্রাতৃ দুর্গা নাম ঠাকুর॥
জগন্নাথ সুত সূর্য্যপ্রতাপনারায়ণ।
চম্পক রায় আর পুত্র যুদ্ধে বিচক্ষণ।
জগন্নাথ তনয় ছিলে আর একজন।
পন্থ হৈতে ফিরি আইসে স্বদেশে গমন॥
জগন্নাথ ঠাকুর জামাতা সম্বোধিয়া।
বলিলেন্ত আমা পুত্র আন ফিরাইয়া॥
প্রণমিয়া জামাতা যে বলিলে তখন।
কেমতে আনিব তাকে রাজার নন্দন॥
ফিরি যদি নাহি আইসে করিব কেমন।
আজ্ঞা দিল সুত বর না আইসে যখন॥
শিরশ্ছেদ করি তাহার আনিবে তখন।
এই বাক্যে জামাতায় তখনে গমন॥
কতদূর পথে যাইয়া কুমারকে দেখে।
রাজার দোয়াই দিয়া দাঁড়াইল সম্মুখে॥
ফিরিয়া আইসয়ে ঠাকুর বলিএ তোমারে।
নাই আইস যদি তুমি কাটিব তৎপরে॥
ক্রোধ হইয়া রাজপুত্র খড়গ হাতে লৈল।
জামাতাকে মারিবারে হস্ত উঠাইল॥
তখনেহি জামাতায় সিংহনাদ করিল।
হাতে খড়গ রাজপুত্র স্তব্ধবৎ রহিল॥
জামাতায়ে খড়গঘাত তখনে করিল।
সেই ঘাতে রাজপুত্র প্রাণেতে মরিল॥
জগন্নাথ ঠাকুর বৈসে রাজার সভাতে।
জামাতা আনিয়া শির দিলেন সাক্ষাতে॥
রাজাএ দৈখিয়া শির বিস্ময় হইল।
জগন্নাথ প্রতি রাজা নিষ্ঠুর বলিল॥

তা পরে রসাঙ্গে রাজা উপস্থিত হৈল।
রসাঙ্গের রাজা নিকট সম্মানে রহিল॥
লোকজন দিয়া মঘে রাখিল সাদর।
উদয়পুর নক্ষত্র নৃপ হৈল তার পর॥
ছত্রমাণিক্য রাজা তাহান আখ্যান।
সপ্তবর্ষ রাজত্ব ছিল করি পরিমাণ॥
উদয়পুর ছত্রসাগর করিয়া খনন।
বসন্ত হইয়া রাজার হইল মরণ॥
তাহান পুত্র ছিল উচ্ছব রায় ঠাকুর (১)।
দানাদি করিয়া শ্রাদ্ধ করিল প্রচুর॥

গোবিন্দমাণিক্য রাজা রসাঙ্গের দেশে।
সুজা বাদসা ভ্রাতা সঙ্গে বিবাদ বিশেষে॥
আউরঙ্গজেব বাদসা তখনে হৈল।
রাজ্যভ্রষ্ট হৈয়া সুজা রসাঙ্গেত গেল (২)॥
গোবিন্দমাণিক্য রাজা সেই স্থানে ছিল।
হেনকালে সুজা বাদসা উপস্থিত হৈল
ত্রিপুর রসাঙ্গ রাজা বৈসে সিংহাসনে।
বাদসা দেখিয়া ত্রিপুর উঠিল তখনে॥
সিংহাসন হৈতে লামে ত্রিপুর রাজন।
সুজা বাদসা সিংহাসনে করিল স্থাপন॥
রসাঙ্গের মহারাজা বলিল আপন।
কি কারণে ম্লেচ্ছ রাজা দিছ সিংহাসন॥
রাজা বলে নরেশ্বর করি নিবেদন।
এহিত সুজা বাদসা বিখ্যাত ভুবন॥
তুমি আমি হেন রাজা আছে বহুজন।
তাহান রাজ্যেতে কত হইছে পালন॥

---

(১) উৎসব রায় ঠাকুর।

(২) শাহ সুজা পলায়নপর হইয়া প্রথমতঃ ত্রিপুরায় গমন করেন। তাঁহাকে ধৃত করিয়া পাঠাইবার নিমিত্ত ঔরঙ্গজেব ত্রিপুরেশ্বরকে অনুরোধ করিয়া এক খরিতা প্রেরণ করিয়াছিলেন, এতদ্বিষয়ক বিবরণ মধ্যমণিতে পাওয়া যাইবে।

এহান চাকর নিকট না পারে বসিতে।
আর সিংহাসনে ত্রিপুর বসিল ত্বরিতে ॥
সভাভঙ্গে রাজা সুজা একত্রে গমন।
সুজা বাদসা গোবিন্দ মাণিক্যে কথন ॥
রাজা সম্বোধিয়া বাদসা বলিল তখন।
আমার মর্য্যাদা তুমি রাখিছ এখন ॥
হেন কালে কিবা দিব নাহি কিছু হেন।
দোলিত নিমচা গলে রাজাতে প্রদান ॥
মহারাজা গলে দিল করিয়া সাদর।
হিরার অঙ্গুরী দিল মূল্য বহুতর ॥

রসাঙ্গের রাজ কন্যা বাদসা বিবা কৈল।
সেই কালে সুজা বাদসার কুবুদ্ধি জন্মিল ॥
রসাঙ্গের রাজা বধ করিতে যতন।
চল্লিশ জন মল্ল আনি করে নিয়োজন ॥
আঙ্গাজিরা (১) পৈরাইয়া দোলাতে উঠিয়া।
দোলা প্রতি দুই মল্ল রহিল বসিয়া ॥
একখানি দোলা মধ্যে কাহার (২) আষ্টজন।
রসঙ্গের রাজবাড়ী করিছে গমন ॥
রাজকন্যা রাজবাড়ী যাহে বলি কহে।
ষষ্ঠ দেহরী পার হৈল না করিয়া ভয়ে ॥
সপ্তম দেহরী পরে বলে চকিদার।
এত সব দোলা আসে এ কোন বিচার ॥
দ্বারবন্ধ দ্বারী বৃদ্ধে করিল তালাস।
দোলাহনে নামে যুদ্ধা যুদ্ধেতে বিনাশ ॥
মারিলেক যুদ্ধাগণ রাজার ভুবন।
গুপ্তভাবে সুজাসাহা স্থানান্তে গমন (৩) ॥
উদ্দেশ নাহিক বাদসা করিল তালাস।
রসাঙ্গের রাজা চিত্তে বিকার প্রকাশ ॥

---

(১) আঙ্গাজিরা — যুদ্ধের পরিচ্ছদবিশেষ ;

(২) কাহার— শিবিকা, বাহক, বেহারা। যোদ্ধাগণ ছদ্মবেশে শিবিকা বহন করিয়াছিল।

(৩) শাহ সুজার পরিণাম বিষয়ে মতবৈষম্য আছে। মধ্য-মণিতে এ বিষয় আলোচিত হইবে।

গোবিন্দমাণিক্য প্রতি বলেন রাজন।
রাজ্যে যাও নরেশ্বর আপন ভুবন ॥
কত ঘর মঘ অষ্টধাতু সিংহাসন (১)।
দেব জন্যে মঘ রাজা করিল অর্পণ ॥
ঘটি এক ভরটের দ্রব্য নানা মত।
এই সব দিয়া রাজা বিদায় রাজ্যেত ॥

সেই স্থান হৈতে রাজা চট্টলে আসিল।
ছত্রমাণিক্য রাজা মৃত্যু তখনে শুনিল ॥
ত্রিপুরের লোক সব চট্টলে গমন।
গোবিন্দমাণিক্য স্থানে করে নিবেদন ॥
উদয়পুর আসে রাজা আনন্দ বিস্তর।
পুনর্ব্বার মহীপাল হইল নরেশ্বর ॥

গোবিন্দমাণিক্য পূর্ব্বের রাজা ত্রিপুরার।
কেহ নৃপ নাহি দিছে কর বাদসার ॥
গোবিন্দমাণিক্য রাজা পুনর্ব্বার হৈল।
তদবধি নজরানা হস্তী কর দিল ॥
বৎসরে পঞ্চ হস্তী করে নিবন্ধিয়া।
তাহা হতে এক হস্তী অর্দ্ধেক মাপিয়া (২) ॥
সেইত অর্দ্ধেক হস্তী রাজ করে যাত্র।
আর অর্দ্ধেকের মূল্য নৃপতি যা পাত্র ॥
ছত্রমাণিক্যের পুত্র উচ্ছবরায় নাম।
বলিলেন্ত এই রাজ্যে কাটা মারা কাম ॥
এই স্থানে আমা স্থিতি কভু ভাল নয়।
তুলে (৩) থাকা যাইব ঢাকা আমা মনে লয় ॥

---

(১) এই সিংহাসন বর্ত্তমানকালে ঁচতুর্দ্দশ দেবতার ব্যবহারে আছে।

(২) হস্তীর উচ্চতা মাপ করা হয়। পৃষ্ঠদেশের যে অংশ সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের সমসূত্রে অবস্থিত, সেই অংশ হইতে (আসনের স্থান হইতে) পায়ের নঘ পর্য্যন্ত মাপিয়া হস্তীর উচ্চতা নির্ণীত হইয়া থাকে। উচ্চতার তারতম্যানুসারে হস্তীর মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

(৩) তুল — এই সময়ে নবাব দরবারে ত্রিপুরার পক্ষ হইতে একজন প্রতিনিধি রাখিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, এই প্রতিনিধিকে 'তুল' বলা হইত। 'তুল' শব্দের অর্থ তুল্য, অর্থাৎ রাজার তুল্যক্ষমতায় কার্য্য করিবার অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

মসারাতে জাগীর রাজ্য করিয়া নিশ্চয়।
তুলেতে যাইয়া রহে রাজার তনয়॥
সেই সব তুলে থাকে আছে নিরূপণ।
সাবেক রক্তননগর মসারা পায়ন॥
তাহার যে পরিবর্ত্ত কাদবা পরগণা।
বেদারা আমিরাবাদ করিয়া সিমানা॥
এ তিন পরগণা পাএ উচ্ছব রায়ে।
গোবিন্দমাণিক্য রাজা দিল মসারাএ॥
চট্রলেত চন্দ্রশেখর মঠ নিরমিয়া।
দেবার্থেতে মহারাজা জলাশয় দিয়া॥
গোবিন্দসাগর নাম করিল তখন।
তিষিনা উদয়পুরে করিছে শোভন॥
গঙ্গা তীর গেল রাজা স্নান করিবার।
স্তুতি তীর ভাগীরথী হইতে নিস্তার॥
তাম্র পত্রে সনদ লিখি দ্বিজেতে অর্পণ।
কনকের তুলা কৈল পুণ্যের কারণ॥
নানা দেশী দ্বিজবর পাইল ভূমি দান।
গোবিন্দমাণিক্য রাজা বংশের প্রধান॥
চারি আনা কাণি ভূমি করে রাজ কর।
চারি আনা নিজ নামে মারিল মোহর॥
আমাবংশে চারি আনা কাণি কর লয়।
সেই রাজা চারি আনী মারিব নিশ্চয়॥
আর রাজার সিকির কার্য্য হয়েত যখন।
গোবিন্দমাণিক্যের সিকি করিব তখন॥
রাজার নিষেধ বাণী শুনহ রাজন।
অন্য রাজা সিকি মোহর না মারে কখন॥ (১)

---

(১) মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য সিকি মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ভূমির করের হার লাঘব করিয়া কাণি প্রতি চারি আনা রাজস্ব নির্দ্ধারণ করা হয়। তৎকালে তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমার বংশের যে রাজা ভূমির কাণি প্রতি চারি আনা কর গ্রহণ করিবেন, তিনি সিকি মুদ্রা প্রচলন করিবার অধিকারী হইবেন। যাঁহারা উক্ত হারের অতিরিক্ত কর

রাজ সনদের মোহর পদ্মের আকৃতি।
নিজ নাম মধ্যে বসে পদ্ম-মোহর খ্যাতি ॥
চতুর্ভিতে পঞ্চ নাম আপনা পূর্ব্বের।
বেষ্টিত লিখিত নাম থাকে যে রাজার ॥ (১)
এক জন সদাগরে আনিল লবণ।
হস্তী দিয়া সেই লবণ লইল রাজন ॥
উদয়পুর প্রজা যত পাত্র মিত্রগণ।
সকলকে মহারাজা দিল সে লবণ ॥
রাজা বলে এই লবণ খাও যেই জন।
আমাবংশে দুষ্ট ভাব না কর কখন ॥ (২)

গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে সিকি মুদ্রা প্রচলন করা নিষিদ্ধ। প্রয়োজন হইলে সেই সকল রাজা আমার প্রচারিত সিকি মুদ্রা ব্যবহার করিবেন। মহারাজ গোবিন্দের এই আদেশের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত পরবর্ত্তী রাজগণ পূর্ণ মুদ্রার প্রচার করিয়া আসিতেছেন, কেহই অর্দ্ধমুদ্রা বা সিকি মুদ্রা মুদ্রিত করেন না।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের এই আদেশ আলোচনা করিলে, পরবর্ত্তীকালের অন্য একটী আদেশের কথা স্মৃতিপটে উদিত হয়। বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সাইস্তা খাঁএর শাসনকালে টাকায় আটমণ চাউল বিক্রিয় হইতেছিল। তিনি ঢাকা নগরী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার কালে পশ্চিম দিকের সদর দ্বার দিয়া বাহির হন; এবং সেই দ্বার রুদ্ধ করিয়া আদেশ করেন যে, যে শাসনকর্ত্তার সময়ে পুর্নব্বার প্রতি টাকায় আটমণ চাউল বিক্রিয় হইবে, তিনি এই দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবেন, অন্যের পক্ষে এই দ্বার উন্মোচন করা নিষিদ্ধ। এই আদেশানুসারে দীর্ঘকাল উক্ত দরজা অবরুদ্ধাবস্থায় ছিল। বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সরফরাজ খাঁ-এর সময়ে পুনর্ব্বার টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় হওয়ায়, তিনি মহাসমারোহের সহিত উক্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের আদেশের সহিত এই আদেশের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

(১) ত্রিপুরেশ্বরগণের খাস মোহর "পদ্ম-মোহর" নামে বিখ্যাত। ইহাতে পঞ্চ-দল বিশিষ্ট একটী পদ্ম অঙ্কিত থাকে; যে রাজার মোহর, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচজন রাজার নাম সেই পাঁচটী দলে এবং মোহর প্রচলনকারী রাজার নাম পদ্মের মধ্যস্থলে উৎকীর্ণ হয়। এই শীলমোহর ত্রিপুরেশ্বরের খাস দরবার হইতে প্রচারিত সনন্দ ইত্যাদি দলিলে ব্যবহৃত হয়। শীলমোহর সম্বন্ধীয় বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের সময় হইতে পদ্ম-মোহরের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে।

(২) এই উক্তি দ্বারা জানা যাইতেছে, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের পূর্ব্বে ত্রিপুর রাজ্যে বিলাতী লবণের ব্যবহার ছিল না; মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যই তাহার প্রবর্ত্তনা করেন। তৎপূর্ব্বে কি উপায়ে লবণের কার্য্য সাধিত হইত, সে বিষয় পরবর্ত্তী মধ্যমণিতে আলোচিত হইবে।

এই লবণ ক্রয়ের বিবরণ রাজাবাবুর বাড়ী হইতে প্রাপ্ত রাজমালায় নিম্নলিখিত মত বিবৃত হইয়াছে;—

"ধনবন্ত এক সাধু দেশেতে আসিল। দুই সহস্র মণ লবণ নৌকাতে আনিল ।।

পূর্ব্বাবধি মেহেরকুল ঝিল স্থান ছিল।
গোমতীর দুই কুলে আইল বান্ধিল ॥
সে অবধি মেহেরকুল আবাদ হইল।
অদ্যাবধি তান কীর্ত্তি লোকেতে রহিল ॥
রসাঙ্গেতে হিরাঙ্গুরী বাদসা দিয়াছিল।
সে অঙ্গুরী মহারাজা বিক্রয় করিল ॥ (১)
গোমতী নদীর কূলে মজিদ স্থাপিয়া।
সুজা বাদসার নামে মজিদ করিয়া ॥
সুজা নামে এক গঞ্জ রাজাএ বৈসাইল।
সুজাগঞ্জ বলি নাম তাহার রাখিল ॥
গোবিন্দমাণিক্য রাজার বয়স নির্ণয়।
এক চল্লিশ বৎসর কালে রাজা হয় ॥
বৃদ্ধতা হইয়া রাজা হৈল কফাতুর।
ঊনাশী বয়সে রাজা গেল স্বর্গপুর ॥

ত্রিপদী ছন্দ

এক কম চল্লিশের গোবিন্দ যে মাণিক্যের
রাজনীতি রাজ ধর্ম্ম মতে। (২)
কাল বশ হৈয়া রাজা ত্যাগিয়া পৃথিবী প্রজা
স্বর্গে গেল রাম নাম লৈয়া।
কান্দে রাণী গুণবতী ত্রিপুরাতে যার খ্যাতি
আর কান্দে রাম-দুর্গা ঠাকুর।

রাজার সাক্ষাতে সাধু পত্র পাঠাইল।
উপযুক্ত চর পাঠাইল তার কাছে।
আনিছি রাজার দেশে হস্তীর কারণ।
সাধুর এমত কথা রাজায় শুনিয়া।
উদয়পুর বসতি আছিল যত জন।
আর সব দেশে যত প্রজাগণ ছিল।
আমার বংশেতে হয় রাজা যত জন।
পত্র শুনি মহারাজ সন্তোষ হইল ॥
লবণের কিরূপ মূল্য কহ সবিশেষে ॥
লবণ আনিছি আমি দুই সহস্র মণ ॥
সাধুরে দিলেক হস্তী লবণ রাখিয়া ॥
জন সংখ্যা ক্রমে দিল সবারে লবণ ॥
যার সেই অভিপ্রায় বিবর্ত্তিয়া দিল ॥
না করিবা অনিষ্টতা স্মরিয়া লবণ ॥

(১) অঙ্গুরীটী নিজে উপভোগ না করিয়া, যিনি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ প্রদান করাই মহারাজ সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন, অবস্থানুসারে ইহাই বুঝা যায়।

(২) এই সময় নির্দ্ধারণ প্রমাদপূর্ণ, মধ্য-মণিতে এই বিষয় আলোচিত হইবে।

মরে রাজা কান্দে প্রজা নৃপশূন্য হৈয়া ভূজা
আর রাজা মনে অভিলাষ।
রামদেব যুবরাজ শ্রাদ্ধ করে বহু সাজ
গোবিন্দমাণিক্য দেব সুতে।
নানাদেশ নিবাসী বিপ্রগণ শ্রাদ্ধে আসি
দান লএ গোবিন্দের প্রীতে।
জগন্নাথ ঠাকুর অতি পূণ্যবান হয়।
তিষিনাতে দীঘি দিল (১) পূণ্যের সঞ্চয়॥
ধন সম্পদ লোকের কিছু নহে থাকে।
কীর্ত্তি সজীব হয়ে দেখে সর্ব্বলোকে॥
রামগঙ্গা মাণিক্য রাজা জিজ্ঞাসা কথন।
জয়দেব উজীর কহে বংশ বিবরণ॥
গোবিন্দ ছত্রমাণিক্য এ দুই রাজন।
তাহান কীর্ত্তি পদবদ্ধ হৈল সমাপন

ইতি রাজখণ্ড তত্ত্বে গোবিন্দমাণিক্য এ ছত্রমাণিক্য প্রসঙ্গ সমাপ্ত।

---

(১) এই সরোবরের নাম জগন্নাথদীঘি। কুমিল্লা হইতে চট্টগ্রামভিমুখে যে সুদীর্ঘ রাজবর্ত্ম বিদ্যমান রহিয়াছে, এই সরোবর তাহার পূর্ব্ব পার্শ্বে অবস্থিত। এই বিস্তীর্ণ সরোবরের পশ্চিম পাড়ের উপর দিয়া উক্ত সড়ক চলিয়া গিয়াছে। সরোবরটি কিঞ্চিন্ন্যূন এক মাইল দীর্ঘ; দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রশস্ত অপেক্ষাকৃত কম দৃষ্ট হয়। এই সরোবর তিষ্ণা পরগণার অন্তর্গত কেচকিমুড়া মৌজায় অবস্থিত।

রামমাণিক্য খণ্ড

গোবিন্দমাণিক্য রাজা স্বর্গেতে গমন।
রামদেব যুবরাজ বৈসে সিংহাসন ॥
উদয়পুর রাজধানী অতি মনোহর।
রাম মাণিক্য নাম তাথে শশধর ॥
রাজনীতি ক্রমে রাজা করিল বিধান।
পাত্র মিত্র মন্ত্রিবর্গ বিখ্যাত সন্ধান ॥
পালিলেক প্রজা লোক নিজ বাহুবলে।
ধর্ম্মরূপ মহারাজা জন্মিল ভূতলে ॥
রাজা নামেতে মোহর করিল আখ্যান।
গজ সিক্কা মারিয়াছে ব্রাহ্মণে প্রদান ॥ (১)
বহুজন ছিল রাণী পরম সুন্দরী।
অষ্টাদশ রাজসুত রাজ্য অধিকারী ॥
প্রধানাদি রাণী গর্ভে জনমিয়া ছিল।
রত্ন ঠাকুর নাম তাহান রাখিল ॥
রত্নমাণিক্য রাজা হৈল সেই জন।
তারপরে ঘনশ্যাম ঠাকুর আর জন ॥
মহেন্দ্রমাণিক্য নাম হইল তাহার।
দুর্য্যোধন নাম ছিল ধর্ম্মমাণিক্যের ॥
মুকুন্দদেব মুকুন্দমাণিক্য বিখ্যাত।
নানাবিধ দান কৈল দেবের সাক্ষাত ॥
সরাইল জমিদার নাছির আলী ছিল।
রাজপুত্র চন্দ্রসিংহকে শিকারে বধিল ॥
তার পিতা নুরমাহামুদ এ সব শুনিয়া।
রাজার নিকটে পুত্র দিল পাঠাইয়া ॥

---

(১) রাজার প্রচারিত মুদ্রা 'গজসিক্কা' নামে অভিহিত ছিল। রাজার অভিষেককালে স্বীয় প্রচারিত মুদ্রা ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণাশ্বরূপ প্রদান করিবার নিয়ম ছিল।

রামমাণিক্য রাজা পূণ্যের ভাজন।
পুত্রবধী নাছিরকে না মারে রাজন॥
রাজা বলে তাকে বধি কিবা ফল হবে।
তার ফল পরলোকে সেই সে পাইবে (১)॥
আর এক প্রসঙ্গ যে হইল স্মরণ।
রামমাণিক্য দ্বারিকার যে মত কারণ॥
দুর্গা ঠাকুরের পুত্র দ্বারিকা নাম ধরে।
মুর্শুদাবাদ তুলে রাখিল তাহারে॥
এক দিন নবাবেত করিল বিদিত।
আমার জেষ্ঠতা রাজা হৈয়াছে পীড়ত॥
বৃদ্ধ কাল হৈছে রাজা চক্ষে নাহি দেখে।
কর্ণে নাহি শুনে কথা বাণী নাহি মুখে॥
এই মত দুষ্ট বাক্য নবাবেতে বলে।
রাজা হইবার সেই চেষ্টিত হইলে॥
এই বার্ত্তা উদয়পুরে শুন নৃপ নাথ।
মিথ্যা বলি পত্র লিখে নবাব সাক্ষাত॥
দ্বারিকা ঠাকুর আমা যত মন্দ কয়ে।
মিথ্যা সব বলিয়াছে জানিবে নিশ্চয়ে॥
নৃপতির এই পত্র শুনিয়া নবাব।
শোয়ারকে পাঠাইল দেখিতে স্বভাব॥
শোয়ার আসিয়া দেখে রাজা ভাল আছে।
দ্বারিকাএ যত বাক্য প্রলাপ বলিছে॥
নবাবেতে জানাইল এ সব বৃত্তান্ত।
প্রত্যয় হইল তবে শুন্যা মতিমন্ত॥
এই মত কত হৈছে বংশেতে তোমার।
কথা শ্রেণী মত সব হইব প্রচার॥
রামমাণিক্য রাজা স্বভাব ছিল আর্য্য।
প্রজার পালন করে থাকিয়া গাম্ভীর্য্য॥

---

(১) নুরমাহামুদের পুত্রের বিবরণ মধ্যমণিতে, রামমাণিক্য প্রসঙ্গে সন্নিবিষ্ট হইবে।

উদয়পুর তিষিনাতে সাগর খনন।
রামসাগর নাম করিল স্থাপন ॥
তাম্রপত্রে লিখি সনদ করিয়া যতন।
রামসত্য (১) নামে ভূমি দ্বিজেতে অর্পণ ॥
নিত্য নৈমিত্তিক বার্ষিক নানা মনোরম।
চৌদ্দদেব খার্চ্চি (২) গঙ্গাপূজা নিরূপণ ॥
এইমতে বার বৎসর রাজত্ব করিয়া (৩)।
নানা সুখ ভোগ করে পুত্রগণ লৈয়া ॥

ত্রিপদী ছন্দ

রামমাণিক্য রাজন, বৃদ্ধ হৈল যৌবন,
দিবানিশি ভাবে নারায়ণ।
কোন দিন যমালয়ে, ভাবে দরশন হয়ে,
কি মত যে ধর্ম্মের বিচার।
ধর্ম্ম শাস্ত্র যেইরূপে, তাহা শুনি প্রাণ কাঁপে
ধর্ম্মের যে অতি সূক্ষ্মগতি।
এই মত ভাবি মনে, রোগ বারে দিনে দিনে
স্বর্গে গেল ইষ্ট নাম লৈয়া।
রামরাজা মৃত্যু হৈল, রাণী সব ব্যস্ত হৈল
দিবানিশি ক্রন্দনের রোল।
রাজপুত্র সব জন, করিছিল ক্রন্দন
আর কত মন্ত্রীর সমাজ।
শ্রাদ্ধ আয়োজন করি, রত্ন ঠাকুর অধিকারী
আর পুত্র নানা দান করে।

---

(১) মহারাজ রামমাণিক্যের শিলমোহরে 'রামসত্য' নাম অঙ্কিত ছিল।

(২) চতুর্দ্দশ দেবতা স্থাপনের তিথিতে। (আষাঢ় মাসের শুক্লাষ্টমীতে) বিপুল সমারোহের সহিত উক্ত দেবালয়ে বার্ষিক উৎসব ও অর্চ্চনা হইয়া থাকে। এই পূজাকে 'খার্চ্চিপূজা' বলে। রাজমালা প্রথম লহরের ১৪৩ পৃষ্ঠা এই পূজার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৩) এই সময় নির্দ্ধারণ বিশুদ্ধ নহে। পরবর্ত্তী মধ্যমণিতে এ বিষয়ের আলোচনা পাওয়া যাইবে।

বৃষোৎসর্গ তিল দান, যথাবিধি অনুষ্ঠান
স্বর্গপথ করিল সোপান।
বিপ্রগণ বহুজন শ্রাদ্ধে আইসে সেইক্ষণ,
দান দিল যথাযোগ্য মতে।

পদবন্দ

এই মতে রাজা রামাণিক্য প্রসঙ্গ।
কহিল বৃত্তান্ত সব হইল যে সাঙ্গ॥
মহারাজা রামগঙ্গামাণিক্য নৃপ স্থানে।
জয়দেব উজীর কহে রাজা বিদ্যমানে॥

ইতি রাজখণ্ডতত্ত্বে রাজা রামমাণিক্য প্রসঙ্গ সমাপ্ত।

রত্ন ও মহেন্দ্রমাণিক্য খণ্ড

রামমাণিক্যের কথা হৈল সমাপন।
তান পুত্র রত্নমাণিক্য কহিব কথন॥
শুন দেব মহারাজ অদ্ভুত কাহিনী।
রাজ্যলোভে ভ্রাতৃবধ করিল আপনি॥
রামমাণিক্য রাজার যবে স্বর্গ হৈল।
পঞ্চ বৎসর শিশুকাল রত্নদেব ছিল॥
বলিভীম নারায়ণ বৈসাএ সিংহাসনে।
রত্নমাণিক্য আখ্যান করিল তখনে॥
বলিভীম যুবরাজ হইল আপনি (১)।
শিশু রাজা নাম করি রাজ্যের শাসনি॥
রামমাণিক্য মহারাজা অতি পূণ্যবান।
তান পুত্র অষ্টাদশ ছিল যোগ্যমান॥
প্রধানস্ত রাজপুত্র ছিল কত জন।
বলিভীম যুবরাজে করে সংহারণ॥

---

(১) বলিভীম, মহারাজ রামমাণিক্যের শ্যালক ও রত্নমাণিক্যের মাতুল ছিলেন। ইনি রামমাণিক্য কর্ত্তৃক যুবরাজ উপাধি লাভ করেন। রত্নমাণিক্যের শাসনকালেও এই উপাধি স্থিরতর ছিল।

চারি পুত্র রাজা হৈল পুণ্যের ভাজন।
ধর্ম্মবলে বাঁচিছিল বংশের কারণ॥
রত্নমাণিক্য রাজা যুবক হইল।
ছয় কুড়ি জন কন্যা বিবাহ করিল॥
মুখ্যরাণী রত্নাবতী বসিল বিদিত।
আর রাণী চতুর্ভিতে হৈয়াছে শোভিত॥
শুভক্ষণে মহারাজা বিবাহ করিল।
এমতি কন্যার শোভা কেহ না শুনিল॥
সূর্যপ্রতাপ নারায়ণ জগন্নাথ সুত।
উজীর করিল তাকে বুঝিয়া বিহিত॥
সমরপ্রতাপ নারায়ণ নেবউজীর (১) ছিল।
জয়মর্দ্দন সুবাকে প্রাণেতে বধিল॥
রাজা শিশুকাল ছিল মন্ত্রীর সমাজ।
আত্মবর্গ বধ করি করে রাজ কাজ॥

এক বিপ্র বৈদ্যনাথে স্বপন দেখাএ।
রাজ পাদোদক লৈলে রোগশান্তি পাএ॥
সেই দ্বিজ নৃপ স্থানে চায়ে পাদোদক।
ব্রাহ্মণ কাতর দেখি দিল বস্ত্রোদক (২)॥
জল খাই ব্রাহ্মণের রোগশান্তি হৈল।
ধন দিয়া দ্বিজবর বিদায় করিল॥

বলিভীম যুবরাজ পুণ্য আচরণ।
মেহারকুল দুর্গাপুরে দীঘি করিল খনন॥
কস্‌বাতে কালীমূর্ত্তি করিল স্থাপন।
দশভুজা ভগবতী পতিত তারণ (৩)॥

ঢাকাতে শাস্তা খাঁ নাম নবাব যখন।
বলিভীম যুবরাজের দুষ্টতা শ্রবণ॥

---

(১) নেবউজীর—নায়েব উজীর, উজীরের সহকারী।

(২) রোগগ্রস্ত জনৈক ব্রাহ্মণ বৈদ্যনাথ কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াছিলেন, মহারাজ রত্নমাণিক্যের পাদোদক গ্রহণ করিলে তিনি রোগমুক্ত হইবেন। ব্রাহ্মণকে পাদোদক প্রদান করা গর্হিত কার্য্য বিবেচনায় বস্ত্রধৌত জল প্রদান করা হইয়াছিল।

(৩) এই কালিকা মূর্ত্তি বলিভীম নারায়ণের তত্ত্বাবধানে, মহারাজ রত্নমাণিক্যের শাসনকালে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। মধ্যমণিতে এই বিগ্রহের বিবরণ পাওয়া যাইবে।

কেশরিদাস নামে এক সরদার ছিল।
বহু সৈন্য তার সঙ্গে কুমিল্লা আসিল॥
বলিভীম যুবরাজ সংরাইস গ্রামে।
তথা হৈতে কেশরিদাস ধরিলেক শ্রমে॥
ঢাকা নিয়া মুর্শুদাবাদে করিল চালান।
তথা হৈতে দিল্লী সহরে করায়ে পয়ান। (১)
রাজ জামাতা জয়দেব তুলে ছিল যবে।
তাহাকে যুবরাজি দিলেক নবাবে॥
জয়দেব যুবরাজ ঢাকাতে আছিল।
দ্বারিকাকে তুলে দিয়া যুবরাজ আসিল॥
দ্বারিকার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীগৌরীচরণ।
ঢাকা যাইয়া নবাবেত করিল মিলন॥
রাজভ্রাতৃ বলি তার পরিচয় ছিল।
এই হেতু নবাব তাকে যুবরাজি দিল॥
ঢাকা হতে যুবরাজ উদয়পুর আসিয়া।
সূর্য্যপ্রতাপ উজীরকে প্রাণেতে বধিয়া॥
দ্বারিকাতে পত্র লেখে ভাই যদি হয়ে।
ফৌজ লৈয়া আইস তুমি জানিবা নিশ্চয়ে॥
এই পত্র পাইলেক দ্বারিকা দুরন্ত।
রাজা দলসিংহ স্থানে কহিল বৃত্তান্ত॥
দুর্যোধন ঠাকুরকে তুলেত রাখিয়া।
ঢাকা হতে ফৌজ লইয়া দ্বারিকা আসিয়া॥
রত্নমাণিক্যের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভিল।
যুদ্ধ ভঙ্গ দিয়া রাজা গোপনে রহিল॥
গোমতী উজানে গেল উদয়পুর পূর্ব্ব।
রাণী সঙ্গে বহু সৈন্য আর মন্ত্রী সর্ব্ব॥
মীরখঞ্জন নামেতে রাজার শ্বশুর।
নির্ভয়নারায়ণ ছিল রণে মহাশূর॥

---

(১) ইহার পরে বলিভীমনারায়ণের কি অবস্থা ঘটিল, জানা যায় না। সম্ভবতঃ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

গজভীম নারায়ণ ময়ূরধ্বজ নাম।
জয়মর্দ্দন সুবা হংসধ্বজ অনুপাম ॥
রাজার সঙ্গে এই সব আছে যে ছাপিয়া।
দেওয়ান চম্পকরায় গেল পলাইয়া ॥
তান সঙ্গে রাজ মাতুল অনন্তরাম নাম।
প্রাণভয়ে বনপথে গেল চট্টগ্রাম ॥
দ্বারিকা নৃপতি হৈল নরেন্দ্রমাণিক্য।
রাজাকে আনিতে চাহে কহি মিষ্ট বাক্য ॥
দূত পাঠাইয়া দিল রাজার নিকট।
ধর্ম্মাধর্ম্ম করি আনে ফলেতে কপট ॥
সেই ধর্ম্ম জানি রাজা উদয়পুর আসিল।
পাত্র মিত্র যত রাজার কএদ করিল ॥
মন্ত্রিবর্গ কতজন মারিয়া ফেলিল।
আর কতজন তাকে কারাগারে দিল ॥
অনন্তরাম চম্পকরায় চট্টগ্রামে ছিল।
নরেন্দ্রমাণিক্য রাজা এই তত্ত্ব পাইল ॥
বাহাদুর খাঁ সঙ্গেত পাঠায়ে দুই হাতী।
চট্টগ্রাম সুবা সঙ্গে করিতে পিরীতি ॥
চম্পকরায় অনন্তরাম এ কথা শুনিল।
তথা হৈতে পলাইয়া ভুলুয়া আসিল ॥
বাহাদুর খাঁ জমাদার চট্টলে না পায়।
ভুলুয়াতে ধরিল অনন্ত চম্পক রায় (১) ॥
রত্নমাণিক্য উকীল আমির খাঁ ছিল।
বুইদ্ধমন্ত সেইজন দুর্বৃত্ততা ভাল ॥
চম্পক রায়ের বার্ত্তা আমির খাঁ পাইয়া।
তুরু খাঁ অনন্ত চম্পক আনিল কাড়িয়া ॥
তারা দুইজন ত্বরা ঢাকাতে লৈয়া গেল।
ঢাকা নিয়া দুর্যোধন নিকটেতে দিল ॥

---

(১) নরেন্দ্রমাণিক্যের প্রেরিত লোকে ভুলুয়াতে যাইয়া অনন্ত ও চম্পক রায়কে ধৃত করিয়াছিল।

আমির খাঁ দুর্য্যোধন আর চম্পক রায়।
তিনে মিলি যত্ন রত্নমাণিক্য সহায়॥
নবাবেতে কহে রত্নমাণিক্য পরাভব।
নরেন্দ্রমাণিক্য হৈয়া করিল লাঘব॥
ক্রোধ হৈয়া নবাব সৈন্য দিল পাঠাইয়া।
নরেন্দ্রমাণিক্য রাজা আনিল ধরিয়া॥
রত্নমাণিক্য পুন হৈল নরেশ্বর।
দ্বিজে ভূমি দান রাজ্য শাসন তৎপর॥
চম্পক রায় দেওয়ান ছিল হৈল যুবরাজ।
তার ভগ্নী দ্বিতীয়া নাম করে পুণ্য কাজ॥
মেহারকুল উদয়পুর দীর্ঘিকা খনিল।
দৌল সেতু চণ্ডীমুড়া চণ্ডিকা স্থাপিল॥
করিল বিবিধ দান মঙ্গল কারণ।
পুন শুন মহারাজ নির্ব্বন্ধ কথন॥
বিশ্বাসেতে অবিশ্বাস দৈবের ঘটন।
যেই মতে হইলেক রাজার মরণ॥
রামমাণিক্য পুত্র ঘনশ্যাম ঠাকুর।
মুর্শুদাবাদ তুলে ছিল নবাব হুজুর॥
রাজা হইবার ফৌজ লইয়া আসিল।
রত্নমাণিক্য রাজা এই তত্ত্ব পাইল॥
মন্ত্রিবর্গ কহিলেন যুদ্ধ করিবার।
সংগ্রাম করিতে মত নাহিক রাজার॥
পুনঃপুনঃ মন্ত্রী কহে না শুনে রাজন।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম না যাএ খণ্ডন॥
ঘনশ্যাম ঠাকুর আইসে রাজার যে পুরী।
সিংহাসন হতে লামায় রাজহস্তে ধরি॥
তথাচ না জানে রাজা মরিব আপনে।
রত্নমাণিক্য বন্দি করিল তখনে॥
রাজা বলে ভাই মহেন্দ্রক্ষণেতে আসিল।
মহেন্দ্রমাণিক্য নাম রাজাএ রাখিল॥

রাজকীর্ত্তি নারায়ণ খামার বাড়ীতে।
রত্নমাণিক্য বন্দি রাখিল তথাতে॥

গঙ্গানারায়ণী ধাত্রী কহিল অনেকে।
রত্নমাণিক্য বধিবারে কহে দুষ্ট লোকে॥
একদেশে দুই রাজা না হয়ে উচিত।
একবনে দুই ব্যাঘ্র থাকে কদাচিত॥
এক স্ত্রীতে দুই স্বামী না থাকে কখন।
এক কোষে দুই খড়্গ না হয়ে পোষণ॥
হেন মতে রাজা স্থানে কুতর্ক জন্মাএ।
ভ্রাতৃবধ ভয় রাজা না চিন্তিল তাএ
কত দিন পরে নৃপের আদেশ হইয়া।
দূতে মারে রত্নমাণিক গলাতে চাপিয়া॥

ত্রিপদী ছন্দ

রাজার মরণ দেখি জলপূর্ণ হৈল আক্ষি
আক্ষেপএ রাণী রত্নাবতী।
কোন জন্মে ছিল পাপ রাজ-রাণীর এত তাপ
কোন বিধি এমত করিল।
পতি মুখ দরশিয়া শোকেতে আকুল হৈয়া
পুনঃপুনঃ আক্ষেপ করয়ে।
চিতা স্থানে গিয়া রাণী প্রদক্ষিণ পুনিপুনি
রাজপুরী দরশন করে।
যদি এবে ধর্ম্ম থাকে স্বর্ণদ্বার দেখে লোকে
ধর্ম্মাগ্নিএ দাহন করএ।
এই বাক্য বলি রাণী স্বর্ণদ্বার দেখে পুনি
সেইক্ষণে অগ্নিয়ে দহিল।
অগ্নি দেখিয়া সতী চিতা প্রবেশ শীঘ্রগতি
রাম নাম ইষ্টেতে অর্পণ।
রাজা রাণী স্বর্গে গেল রাণীর সতীত্ব রৈল
সর্ব্ব লোকে ধন্য ধন্য করে।

মহেন্দ্রমাণিক্য নৃপতি লোকে কহে পাপ মতি
রাজ বংশে কলঙ্ক রাখিল।

পদবন্ধ

রত্নমাণিক্য রাজার বয়স নিরূপণ।
পঞ্চ বৎসর বয়স হইছে রাজন॥
বত্রিশ বৎসর রাজা রাজত্ব করিছে।
ছত্রিশ বৎসর বয়সে মৃত্যু যে হইছে॥
রত্নমাণিক্য রাজার স্বভাব সুস্থির।
আত্ম পর ভেদ রাজার না ছিল শরীর॥
মহেন্দ্রমাণিক্য ভ্রাতৃবধে হইল পূর্ণ।
দিনে দিনে শুষ্ক তনু খাইতে না পারে অন্ন॥
শয়নে স্বপনে দেখে যদি নিদ্রা হয়ে।
গলাচাপি ধরে তাকে প্রাণ কাঁপে ভয়ে॥
এই মতে আড়াই বৎসর রাজত্ব শাসিল।
উদয়পুরে মহেন্দ্রাদি সাগর (১) খনিল॥
কালপূর্ণ হৈয়া রাজা মৃত্যুপদ পাইল।
অল্পদিন ভোগজন্যে অকীর্ত্তি রাখিল॥
সৎসঙ্গে বহুরঙ্গে থাকিব রাজন।
অসৎপন্থগামি হৈলে ত্বরিতে পতন॥
বৃদ্ধ মুখে এইমত শুনিছি কথন।
সে সব বৃত্তান্ত আমি কহিল রাজন॥
রত্ন মহেন্দ্রমাণিক্য এ দুই রাজন।
উজীর কহে মহারাজা হৈল সমাপন॥

ইতি রাজখণ্ডতত্ত্বে রত্ন-মহেন্দ্রমাণিক্য রাজ কথনং সমাপ্ত।

---

(১) উদয়পুরস্থ খিলপাড়া মৌজায় মহেন্দ্রসাগর অবস্থিত। এই জলাশয়ের পরিসর ২৮০ X ১৪০ গজ। ইহা ১/১০ গণ্ডা ভূমি লইয়া খনিত হইয়াছে।

ধর্ম্মমাণিক্য খণ্ড

রাজা বলে ধর্ম্মমাণিক্য রাজা ছিল।
চম্পকরায় যুবরাজ রাজা না হইল ॥
উজীর বলে মহারাজা বলি বিবরণ।
মহেন্দ্রমাণিক্য রাজার হইল মরণ ॥
সেই ক্ষণে দুর্য্যোধন বৈসে সিংহাসন।
চম্পকরায় যুবরাজ ছিল অন্য জন ॥
শক্তিমন্ত্র উপাসনা ছিল মহারাজ।
শক্তিরূপে মুক্তিদাতা সুতা গিরিরাজ ॥
ধর্ম্মেতে পালিল ক্ষিতি করি রাজনীতি।
নানা সুখে রাজরাজ্যে প্রজার বসতি ॥
ধর্ম্মমাণিক্য মহারাজা ধর্ম্মশীলা রাণী।
এইমত গজসিক্কা হএ রাজধানী ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র নাম ছিল ঠাকুর গঙ্গাধর।
তাহান কনিষ্ঠ হএ ঠাকুর গদাধর ॥
যুবরাজ করিলেন ভ্রাতা চন্দ্রমণি।
পুত্র যুবরাজ নহে ভেদ হৈব জানি
অনন্তরাম উজীর জ্ঞানেত বিহিত।
রণভীমনারায়ণ রণে সাবহিত ॥
পরগণে খণ্ডল নাম ডিমাতলি গ্রাম।
মত্ত একহস্তী বান্ধে করিয়া বিশ্রাম ॥
রাজমঙ্গল হস্তী নাম রাখিল রাজন।
এইমত গজ লোকে না দেখে কখন ॥
রাজমঙ্গল হস্তী বান্ধে ত্রিপুর সেনাপতি।
সেই হেতু নাম হৈল গজভীম খ্যাতি ॥
উদয়পুর পূর্ব্বদিকে হিরাপুর স্থান।
সেই বনে জগতবেড় (১) করিল রাজন ॥

---

(১) পশ্বাদি শিকারের নিমিত্ত পাটের দড়ি নির্ম্মিত সুদৃঢ় জাল দ্বারা বিস্তীর্ণ বনভূমি বেড় দেওয়া হয়, তাহাকে জগতবেড় বলে।

সৈন্য সমে নাজির রাজকীর্ত্তি নারায়ণ।
তিন মাসে সেই বেড় করে সমাপন॥
ধর্ম্মমাণিক্য ছিল ক্রোধেতে প্রচণ্ড।
অল্প অপরাধে প্রজার করে মহদ্দণ্ড॥
কর দিত হস্তী খেদা করিয়া উৎপন্ন।
বৎসরেত হস্তী কর নিয়ম তিপ্পান্ন॥
উদয়পুরে মঘ প্রজা বহু সৈন্য ছিল।
সেই গর্ব্বে নৃপতিকে ভয় না করিল॥
তাহার চরিত্র রাজা দূত মুখে শুনে।
কিমতে নিগ্রহ করা চিন্তিলেক মনে॥
এক দিন মঘ সব নিমন্ত্রণ করি।
খাওয়াইল নানা মত নৃপতির পুরী॥
মদ্য মাংস খাইয়া মঘে বিহ্বল হইল।
সেইক্ষণে দারীশ্বরে কপাট মারিল॥
নৃপতির আজ্ঞা পাইয়া দ্বারী কতজন।
খড়্গাঘাতে করে মঘের মস্তক ছেদন॥
হেন মতে বহু সৈন্য প্রাণে হত হৈল।
প্রাচীর লঙ্গিয়া আর যত পলাইল॥
তদবধি মঘ প্রজা নিগ্রহ হইল।
রাজার অনিষ্ট হেতু মনেতে চিন্তিল॥
সদরের হস্তী বাকী হইল যখন।
মুর্শুদাবাদ রাজ উকীল ছিল একজন॥
পুনঃপুনঃ পত্র লিখে হস্তী পাঠাইতে।
রাজকর মহারাজা পাঠাইতে ত্বরিতে॥
এই সব পত্র নাহি শুনএ রাজন।
ছত্রমাণিক্য পরপৌত্র (১) ছিল একজন॥
জগতরাম নাম ছিল গুণে মতিমান।
ঢাকাতে বসতি তার জ্ঞাতির সন্তান॥

(১) পরপৌত্র—প্রপৌত্র।

জাতিয় ত্রিপুর লোক নাহি সমাগম।
ত্রিপুর নৃপতি হৈতে করে নানাশ্রম॥
বহু দিনাবধি সেই করিছে যতন।
কোনরূপে ত্রিপুরার হইতে রাজন॥
ধর্ম্মমাণিক্যের হস্তী কর বাকী হৈল।
জগতরাম সেই কালে দরকাস্ত দিল॥
নবাবেতে জানাএ যে জগতরাম ঠাকুর।
বাকী হস্তী দিব রাজ্য পাইলে ত্রিপুর॥
নবাবে হুকুম দিল সৈন্য সমভ্যার।
বহু সৈন্য লৈয়া আইসে রাজা হইবার॥
স্বর্ণদ্বার আছে (১) শুনি ত্রিপুর রাজার।
কাঙ্গালী দুঃখিত মঘ সৈন্য সমভ্যার॥
মাতৃ বলে শুন পুত্র আমার বচন।
যুদ্ধ জয় হৈলে তুমি পাইবা বহুধন॥
সৈন্য সভে উদয়পুরে যুদ্ধ আরম্ভিল।
জগতরামের সৈন্য যুদ্ধেতে পড়িল॥
আর কত সৈন্য তার ধরিয়া রাখিল।
পাএত নিগড় দিয়া পরেতে মারিল॥

---

(১) উদয়পুরে রাজভবনের প্রবেশদ্বার স্বর্ণময় ছিল। সেই সিংহদ্বারের নাম ছিল—"স্বর্ণদ্বার" বা "সুবর্ণদ্বার"। রাজমালা দ্বিতীয় লহরেও এই দ্বারের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে; যথা,—

"পরে মমারক খাঁকে পিঞ্জরে রাখিয়া।
সুবর্ণ দ্বারের বাহির রাখিলেক নিয়া॥"

রাজমালা—২য় লহর, ৫০ পৃষ্ঠা।

আলোচ্য লহরে সন্নিবিষ্ট মহারাজ রত্নমাণিক্যের মহিষী মহারাণী রত্নাবতী, নিহত পতির চিতারোহণ কালে যে অভিসপ্তাত বাক্যে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতেও স্বর্ণদ্বারের উল্লেখ পাওয়া যায়,—

"চিতাস্থানে গিয়া রাণী, প্রদক্ষিণ পুনি পুনি,
রাজপুরী দরশন করে।
যদি এবে ধর্ম্ম থাকে, স্বর্ণদ্বার দেখে লোকে,
ধর্ম্মাগ্নিতে দাহন করয়ে।"

রত্নমাণিক্য খণ্ড—২৪ পৃষ্ঠা।

যুদ্ধে পরাভব হৈয়া ভঙ্গ দিল তাএ।
কোন স্থানে স্থিতি নাহি ঢাকা চলি যাএ॥
যুদ্ধ বিবরণ করে নবাব বিদিত।
মহা ক্রোধ হৈয়া নবাব বলিল ত্বরিত॥
ফৌজের সরদার তরে বলিল তখন।
শীঘ্র চল উদয়পুর যুদ্ধের কারণ॥
এক ভাগ ফৌজ গেল গোমতী নদী দিয়া।
আর ভাগ ফৌজ আইসে নুরনগর হৈয়া॥
দূত মুখে এই তত্ত্ব শুনিল রাজন।
উদয়পুর ফৌজ আসি যুদ্ধ আরম্ভন॥
রাজ সৈন্যে নানা মতে যুদ্ধ দিয়া ছিল।
যুদ্ধে ভঙ্গ মহারাজা গোপনে রহিল॥
উদয়পুর সেই সৈন্য কত দিন ছিল।
রাজ্যভ্রষ্ট হৈয়া লোক পর্ব্বতেত গেল॥
চল্লিশ হাজার টাকা নৃপতির সনে।
বাছাড়ে (১) সঙ্গেত নিল পর্ব্বতে গোপনে
রাজকীর্ত্তি নাজির রাণীর সমভ্যার।
গোমতী উজানে গেল বসতি রাজার॥
রাজমঙ্গল আদি করি যত হস্তী ছিল।
রাজধানী যাহা পাইল লুটিয়া যে নিল॥
তার পরে রাজাস্থানে উকীলে লিখিল।
সে পত্র পাইয়া রাজা মুর্শুদাবাদ গেল॥
ধর্ম্মমাণিক্য রাজা ছিল জ্ঞানবান।
জগতশেট দ্বারেতে যে করিল সন্ধান॥
পরে জগতশেট হৈল সাপক্ষ রাজার।
নবাব সঙ্গে দরশন রাজ ব্যবহার॥
নবাব রাজাকে দেখি বলে কি কারণ।
যেমত শুনিছি রাজা না দেখি লক্ষণ॥

---

(১) বাছাড়—বাছাল। বাছালের বিবরণ রাজমালা প্রথম লহরের ২১৬ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে।

জগতশেট স্থানে নবাব বুঝিতে লক্ষণ।
করিয়া পরীক্ষা তুমি বুঝিবা রাজন ॥
ভাল তরোয়াল মধ্যে মন্দ সাজ দিয়া।
মন্দ তরোয়াল ভাল সজ্জিত করিয়া ॥
বহু মূল্য রত্নাঙ্গুরী মন্দ রঙ্গ জড়িল।
অল্প মূল্য রত্ন মধ্যে ভাল রঙ্গ দিল ॥
ভাল অশ্বে মন্দ সাজ দেখিতে কুৎসিত।
মন্দ অশ্বে ভাল সাজ দেখিতে শোভিত ॥
অস্ত্রাদি ঘোটক রত্ন মূল্য যেবা হৈল।
রাজাতে কহিল শেট মূল্যাদি অতুল ॥
রাজায় দেখিয়া কহে যার যেই মূল্য।
নবাবেতে কহে শেট বলিছে সাকুল্য ॥
রাজা হেন প্রত্যয় নবাব তখনে করিল।
অশ্ব হস্তী আর খিলাত নৃপতি পাইল ॥
খিলাত পাইয়া রাজা আনন্দিত মন।
বিদায় লইয়া রাজা দেশে আগমন ॥
এই মত কত কাল রাজত্ব করিয়া।
নানা সুখে রাজ্য ভোগ দ্বিজে ভূমি দিয়া ॥
মেহেরকুল ছত্রগ্রাম কস্‌বা ধর্ম্মপুর।
স্থানে স্থানে খনিল ধর্ম্ম নামেত সাগর ॥
তিল ধেনু তুলাপুরুষ আর যে বিপুল।
শাস্ত্র প্রমাণ দান ভূম্যাদি অতুল ॥
মহাভারত আদি করি যতেক পুরাণ।
শুনিয়া নৃপতি দিল দক্ষিণা প্রমাণ ॥
এই মতে অষ্টাদশ বর্ষ পরিমাণ। (১)
রাজ্য শাসে নৃপমণি ধর্ম্মের সমান ॥
কালবশ হৈয়া রাজা কণ্ঠে দুর্গা বাণী।
প্রাণত্যাগ করি গেল স্বর্গেতে তখনি ॥

---

(১) এই নির্দ্ধারিত সময় বিশুদ্ধ নহে। মধ্যমণিতে এ বিষয় আলোচিত হইবে।

ত্রিপদী ছন্দ

ধর্ম্মমাণিক্য নৃপতি ধর্ম্মেতে পালিয়া ক্ষিতি
রাজা গেল বিশ্বেশ্বরের স্থান।
শক্তিমন্ত্রে উপাসনা রাজা করে প্রার্থনা
শক্তি দেবী মুক্তির কারণ।
গঙ্গাধর গদাধর, দুই পুত্র সহোদর
শ্রাদ্ধ করে শাস্ত্রের বিহিত।
নানা মতে দান করে, রাজা তুষ্ট স্বর্গপুরে
ব্রাহ্মণেতে দিল বহু ধন।
এই মত দান ধর্ম্ম সাঙ্গ হৈল শ্রাদ্ধ কর্ম্ম
রাজা ধর্ম্মমাণিক্য কথন।
ধর্ম্মমাণিক্য আখ্যায়ন উজীর কহে ব্যাখ্যায়ন
কহিলেন নৃপতি আদেশে।

ইতি রাজখণ্ড তত্ত্বে রাজা ধর্ম্মমাণিক্য প্রসঙ্গ সমাপ্ত।

মুকুন্দমাণিক্য খণ্ড

রামগঙ্গামাণিক্য পুন জিজ্ঞাসে কথন।
আমা পিতামহ পিতা মুকুন্দ রাজন ॥
কিমতে শাসন ছিল কিবা ব্যবহার।
কত বৎসর শাসে রাজ্য কহিবা তাহার ॥
উজীর কহে ধর্ম্মমাণিক্য কাল হয় (১)।
অরাজক হৈয়া রাজ্য সেইত সময় ॥
চন্দ্রমণি যুবরাজ বৈষ্ণব চরিত্র।
রাজ সিংহাসনে বৈসে হইয়া পবিত্র ॥

---

(১) কাল হয়—স্বর্গীয় হয়।

অভিষিক্ত করে দ্বিজে বেদের বিহিতে (১)।
দরিয়ার বাদ্যে (২) সেলাম জানায় লোকেতে ॥
মুকুন্দমাণিক্য নাম গজসিক্কা হৈল।
প্রভাবতী মহারাণী মোহরে লিখিল ॥
তান ছিল দুই রাণী শ্রেষ্ঠা প্রভাবতী।
জৈন্তা রাজা জ্ঞাতি সুতা ধর্ম্মে চিল মতি ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র পাঁচকড়ি মুর্শুদাবাদ তুলে।
কৃষ্ণমণি জয়মণি তিন ভাই ছিলে ॥
রুক্মিণী রাণীতে জন্মে হরি জয়মণি (৩)।
দুই পক্ষে পঞ্চ পুত্র ছিল নৃপমণি ॥
জয়মণির মৃত্যু হৈল অতি শিশু কাল।
ভদ্রমণি কালপ্রাপ্ত তার পরে হৈল ॥
পার্শি শাস্ত্রেতে ভাল বিদ্যা ছিল জ্ঞান।
যেমত রাজার পুত্র তেমত বিদ্বান ॥
বৃন্দাবন চন্দ্র গোসাই নিত্যানন্দ বংশ।
তান কীর্ত্তি কত বলি তিনি দেব অংশ ॥
মুকুন্দমাণিক্য রাজার তিনি ইষ্টদেব।
রাজা মনে করে ইষ্ট নামে স্থাপে দেব ॥
ইষ্ট মতে ধাতুর বিগ্রহ নির্ম্মইল।
বৃন্দাবন চন্দ্র ইষ্ট নামেতে রাখিল (৪) ॥

---

(১) রাজ্যাভিষেক পদ্ধতি পরবর্ত্তী মধ্যমণিতে পাওয়া যাইবে।

(২) ত্রিপুরার এক সম্প্রদায় 'দরিয়া দফা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহারা বাদ্য বাজাইয়া রাজার সেলামী জানাইত। এই বাদ্যকে 'দরিয়ার বাদ্য' বা 'সেলামবারি বাদ্য' বলা হইত।

(৩) এ স্থলে 'জয়মণি' নাম লিপিকার প্রমাদে ঘটিয়াছে। 'ভদ্রমণি' নাম হইবে। জয়মণি প্রথমা মহিষীর গর্ব্ভজাত কুমার, তাঁহার নাম ইহার উপরের পংক্তিতে লিখিত হইয়াছে।

(৪) মহারাজ মুকুন্দমাণিক্য স্বীয় দীক্ষাগুরুর নামানুসারে বৃঁন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহের বিবরণ পশ্চাদ্বর্ত্তী মধ্যমণিতে পাওয়া যাইবে।

দশ কর্ম্ম (১) করাইল যথাবিধি মতে।
উদয়পুর স্থাপিলেক মন্দির তাহাতে ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম নানা মতে করে নৃপবর।
স্থানে স্থানে দ্বিজে ভূমি দিলেক তৎপর ॥
উদয়পুর তিষিনা ফাগুনকরা গ্রাম।
সাগর খনিল রাজা মুকুন্দ সাগর নাম ॥
মুকুন্দমাণিক্য রাজা ছিল জ্ঞানবন্ত।
মর্য্যাদার ভয় নৃপ করিত অত্যন্ত ॥
গদাধর নাজির হৈল পুণ্যবন্ত অতি।
তার পিতা রাজকীর্ত্তি নাজির যে খ্যাতি ॥
হুজুরের কর হস্তী বহু বাকী পড়ে।
মহশুল (২) পাঁচকড়ি ঠাকুর উপরে ॥
পাঁচকড়ি পত্র লিখে হস্তী দিতে কর।
ভাল হস্তী নাহি মিলে হইল দুষ্কর ॥
ফৌজদার পাঠাইল রাজ তদন্তর।
উদয়পুর আইসে ফৌজ (৩) লইতে হস্তী কর ॥
রাজপুত্র জগন্নাথ ঠাকুর পুণ্যবান।
তান পুত্র সূর্য্যপ্রতাপ উজীর আখ্যান ॥
তাহার পুত্র হএ হরিধন ঠাকুর।
তাহান তনয় দুই বিক্রমে প্রচুর ॥
রুদ্রমণি জ্যেষ্ঠ হয় হাড়িধন কনিষ্ঠ।
রুদ্রমণি ছিল সুবা রাজার অভীষ্ট ॥

---

(১) দশ কর্ম্ম,— শাস্ত্রানুমোদিত দশবিধ সংস্কারকে দশ কর্ম্ম বলা হয়। হারীত সংহিতা, সংস্কার তত্ত্ব, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, মলমাস তত্ত্ব প্রভৃতি বহু শাস্ত্রগ্রন্থে দশবিধ সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। দশ-কর্ম্ম পদ্ধতি গ্রন্থে এ বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভবদেব ভট্ট কর্ত্তৃক সামবেদীয়গণের, পশুপতি ভট্ট কর্ত্তৃক যজুর্ব্বেদীয় এবং কালেশি কর্ত্তৃক ঋক্‌বেদীয়গণের আচরণীয় দশকর্ম্ম পদ্ধতি রচিত হইয়াছে। সকল গ্রন্থের মতেই নিম্নোক্ত দশটী সংস্কারকে দশকর্ম্ম বলা হয় ; — (১) গর্ভাধান, (২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) জাতকর্ম্ম, (৫) নিষ্ক্রামণ, (৬) নামকরণ, (৭) অন্নপ্রাশন, (৮) চূড়াকরণ, (৯) উপনয়ন, (১০) বিবাহ।

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকালে, মনুষ্যের ন্যায় বিগ্রহকে পূর্ব্বোক্ত দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত করিতে হয়। এ স্থলে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে।

(২) মহশুল—তাগিদ।

(৩) ফৌজ—সৈন্য।

পুনঃ পুনঃ করে খেদা (১) রুদ্রমণি সুবাএ।
কদাপিহ ভাল হস্তী নামিলে খেদাএ ॥
ফৌজদার আগমন সুবাএ শুনিয়া।
রাজা স্থানে পত্র লিখি দিল পাঠাইয়া ॥
পত্র লিখে খেদাএতে হস্তী না পাইয়া।
রাজ আজ্ঞা হৈলে ফৌজ দিব খেদাইয়া ॥
রাজা কহে পাঁচকড়ি নবাব নিকট।
ফৌজদার খেদাইলে হইবে সংকট ॥
এইমত মহারাজা মনে বিবেচিয়া।
ফৌজদার নিকটে পত্র দিল পাঠাইয়া (২) ॥
পত্র দেখি ফৌজদার হইল কুপিত।
রাজ প্রবঞ্চনা হেল বুঝে বিপরীত ॥
সেইক্ষণে নৃপ তলপ দিল ফৌজদার।
মুকুন্দমাণিক্য নৃপ রাখে কারাগার ॥
কৃষ্ণমণি সঙ্গে ছিল তনয় নৃপের।
আর গদাধর পুত্র ধর্ম্ম মাণিক্যের ॥
রাজা কারাগারে দেখে সৈন্য ত্রিপুরার।
চতুর্দ্দিগে বেড়ে সৈন্যে মারিতে ফৌজদার ॥
অপমান পাইয়া নৃপ বিষ করে পান।
বিষতেজে মহারাজা ত্যজিল জীবন ॥
রাজা মৃত্যু দেখি সৈন্যে মনে বিমর্শিল।
রাজ পুত্র তুলে আছে যুদ্ধ নহে ভাল ॥
প্রাতঃকালে মৃত রাজা নিকালিয়া দিল।
ত্রিপুরার প্রজালোকে তখনে আনিল ॥
ফৌজদার সঙ্গে বিবাদ হইল যখন।
মেহারকুল বাগশিমৈল রাণীর গমন ॥
রাণী নাহি ছিল বলি ভাবে মন্ত্রিগণ।
তৈল মধ্যে রাখে রাজা করিয়া যতন ॥

---

(১) খেদা—বন্যহস্তী ধৃত করিবার এক প্রকার প্রণালী। রাজমালা তৃতীয় লহরের মধ্যমণিতে খেদার বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(২) রুদ্রমণি সুবার লিখিত পত্র ফৌজদার সমীপে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

নৃপ মৃত্যু শুনি রাণী হইল মোহিত।
সপ্ত দিনে উদয়পুর হৈল উপস্থিত ॥
তৈল কটা হনে নৃপ নিকালে (১) ত্বরিত।
সহগামী হৈতে চলে রাজার সহিত ॥
ফৌজবিচার নারায়ণ শ্রেষ্ঠ সেনাপতি।
রুদ্রমণি সুবা রাজা করিতে তার মতি ॥
মন্ত্রণা করিয়া কহে রাণীর বিদিত।
অরাজক করি যায় রাজার সহিত ॥
এ বলিয়া মৃত রাজা আটক রাখিল।
প্রজা সম্বোধিয়া রাণী তখনে বলিল ॥
রাজপুত্র পাঁচকড়ি ঠাকুর তুলেতে।
ধর্ম্মমাণিক্য পুত্র গঙ্গাধর ঢাকাতে ॥
ফৌজবিচার কহিলেক লোকের সঙ্গতি।
আর যত প্রধানস্তগণ সেনাপতি ॥
নব্য রাজা সিংহাসনে বসিয়া আসন।
মৃত রাজা দহিবারে আদেশ করেন ॥
তোমা বংশে রুদ্রমণি রাজা হৈতে পারে।
রাণীর আজ্ঞা হৈলে রাজা করিব তাহারে ॥
পুনঃ পুনঃ কহে লোকে রাণীর নিকট।
রাণী কহে কিবা বল এ বড় সঙ্কট ॥
বিলম্ব না কর যাব রাজার সঙ্গেত।
পরে তোমা মনে যাহা করহ বিহিত ॥
সেইকালে রাণী আজ্ঞা সকলে ভাসাএ (২)।
রুদ্রমণি সুবাকে সিংহাসনেতে বৈসাএ ॥
জয়মাণিক্য নাম তাহান করিছে।
দরিয়া বাদ্যে সেলাম তাতে জানাইছে ॥
পাঁচকড়ি ঠাকুর ছিল নবাব সদন।
বিদায় হইয়া আইসে দেশে আগমন ॥

---

(১) নিকালে—বাহির করে।
(২) ভাসাএ—ভাসায়, প্রচার করে।

কৃষ্ণমণি পত্র পদ্মাতীরেতে পাইল।
পিতার মরণ রাজা জয়মাণিক্য হৈল॥
এই পত্র পাইয়া তেনি ফিরিয়া যে যাএ।
মুর্শুদাবাদ গঙ্গাতে পৌঁছিল ত্বরাএ॥

ত্রিপদী ছন্দ

পাঁচকড়ি নৃপ সুত পিতৃ শোক অবিরত
আর শোক মাতৃ সহগামী।
স্বর্গে গেল নৃপ শুনি রাজা হৈল রুদ্রমণি
নবাবেত কহে বিবরণ।
নবাবে শুনিল যত আশ্বাসিল নৃপ সুত
কহে রাজা তুমি সে রাজ্যের।
গমির খিলাত (১) কাল সোণালি জড়িত ভাল
খিলাত পাএ পাঁচকড়ি ঠাকুর।
শ্রাদ্ধ আয়োজন করে ক্রিয়া করে গঙ্গাতীরে
মুকুন্দমাণিক্য আর রাণী।
বেদমন্ত্র নানা দান করিয়া যে সমাধান
গঙ্গাতীরে দ্বিজেতে অর্পণ।
ঠাকুর যে কৃষ্ণমণি আর পুত্র হরিমণি
বিধি মতে শ্রাদ্ধ রাজধানী।
মুকুন্দমাণিক্য রাজন শ্রাদ্ধ হৈল সমাপন
সপ্ত বৎসর করিল রাজত্ব।
মুকুন্দমাণিক্য পরে সপ্ত দিন অভ্যন্তরে।
সহগামী রাণী প্রভাবতী।
নৃপতির শ্রাদ্ধ পরে সপ্ত দিন অন্তরে
রাণীর শ্রাদ্ধ এইসে কারণ। (১)
মুকুন্দমাণিক্য কথন হইলেক সমাপন
উজীর কহে বিস্তার করিয়া।

ইতি রাজখণ্ড তত্ত্বে মুকুন্দমাণিক্য রাজ কথনং সমাপ্ত।

---

(১) গমির খিলাত—উৎসবের উপহার? 'গমি' শব্দের প্রকৃত অর্থ এস্থলে খাটে না।

(২) এই কার্য্যের শাস্ত্রীয় প্রমাণ দুর্লভ দেখা যাইতেছে। অনুকূল মত পাইলে মধ্যমণিতে আলোচনা করা হইবে।

জয়মাণিক্য খণ্ড

নৃপতি জিজ্ঞাসা করে উজীর অন্তরে।
জয়মাণিক্য রাজার কিবা অভ্যন্তরে ॥
পাঁচকড়ি ঠাকুর ছিল নবাব বিদিত।
কিবা মতে রাজ্যাধিপ কহ বিস্তারিত ॥
উজীর কহে জয়মাণিক্য হৈল নৃপবর।
ফৌজদার নিকালিয়া দিলেন তৎপর ॥
জয়মাণিক্য রাজা যশোদা নাম রাণী।
এই নামে গজসিক্কা করিল আপনি ॥
রাজ্যের শাসন করে হৈয়া নৃপবর।
প্রজাতে সুখ্যাতি তান হইল বিস্তর ॥
নবাব সাক্ষাতে আছে পাঁচকড়ি ঠাকুর।
সুখ্যাতি পাইল রাজা ভাবিত বিস্তর ॥
রাজার জামাতা শ্রীনাম সুবা হৈল।
উত্তরসিংহ নারায়ম উজীর করিল ॥
গৌরীপ্রসাদ নাজির হইল তাহান।
জয়সিংহ কারকন বিক্রমে বাখান ॥
এই মত জয়মাণিক্য প্রজার শাসন।
পাঁচকড়ি দরখাস্ত রাজ্যের কারণ ॥
বাকী হস্তী কিস্তিবন্দি করিয়া তখন।
রাজত্ব ফরমান (১) লৈয়া রাজ্যে আগমন ॥
সিংহাসনে বৈসে রাজা করি শুভক্ষণ।
নৃপতি নামেতে ভূমি দ্বিজেতে অর্পণ ॥
ইন্দ্রমাণিক্য রাজা দুর্গা মহারাণী।
রাজা রাণী নামে গজসিক্কা রাজধানী ॥
কৃষ্ণমণি অনুজ হইল যুবরাজ।
গঙ্গাধর বড় ঠাকুর করে মহারাজ ॥

---

(১) ফরমান—আদেশ, সনন্দপত্র।

যুগিরাম সুবা ছিল রামধন উজীর।
ধর্ম্মমাণিক্য জামাতা সে বড়ই চতুর॥
বদঙ্গ নাম ত্রিপুর দেওয়ান করিল।
রাজ্যেতে অখ্যাতি তান অদ্যাপি রহিল॥
জয়মাণিক্য মহারাজা পাত্র মন্ত্রী লৈয়া।
উদয়পুর দক্ষিণে মতাই রহে গিয়া॥
মতাইতে রাজধানী করিল রাজন।
ত্রিপুরা পাহাড় দক্ষিণ করএ শাসন॥
দক্ষিণ ত্রিপুরা লোক জয়মাণিক্য মতে।
তাহান মঙ্গল ধ্যায়ে বাঙ্গাল সহিত॥
ইন্দ্রমাণিক্য ত্রিপুর বাঙ্গাল সহিত।
জয়মাণিক্য ধরিবারে ছিলেক চেষ্টিত॥
কত দিন পরে জয়মাণিক্য মন্ত্রী সনে।
সন্ধানে ধরি ইন্দ্রমাণিক্য রাজনে (১)॥
নবাব সাক্ষাতে নৃপ বদ্ধ পাঠাইল।
জয়মাণিক্য সদরেত মন্ত্রণা করিল॥
কাদবার জগতরাম ভ্রাতা নরহরি।
যুবরাজ করে তাকে রাজ্য অধিকারী॥
ইন্দ্রমাণিক্যের তাহুত (২) বাকী পরে কর।
তাহান রাজত্ব নিতে মন্ত্রণা পরস্পর॥
মুর্শুদাবাদ দরবার নানামতে করে।
দুই রাজা পক্ষে বিবাদ করে পরস্পরে॥
হস্তী কর বাকী পরে তার মূল্য টাকা।
প্রতি হস্তী হাজার টাকা দিতে ছিল ঢাকা॥
নিরূপিত কর বাকী বিবাদ রাজন।
এক রাজ্যে তিন রাজা বাকী সে কারণ॥
ধর্ম্মমাণিক্যের পুত্র নাম গঙ্গাধর।
উদয়মাণিক্য নাম হৈয়া নরেশ্বর॥

---

(১) জয়মাণিক্য নবাবকর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন। মধ্যমণিতে এতদ্বিবরণ আলোচিত হইবে।
(২) তাহুত— বন্দোবস্ত মতে দেয় রাজস্ব।

ইন্দ্রমাণিক্য বাকী হস্তী তাহুত করিয়া।
নবাবে পরোয়ানা (১) দিল বহু আশ্বাসিয়া ॥
রাজ্যাধিপতি হৈয়া হরষিত মন।
নবাবেতে বিদায় হৈয়া রাজ্যে আগমন ॥
মেহারকুল আসি ছিল মন্ত্রণা বিস্তর।
উদয়পুর রাজধানী হৈতে নৃপবর ॥
জয়মাণিক্য রাজা এই সব জানিয়া।
নবাব সাক্ষাত কহে সব বিস্তারিয়া ॥
উদয়মাণিক্য যদি হএত নৃপতি।
তাহুতের বাকী কর পরিবেক হাতী ॥
এ সব বৃত্তান্ত নবাব শুনিয়া তৎপর।
উদয়মাণিক্য ফিরাইয়া নিলেক সত্ত্বর ॥
পরিজন সমে রাজা ঢাকাতে রহিল।
সেই স্থানে নৃপতির কালপ্রাপ্ত হৈল ॥
তান পুত্র হাড়িয়া ঠাকুর মতিমান।
কত দিন পরে মৃত্যু হৈল নিঃসন্তান ॥
হাজিহোসন মগল (২) ঢাকাতে বসতি।
সমসরগাজি দস্য (৩) দক্ষিণসিক স্থিতি ॥
গাজি মনে করে ত্রিপুর রাজ্য লৈতে।
হাজিহোসন মুরব্বি (৪) করিল কোন মতে ॥
হাজিহোসন স্থানে সমসর কহিল বিস্তর।
ইন্দ্রমাণিক্যের বাকী হুজুরের কর ॥
রাজার নিগ্রহ যদি করয়ে নবাবে।
ত্রিপুর রাজ্যের কর পাইবেক তবে ॥
এই কথা শুনিয়া হাজি করিল গমন।
মুর্শুদাবাদ চলি গেল নবাব সদন ॥
ইন্দ্রমাণিক্য রাজার বাকী হএ কর।
নবাব নিকট কহে কুতর্ক বিস্তর ॥

---

(১) পরোয়ানা—আদেশলিপি।
(২) হাজিহোসনের বিবরণ মধ্যমণিতে পাওয়া যাইবে।
(৩) দস্য—দস্যু।
(৪) মুরব্বি—অভিভাবক, সহায়।

মাহাম্মদজঙ্গ (১) নবাব শুনিয়া কাহিনী।
হাজিকে হুকুম দিল আসিতে রাজধানী ॥
হাজিহোসন সমসর একতা হইয়া।
চলিলেক হোসনদ্দি নবাব (২) লইয়া ॥
বহু সৈন্য লৈয়া নবাব উদয়পুর আইসে।
ইন্দ্রমাণিক্য সনে যুদ্ধ হইল অশেষে ॥
চিত্তে বিমর্ষিল রাজা যুদ্ধ জয় পাইলে।
পরেতে কি হবে জানি নবাব সঙ্গে মিলে ॥
হোসনদ্দি নবাব কহে রাজা সম্বোধিয়া।
মুর্শুদাবাদ যাইবার কহে আশ্বাসিয়া ॥
নবাব আশ্বাস রাজা পাইয়া বিস্তর।
কৃষ্ণমণি যুবরাজকে বলিল সত্বর ॥
আমি যাব হুজুরেতে না ভাব অন্যথা।
পরিবার নিয়া যাও পূর্ব্বকুল (৩) যথা ॥
রাজধানী থাকে যদি উপদ্রব হবে।
বহুশত্রু রাজ্যে হৈল পরাভব দিবে ॥

---

(১) ইহা নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ-এর উপাধি। তিনি পাটনায় 'বঞ্জরা' নামক প্রবল দস্যুদল ও তদঞ্চলের জমিদারদিগকে দমন করিয়া দিল্লীর দরবার হইতে 'মহবৎজঙ্গ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এ স্থলে উপাধিটী বিকৃত করিয়া 'মাহাম্মদজঙ্গ' করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে 'মাহামুদজঙ্গ' ও লিখিত হইয়াছে। 'আলিবর্দ্দী খাঁ' তাঁহার নাম নহে,—ইহাও উপাধি। ইঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল মহম্মদ আলী; রাজমহলের ফৌজদার পদে নিযুক্ত থাকাকালে সম্রাট হইতে 'আলীবর্দ্দী' উপাধি লাভ করেন, এই উপাধিই তাঁহার নামে পরিণত হইয়াছে। ইনি ১৭৪০ হইতে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

(২) নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া, স্বীয় জামাতা নিবাইশ মহম্মদকে ঢাকার নায়েব নাজিমের পদে, এবং হোসেন কুলি খাঁকে তাঁহার সহকারীরূপে নিযুক্ত করেন। এই হোসেন কুলিকেই 'হোসনদ্দি নবাব' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৩) পূর্ব্বকুলের অবস্থান সম্বন্ধে 'কৃষ্ণমালা' গ্রন্থে পাওয়া যায়,—

"হিড়িম্ব দেশের দক্ষিণেতে এক নদী। বরবক্র নাম তার ঘোষে অদ্যাবধি ॥
খলংমা বলয়ে তারে ত্রিপুর সকলে। কুকি সবে বসতি করয়ে তার কুলে ॥
রুকণী নামেতে নদী তাহার দক্ষিণ তথাতে বসতি করয়ে কুকিগণ ॥

* * * * * * * * *

তাহার দক্ষিণ স্থল সুন্দর আছয়।
কাঙ্গলাই নামে এক পর্ব্বতের শৃঙ্গ।
তাহার দক্ষিণে নদী নামেতে চাথেঙ্গ ॥
ই সব স্থানেতে বৈসে যত কুকিচয়।
পূর্ব্বকুলিয়া বলি তা সবারে কয় ॥"

কৃষ্ণমালা।

কৃষ্ণমণি যুবরাজ পরিবার সমে।
উদয়পুর ত্যাগি চলে পূর্ব্বকুল ধামে ॥
করবঙ্গ পাড়াতে যে গেল যুবরাজ।
পিঙ্গচান্দ কলিরায় যুদ্ধ করে সাজ ॥
জয়মাণিক্য ভৃত্য তারা দুই জন।
যুবরাজ সঙ্গে যুদ্ধ করে সেইক্ষণ ॥
পরাভব হৈয়া তারা পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল।
কৃষ্ণমণি যুবরাজ কৈলাসরে গেল ॥
তথাএ পাঁচকড়ি সুড়ি দেবগ্রামে ঘর।
যুবরাজ সঙ্গে যুদ্ধ করিল তৎপর ॥
পরাভব হৈয়া কহে হাজিহোসন স্থান।
কৈলাসহর ঘাট মারে যুবরাজ প্রধান ॥
তথা হতে যুবরাজ হেরম্বেত গেল।
সেই স্থানে যুবরাজ কত দিন ছিল ॥
ইন্দ্রমাণিক্য রাজা মুর্শুদাবাদ পাইয়া।
ভাগীরথী স্নান দান গঙ্গাতে রহিয়া ॥
জয়মাণিক্য রাজা কারসাজি (১) মতে।
ইন্দ্রমাণিক্য রাজার বাকী হস্তী দিতে ॥
উদয়পুর আসিলেক রাজত্ব লইয়া।
রাজ্য শাসএ রাজা দ্বিজে ভূমি দিয়া ॥
তিন রাজার বিবাদেতে হস্তী বাকী কর।
জয়মাণিক্য পুন গেল নবাব গোচর ॥
ইন্দ্রমাণিক্য রাজা ছিল জিদ্ধবন্ত (২)।
যেই সেই কর্ম্মেতে যে অসহ্য অত্যন্ত ॥
পারসি শাস্ত্রেতে বিদ্যা আছিল বহুল।
তান ভাষা শুন্যা মগল হইল ব্যাকুল ॥
কি বলিতে কিবা আইসে পারসি ভাষাএ।
অশুদ্ধ হইলে তাকে দোষএ রাজাএ ॥

---

(১) কারসাজি—কৌশল, চতুরতা।
(২) জিদ্ধবন্ত—জেদি, একগুঁয়ে।

মুরছিদিয়া গীত (১) রাজা সুস্বরে বলিত।
ভাবেতে আবেশ মঙ্গল (২) রোদন করিত॥
ইন্দ্রমাণিক্য চারি বৎসর রাজত্ব করিল।
অকস্মাৎ পীড়িত হৈয়া গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈল॥
কৃষ্ণমণি যুবরাজ হেড়ম্বের দেশে।
ইন্দ্রমাণিক্য মৃত্যু পত্র পায়েত বিদেশে॥
রাণী দুর্গা পতিব্রতা নিঃসন্তান তরে।
ইন্দ্রমাণিক্য শ্রাদ্ধ হেড়ম্বেতে করে॥
ইন্দ্রমাণিক্য রাজার কাল প্রাপ্তি হএ।
পুনরপি জয়মাণিক্য দরখাস্ত করএ॥
সনদ পাইয়া রাজা হৈল হরষিত।
মন্ত্রী সঙ্গে উদয়পুর আসিল ত্বরিত॥
মুরারী ঠাকুর পত্নী হৈয়াছে মরণ।
রাজ জ্ঞাতি পত্নী সেই অশৌচ তখন॥
তাহার অশৌচঅন্ত যে দিবসে গেল।
সেই দিবসে জয়মাণিক্য কাল প্রাপ্তি হৈল॥
এই মতে বিবাদেতে কাল হৈল গত।
জয়মাণিক্য চারি বৎসর করএ রাজত্ব॥
তাহান তনয় ছিল জয়মঙ্গল ঠাকুর।
বিবিধ বিধানে শ্রাদ্ধ করিল বিস্তর॥
জয়মঙ্গল ঠাকুর রাজার সন্তান।
বিধির নির্ব্বন্ধ পুত্র না হএ তাহান॥
জয়, ইন্দ্রমাণিক্য এ দুই রাজন।
দুয়ের বিবাদ উদয়মাণিক্য কথন॥
সংক্ষেপে কহিল তিন রাজত্ব কাহিনী।
বিস্তারি কহিতে শ্রোতা শ্রদ্ধা নহে পুনি॥
এই সব প্রসঙ্গ শুনএ নৃপমণি।
উজীরে কহেন সব দেখিয়া আপনি॥

ইতি রাজখণ্ড তত্ত্বে ইন্দ্র, জয়, উদয়মাণিক্য প্রসঙ্গ সমাপ্তঃ।

---

(১) মুরছিদিয়া গীত—মুরসেদিয়া গীত, পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীত।
(২) মঙ্গল—মোগল।

বিজয়মাণিক্য (২য়) খণ্ড

ইন্দ্র, জয়মাণিক্য রাজত্ব সমাপন।
বিজয়মাণিক্য ভূপ কহিব কথন ॥
জয়মাণিক্য রাজার হইল মরণ।
রাজার মৃত্যু নবাব শুনিল তখন ॥
ত্রিপুরার রাজ্যাধিপ নাহি কোন জন।
হাজিহোসন দরখাস্ত নবাব সদন ॥
ত্রিপুরার জমিদারী ওয়াদাদর (১) হৈল।
ভুলুয়া আদি ওয়াদা (২) হাজিয়ে লইল ॥
তার প্রস্তে রোশনাবাদ দিলেক তশীল।
রাজ্যের প্রজার কর আপনে শাসিল ॥
জয়মাণিক্যের ভ্রাতা হাড়িধন নাম।
হাজিহোসনের সঙ্গে করিল সন্ধান ॥
ত্রিপুরার জমিদারী হাজিওয়াদা থাকে।
ত্রিপুরার রাজ্যাধিপ করে হাড়িধনকে ॥
খেদা করিয়া হস্তী হুজুরে রাজা দিবে।
বৎসরেত বার হাজার মসরা (৩) পাইবে ॥
রাজত্বের জমিদারী ওয়াদাতে থাকিব।
রাজ্যেতে দখল রাজার কিছু না রহিব ॥
ত্রিপুরার রাজা মাত্র খেদার কারণ।
এইমতে হাজি বলে নবাব সদন ॥
এ সব শুনিয়া নবাব অনুমতি দিল।
হাড়িধন রাজা হৈতে পরোয়ানা পাইল ॥
বিজয়মাণিক্য নাম তান হল খ্যাতি।
মসাহেরা পাইয়া হুজুরে দিব হাতী ॥

---

(১) ওয়াদাদার—বন্দোবস্ত গ্রহীতা।
(২) ওয়াদা—বন্দোবস্ত।
(৩) মসরা—মাসিক বৃত্তি।

মাহাম্মদজঙ্গের পরোয়ানা লইয়া।
ঢাকা হনে হাড়িধন ঠাকুর আসিয়া
বিজয়মাণিক্য নামে বসে সিংহাসন।
সুনন্দা নামেতে রাণী খ্যাতি সেইক্ষণ॥
ত্রিপুরার লোক দিয়া খেদা করিবারে।
না মিলে ত্রিপুরা সব কি করিতে পারে॥
মাঘ মাসে গঙ্গাপূজা বার্ষিক করিল।
হস্তী খেদা করিয়া যে দিতে না পারিল॥
মনে মনে চিন্তে রাজা কি হবে উপায়।
ত্রিপুরাসুন্দরী (১) রাজার না হইল সহায়॥
রাজা হৈয়া ছয় মাস উদয়পুরে ছিল।
হুজুরের হস্তী জন্যে তাগাদা করিল॥
তখনে সমসরগাজি (২) বিপক্ষ অশেষ।
হাজিহোসন স্থানে কহে কপাট বিশেষ॥
হস্তী আমি ধরি দবি বিনা মসরাতে।
রোশনাবাদ কর দিব তাহুতের মতে॥
এ সব বৃত্তান্ত নবাব শুনিল যখন।
বিজয়মাণিক্য ঢাকা নিল সেইক্ষণ॥
পূর্ব্বকুল রাখিয়া যে পরিবারগণ।
রিহাঙ্গ পাড়া যুবরাজ আসিল তখন॥
দূতমুখে সমসর শুনিয়া খবর।
যুবরাজ সঙ্গে যুদ্ধ লইয়া তস্কর॥
রিহাঙ্গ পাড়াতে যুদ্ধ তখন করিল।
কৃষ্ণমণি যুবরাজ গেল পূর্ব্বকুল॥
গাজি চাহে ত্রিপুরা দিয়া খেদা যে করিতে।
রাজা বিনে ত্রিপুরাদি না মিলে তাহাতে॥
ত্রিপুরা মিলান হেতু করয়ে সঙ্গতি।
ধর্ম্মমাণিক্যের পৌত্র করিতে নৃপতি॥

---

(১) ত্রিপুরাসুন্দরী—ত্রিপুরায় অধিষ্ঠাতৃ পীঠদেবী।
(২) সমসের গাজীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরবর্ত্তী মধ্যমণিতে সন্নিবিষ্ট হইবে।

বনমালী ঠাকুর সে উদয়পুরে ছিল।
রাজা করিবারে গাজি তাহারে আনিল ॥
রিহাঙ্গ পাড়াতে তাকে বসাইয়া আসনে।
লক্ষ্মণমাণিক্য নাম করে সেইক্ষণে ॥
রাজাখ্যাতি করি তাকে লোকেতে জানাএ।
তথাপিহ না মিলে ত্রিপুর সমুদাএ ॥
না আসিল ত্রিপুর লোক তখনে জানিয়া।
খেদা করে সমসর বাঙ্গাল লোক দিয়া ॥
হস্তী ধরিয়া সে যে হুজুরে পাঠাএ।
গাজিবৈক্ষ হৈয়া হাজিহোসনে বুঝায় ॥
হাজিহনে গাজি রাজ্য করিল তাহুত।
কর দেহে (১) হুজুরের যে মত তাহুত ॥
কৃষ্ণমনি যুবরাজ পূর্ব্বকুল শুনে।
সমসর রাজা করে রিহাঙ্গে তখনে ॥
গোবর্দ্ধন বনমালী প্রধান যত ইতি।
যুবরাজ পত্র লিখে তাহার যে প্রতি ॥
রিহাঙ্গ পাড়াতে গাজির যত সৈন্যগণ।
যুদ্ধ করি নিকালিয়া (২) দিবে ততক্ষণ ॥
সেই পত্র পাইয়া ত্রিপুরাবর্গ যত।
যুদ্ধ করিবারে তারা হইল প্রবর্ত্ত ॥
সমসর সঙ্গে যুদ্ধ হইল বিহিত।
যুদ্ধে পরাভব সৈন্য চলিল ত্বরিত ॥
রিহাঙ্গ হনে লক্ষ্মণমাণিক্য রাজন।
স্বর্ণগ্রামে কত দিন আছিল তখন (৩) ॥
এ মত প্রকারে রাজ্য সাধএ তস্কর।
রাজ্যেতে প্রজার থাকা হইল দুষ্কর ॥

---

(১) দেহে—দেয়।

(২) নিকালিয়া—বাহির করিয়া।

(৩) লক্ষ্মণমাণিক্য সুবর্ণগ্রামে যাইয়া যে স্থানে বাস করিতেছিলেন, সেই স্থান বর্তমান কালেও রাজবাড়ী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বিজয়মাণিক্য ঢাকা কালপ্রাপ্তি হৈল।
রাজপুত্র রামচন্দ্রে শ্রাদ্ধাদি করিল ॥
তান পরিজন সব ঢাকাএ রহিল।
রাজধানী রাজ অংশী কেহ নাহি ছিল ॥
এই মতে বার বৎসর রাজ্য শাসিল।
মামুদজঙ্গ সমসরের দুষ্টতা শুনিল ॥
বিধির নির্ব্বিন্ধ কার্য্য না খণ্ডে কোনমতে।
গাজিকে ধরিয়া নিল মুর্শুদাবাদেতে ॥
নবাব সাক্ষাতে নিয়া দিল যেইক্ষণ।
কারাগারে বন্দি রাখে নিগড় বন্ধন ॥
দুষ্টতা জানিয়া তাকে সাবধানে রাখে।
তোপেতে উড়াএ গাজি সর্ব্বলোকে দেখে ॥
বিজয়, লক্ষ্মণমাণিক্য এই দুই রাজন।
সমসরের প্রসঙ্গ হইল সমাধান ॥
যদবধি হাজি রাজ্য করিল দখল।
হস্তী কর উঠি গেলে টাকা কর হৈল ॥
রাজধানী রাজা নাহি আছিল তখনে।
জয়দেব উজীর কহে নৃপ বিদ্যমানে ॥

ইতি রাজখণ্ড তত্ত্বে বিজয়, লক্ষ্মণমাণিক্য কথনং সমাপ্তং।

কৃষ্ণমাণিক্য খণ্ড

উজীর বলে বিজয়মাণিক্য অভ্যন্তরে।
কৃষ্ণমাণিক্য মহারাজা হৈল তার পরে ॥
তান কীর্ত্তি রাজধরমাণিক্য আদেশে।
জয়ন্ত চন্তাই পূর্ব্বে বলিছে বিশেষ ॥
কৃষ্ণমালা নাম পুস্তক বিস্তার কাহিনী।
রামগঙ্গা বিশারদ রচিল তখনি (১) ॥

(১) 'কৃষ্ণমালা' এক বিরাট গ্রন্থ। ইহাতে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। আমরা কৃষ্ণমাণিক্য প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিব।

রাজামালা মধ্যাবৃত কৃষ্ণমালা হয়ে।
বিস্তার দেখিয়া লোক শুনিতে সংশয়ে ॥
অতঃপর কৃষ্ণমালা স্বতন্ত্র রহিল।
কৃষ্ণমাণিক্যের কীর্ত্তি বিস্তার কহিল ॥
পূর্ব্ব রাজ শ্রেণী কৃষ্ণমাণিক্য কহিব।
সংক্ষেপে বলিব রাজ্য যে মতে পাইব ॥
রাজ্য ছাড়া যুবরাজ রহে পূর্ব্বকুল।
সীতা হারা রামচন্দ্র বনেতে ব্যাকুল ॥
হেড়ম্বের রাজ্যে থাকি ভাবে মনে মন।
পৈতৃক যে রাজ্য গেল পাইব কেমন ॥
হেড়ম্বের রাজা ছিল রামচন্দ্র নাম।
তাহা স্তানে ভগিনী বিভা (১) বিধি অনুপাম ॥
হরিমণি ঠাকুরের পুত্র যে জন্মিল।
কণ্ঠমণি নাম পুত্র তাহার রাখিল ॥

---

(১) এতৎ সম্বন্ধে 'কৃষ্ণমালা' গ্রন্থে লিখিত আছে ;—

"গৌরীপ্রসাদ কবরার কন্যা সুরধুনী।
সঙ্গমা নামেতে যুবরাজের ভাগিনী ॥
কন্যা রূপ-গুণ শুনি হিড়িম্বের নাথ।
করিতে বিবাহ যত্ন করিল তথাত ॥
বহু যত্নে যুবরাজ দিল অনুমতি।
বিয়া কৈল কুমারীকে হিড়িম্বের পতি ॥"
কৃষ্ণমালা।

'শ্রেণীমালা' গ্রন্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়;—

"সঙ্গমা নামেতে কন্যা অতি সুচরিতা।
গৌরীপ্রসাদ কবরার হয়েত দুহিতা ॥
কৃষ্ণমাণিক্য নৃপের ছিলেন ভাগিনী।
রামচন্দ্র ধ্বজ রাজার তিনি যে গৃহিণী ॥
হেড়ম্ব রাজ্যের তিনি ছিলেক নৃপতি।
পরিচয় জন্যে তাহা লিখিলাম খ্যাতি ॥"
শ্রেণীমালা।

হেড়ম্বের সঙ্গে বিবাদ জন্মিল তখন (১)।
সময়ে বিরোধ হেন বুঝিয়া রাজন ॥
হেড়ম্ব ছাড়ি যুবরাজ গেল পূর্ব্বকুল।
খুছঙ্গ কুকির সঙ্গে যুদ্ধ যে বহুল ॥
বিষ তীরাঘাতে তখন হৈল মূর্চ্ছামান।
পুণ্যবলে যুবরাজের রহিল জীবন ॥
হালিয়াকান্দি গ্রামেতে কতদিন ছিল।
তাহাতে হেড়ম্ব সঙ্গে বিবাদ জন্মিল ॥
চাথেঙ্গনদীর পূর্ব্বকুল আসিল যখন।
হেড়ম্ব খুছঙ্গ যুদ্ধে উদ্যোগ করেন ॥
খুছঙ্গ মারিতে গেল কবরা গোবর্দ্ধন।
খুছঙ্গ জিনিয়া জয় পাইল তখন ॥
তথা হতে চরাই বাড়ী মনুনদী তটে।
যুবরাজ ভ্রাতা হরিমণির সহিতে ॥
পূর্ব্ব রাজধরমাণিক্য পাট সেই স্থান।
নদীর নাম রাজধর (২) এইত কারণ ॥
সে পর্ব্বতের নাম রাজধর মুড়া বলে।
পর্ব্বত নদীর নাম রাজধর ছিলে ॥
তোমা পিতা সেই স্থানে জন্ম এ কারণ।
রাজধর ঠাকুর নাম রাখিল তখন (৩) ॥

---

(১) এই বিবাদের বিবরণ মধ্যমণিতে বর্ণিত হইবে।

(২) 'রাজধর ছড়ার' নাম পরিবর্তিত হইয়া 'রাতাছড়া' হইবার বিবরণ পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ছড়ার একটী শাখা অদ্যাপি 'রাজধর ছড়া' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহার সন্নিহিত আর একটী ছড়ার নাম 'মাণিক্যধর ছড়া'। এই নাম যে রাজার নামানুসারে হইয়াছে, 'মাণিক্য' শব্দদ্বারা তাহা বুঝা যায় কিন্তু ত্রিপুরার কোনো রাজার 'মাণিক্যধর', নাম থাকা প্রকাশ পায় না। এই নাম আলোচনা করিলে মনে হয়, 'মাণিক্য' উপাধির সহিত 'রাজধর' নামের শেষাংশের সংযোগে ছড়ার নাম 'মাণিক্যধর' হইয়াছে।

(৩) এই উক্তি ভ্রমসঙ্কুল। এই স্থানে রাজধরমাণিক্যের জন্ম হয় নাই; তিনি এখানে রাজ্যাভিষিক্ত হওয়ায়, এখানকার ছড়ার নাম রাজধর ছড়া (বর্তমান কালের রাতাছড়া) এবং পর্ব্বতের নাম রাজধর মুড়া রাখা হইয়াছিল। (রাজমালা তৃতীয় লহরের ৪৯ পৃষ্ঠা ও ১৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) ইহার পূর্ব্ববর্তী পংক্তিগুলি আলোচনা করিলেও এই উক্তির ভ্রম উপলব্ধ হইবে।

তথা থাকি যুবরাজ ভাবিয়া অন্তর।
হেড়ম্ব যুদ্ধেতে সৈন্য পাঠাএ সত্বর ॥
বলভদ্র নারায়ণ ঠাকুর চলিল।
যুদ্ধে ভঙ্গ হেড়ম্ব নৃপ রাজ্য ছাড়ি গেল ॥
বলভদ্র সৈন্য সমে লিখে আসিবার।
রাজ্য লোভেতে তারা না আইসে পুনর্ব্বার ॥
বিধি নিয়োজিত কর্ম্ম রাখন না যাএ।
কুমন্ত্রণাএ হেড়ম্বে মারিলে সমুদাএ ॥
নবাব সাক্ষাত ভাগ্যবন্ত হাড়িধন।
মুর্শুদাবাদেত গেল সনদ কারণ ॥
তার পরে আসিলেন বটতলি স্থানে।
উজীর নাজির ত্রিপুর মিলিল তখনে ॥
তথাএ যে যুবরাজ সুস্বপ্ন দেখিল।
মাতৃরূপা হইয়া কালী তখনে বলিল ॥
রাজ্যের উদ্যোগ তুমি করহ ত্বরতি।
যুদ্ধ করি লও রাজ্য হইব বিহিত ॥
সেই স্থান হতে পরে মন্তলা আসিল।
রাজ্যের প্রধান প্রজা সকল মিলিল ॥
এগারশ ঊনসত্তের সনেতে ত্রিপুর।
তখনে আসিল খিলাত সনদ হুজুর ॥
উজীর বলে আমা কথা হৈল উপস্থিত।
প্রসঙ্গেতে না বলিলে না হয় বিহিত ॥
গোবর্দ্ধন কবরা অভিমুন্য নাজির।
লুচিদর্প নারায়ণ উত্তর সিংহ উজীর ॥
আছুমণি সুবা চুড়ামণি কারকোন।
ভদ্রমণি দেওয়ান আর রণমর্দ্দন ॥
মণিচন্দ্র নাজির লাল ঠাকুর খোসাল।
বনমালী কারকোন বিক্রমে বিশাল ॥
মায়ারাম ছদিয়াল বিক্রমেতে গেল।
গোপাল সিংহ হাজারী রণে চলে ভাল ॥

কেশরী সিংহ জমাদার সিংহের বিক্রম।
রণ পাইলে তারা সব করএ আক্রম ॥
হরনাথ হাজারী হারাধন লস্কর।
আমা সব পাঠাইল লৈতে রাজ কর ॥
আবদুল রজক (১) নাম ছিল একজন।
মেহারকুল রাজ্য যত করএ শাসন ॥
লুচিদর্প সঙ্গে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
কুমিল্লা ছাড়িয়া আবদুল গেল তৎপর ॥
জমিদারী পরগণা আমল হইল।
কসবাতে যুবরাজ তখনে আসিল ॥
ত্রিপুরা প্রধান মন্ত্রী আছিলেক যত।
পরগণাতে একজনা শাসন করিত ॥
এই প্রকরণে রাজ্য শাসিত যখন।
কসবাতে যুবরাজ বৈসে সিংহাসন ॥
আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব দশমীর দিনে।
ত্রিপুরা এগারশত সত্তেরের সনে ॥
কৃষ্ণমাণিক্য রাজখ্যাতি হইল তখন।
কৃষ্ণ নামে উপাসনা ছিলেক রাজন ॥
কৃষ্ণমাণিক্য রাজা জাহ্নবা ছিল রাণী।
রাজা রাণী নামে সিক্কা প্রচার তখনি ॥
হরিমণি ঠাকুর অনুজ রাজার।
যুবরাজ করিলেন রাজ্যে আপনার ॥
গদাধর বড়ঠাকুর তান দুই পুত্র।
বনমালী বীরমণি অতি সুচরিত্র ॥
শিবভক্তি নারায়ণ চন্তাই প্রধান।
দেবার্চ্চন বিধিমত ছিল জ্ঞানবান ॥
বীরমণি বড়ঠাকুর করিল রাজন।
পাত্র মন্ত্রী নিযোজিল রাজ্যের শাসন ॥

---

(১) আবদুল রজক—ইনি সমসের গাজির অনুচর ও সম্পর্কান্বিত ছিলেন।

সৈন্য সমে মির আজিজ কুমিল্লা আসিল।
আমা সঙ্গে সেই জন যুদ্ধ আরম্ভিল ॥
বহু যুদ্ধ হৈয়া সৈন্য পড়িলেক রণ।
তার পুত্র মির ইছব হইল নিধন ॥
রণ ভঙ্গ দিয়া সে যে করিল পয়াণ।
তার পরে রামশঙ্কর আসিল দেওয়ান ॥
চাটিগ্রাম হতে বহু সৈন্য যে লইয়া।
নুরনগর আসিলেক যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষিয়া ॥
তার সঙ্গে রণেতে পরাজয় পাইল।
কসবা হতে মহারাজা ভাদুঘরে গেল ॥
কতদিন পরে সৈন্য ফিরিয়া যে যাএ।
মহারাজ কসবাতে আসিল ত্বরাএ ॥
মারিঅট্ (১) সাহেব আসিল একজন।
তার সঙ্গে যুবরাজ কুমিল্লা গমন ॥
যুবরাজ সঙ্গে রাণী না আইসে তখন।
মনুনদী হইতে রাণী আইসে শুভক্ষণ ॥
এগার শ সত্তের সন হএত যখন।
আগরতলা রাজধানী করিল রাজন ॥
পরে ইন্দ্রমাণিক্য রাণী হইছে মরণ।
মহারাজা তান শ্রাদ্ধ করএ আপন ॥
হারবিলিস (২) সাহেব বহু সৈন্য লইয়া।
চাটিগ্রাম হ'তে নুরনগর আসিয়া ॥
কাছাড়াদি রাজ্য হৈয়া মণিপুর পথে।
ব্রহ্মা রাজ্য মারিবার চলিল ত্বরিতে ॥
লুচিদর্প নারায়ণ আমার সহিতে।
হেড়ম্বেতে আগু হৈয়া গিয়াছি যুদ্ধেতে ॥
কাছাড় হতে সৈন্য সব ফিরিয়া আসিল।
এঙ্গরাজ (৩) কুঠি আদি বৃন্দাবন লুটিল ॥

---

(১) Mr. Marriott.
(২) Mr. Harry Varlest.
(৩) এঙ্গরাজ—ইংরেজ।

নুরনগর হৈয়া সৈন্য নৌকা পথে গেল।
ঢাকা হতে বৃন্দাবন দেওয়ান খেদাইল॥
কালিকাগঞ্জে দুই দীঘি খনিল রাজন।
রাজা রাণী উৎসর্গিল ইষ্টে সমর্পণ॥
এগারশ পাঁচসত্তের সনের যে মাঝে।
ফাল্গুনেতে প্রতিষ্ঠা করএ মহারাজে॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে দান পাইল বিহিত।
দুঃখিত কাঙ্গালি ধন পাএ যথোচিত॥
তার পরে মরাহ্মত আলি আর জন।
সহস্রাবধি সৈন্য সঙ্গে করিবারে রণ॥
আমা সঙ্গে যুদ্ধে সৈন্য পরাজয় হৈল।
বীরমণি ভদ্রমণি হাড়িধন ছিল॥
তারা তিন জন বন্দি করিয়া যতন।
মুর্শুদাবাদেতে নিল তারা তিন জন॥
ময়ূর (১) নাম সাহেব আসিল রাজ্যেতে।
আছুমণি সুবা ঢাকা নিয়াছে পশ্চাতে॥
আমা সঙ্গে যুদ্ধ ছিল বলরাম রাজার।
ভঙ্গ দিয়া গেল সৈন্য রণের মাঝার॥
তিন ছড়া পুষ্প খিলাত উজিরি আমাকে।
বীরমণি নাইব উজীর করিল তাহাকে॥
ছুড়ামণি সূত হিরামণি করোকন।
মক্ষমলাল রামকেশব নাইব দুজন॥
পদ্মনাভ দেওয়ান যে আর পঞ্চানন।
সুরমণি দেওয়ান যে নিজের তখন॥
নবাবের আর সৈন্য আইসে শুনিয়া।
মহারাজা মুর্শুদাবাদ গেলেন্ত চলিয়া॥
এগারশ ছয়সত্তের সন পৌষ মাস হয়।
কলিকাতা গেল রাজা মনে বাঞ্ছা জয়॥

---

(১) Mr. Mayer.

কলিকাতা হাড়বিলিস সাহেব সহিতে।
মুর্শুদাবাদেত গেল মন পুলকিতে ॥
নবাব সাক্ষাতে নৃপ মিলিয়া তখন।
পুনঃ রাজত্ব সনদ পাইল রাজন ॥
বীরমণি ভাগিনা লস্কর হাড়িধন।
বন্দিহনে ভদ্রমণি আনিল তখন ॥
আছুমণি সুবাকে যে রাখিছে ঢাকাতে।
ঢাকাতে আসিয়া রাজা ছোড়াএ তাহাতে ॥
ঢাকা হনে লক্ষ্মীপুরা হইয়া চাটীগাএ।
চাণ্ডিল সাহেব (১) সঙ্গে রাজা মিলিল তথাএ ॥
এগারশ সাতসত্তের সন যে কার্ত্তিকে।
রাজ্যেতে আসিল নৃপ বিহিত গতিকে ॥
জগন্নাথ পুরেতে রাজা পুরী নির্ম্মাইয়া।
সেই স্থানে পুষ্কর্ণী এক খনন করিয়া ॥
পুরী মধ্যে রাজারাণী বসতি করএ।
চৌদ্দমাদল মহোৎসব তথাতে যে হএ ॥
গোসাই মহন্ত যত বহু দলাদল।
দিবা নিশি মহোৎসব চৌদ্দাদি মাদল ॥
গণগতি ভট্টাচার্য্য আর ধর্ম্মরত্তন।
কালাচান্দ বিপ্র ধরণীধর পঞ্চানন ॥
এই সব বিপ্রগণ রাজ সভাসদ।
ধর্ম্মশাস্ত্র আলাপন করএ প্রমোদ ॥
হরিমণি যুবরাজ হইল মরণ।
রাণী রত্নমালা দেবী সহিতে গমন ॥
ভাগ্যবতী নাম রাণী পূর্ব্বে মৃত্যু জানি।
রাজধর মাণিক্যের ছিলেক জননী ॥
কালিকাগঞ্জে দুই দীঘি করিয়া খনন।
পাড় মধ্যে নির্ম্মাইল পঞ্চ যে রত্তন ॥

---

(১) Mr. Sandel.

এগারশ আটসত্তের সনের সময়।
মহারাণী জাহ্নবায় প্রতিষ্ঠা করয়॥
রাধামাধব দুই বিগ্রহ করিল যত্তন।
পঞ্চরত্ন নির্ম্মাইয়া করেন স্থাপন॥
সত্ররত্ন (১) নির্ম্মাইল জগন্নাথ পুরে।
জগন্নাথ মহাপ্রভু স্থাপিত উপরে॥
তুলাপুরুষ পঞ্চাগ্নি (২) যে রজত ষোড়শ।
তুলাএ বৈসে রাজারাণী ধর্ম্মের পুরষ (৩)॥
নবদ্বীপ দ্বিজগণ নিমন্ত্রণ যত।
রজত তৈজষ মুদ্রা দিল যথোচিত॥
দিগরি (৪) কাঙ্গালি যত আসিল তখন।
ধন পাইয়া তুষ্ট হৈয়া করিল গমন॥
এগার শ আটাশি যে সনের সমএ।
প্রতিষ্ঠা করএ রাজা ধর্ম্মের তনএ॥
গুরুপ্রসাদ মহাপ্রভু ভব অবতার।
ইষ্টদেব হয়ে কৃষ্ণমাণিক্য রাজার॥
আনন্দচন্দ্র গোস্বামীর চরিত্র বৈষ্ণব।
হরিমণি যুবরাজের ছিল ইষ্টদেব॥
মেহারকুল মিথিলা পুরের এক গ্রাম।
মহারাজা ইষ্ট প্রীতে অর্পে সেই ধাম॥
কালিকাগঞ্জের রাধামাধব সেবাতে।
কতদূর ভূমি দিছে পুষ্কর্ণী পাড়েতে॥

---

(১) সতরত্ন — সতর রত্ন বা সপ্তদশ রত্ন।

(২) পঞ্চাগ্নি — ইহা কঠোর তপস্যা বিশেষ। শাস্ত্রে পাওয়া যায়, —

"চর্য্যা পঞ্চাতপাচিন্তা শাম্ভবী শাম্ভবো জপঃ।
যজ্ঞিয়ৈর্দারুভিঃ শুষ্কৈশ্চতুর্দ্দিক্ষু চতুষ্কৃতম্॥
বহ্নি সংস্থাপনং গ্রীষ্মে তীব্রাংশুস্তত্র পঞ্চমঃ।
হস্তান্তরে চতুর্ব্বহ্নীন্ কৃত্বা বৈশ্বানরেষ্টিনা॥
তন্মধ্যস্থা সূর্য্যবিম্বং বীক্ষন্তী বহুলাংশুকা।"

কালিকাপুরান—৪২ অধ্যায়।

(৩) পুরষ (পুরস্)—অগ্রে, সম্মুখে।

(৪) দিগরি—অনিমন্ত্রিত, রবাহূত।

জগন্নাথ মহাপ্রভু স্থাপিত যখন।
জগন্নাথপুরে ভূমি দিয়াছে রাজন ॥
রাজ জমিদারী মধ্যে সনদ করিয়া।
দেবে দ্বিজে আদি ভূমি দিলেক জানিয়া ॥
কিমিলি সাহেব নাম (১) আসিল এক জন।
ব্যবস্থা যে রাজা সঙ্গে করে দুই জন ॥
পরে লিক (২) সাহেব আইসে তাহুত লইয়া।
রাজ্য হতে কর সাধে স্বতন্ত্র হইয়া ॥
কলিকাতা বন্দোবস্ত রাজ্যের করিতে।
রামকেশব পদ্মনাভ আমলা সহিতে ॥
মাণিক্যচন্দ্র ঠাকুর পাঠাএ তারপর।
রাজধর ঠাকুর গেল তার অভ্যান্তর ॥
লিক সাহেব হুজুরেত করে কুমন্ত্রণ।
হুজুরে রাজার পক্ষে নাহি কোন জন ॥
পরে সুর (৩) বড় সাহেব ঢাকা আগমন।
রাজধর ঠাকুর সঙ্গে আসিল তখন ॥
সুর সঙ্গে দেখা রাজা ঢাকাতে করিল।
তাহুত করিতে রাজ্যের তাতে না হইল ॥
লিক সাহেব সুর সঙ্গে ঢাকাএ তখন।
রাজ্যের বন্দোবস্ত নহে এই সে কারণ ॥
ঢাকা হতে নরপতি আইসে পুনর্ব্বার।
সেই কালে স্তব্ধবায়ু (৪) জন্মিল রাজার ॥

ত্রিপদী ছন্দ

বৃদ্ধ হৈল নরপতি রোগান্বিত প্রতিনিধি
কৃষ্ণনাম কালের ক্ষেপণ।
ভারত পুরাণ যত শুনি ছিল অবিরত
পাঠক দ্বিজ হরি নারায়ণ।

---

(১) Cambel ? ইঁহার প্রকৃত নাম বা পরিচয় পাওয়া গেল না।
(২) Mr. Rolph Leeke.
(৩) Mr. John Shore.
(৪) স্তব্ধবায়ু—বাতব্যাধি।

এইমত কত কাল কাল গত আইসে কাল
এগারশ তিরান্নব্বৈ ত্রিপুরা।
কৃষ্ণমাণিক্য নৃপতি কৃষ্ণেতে করিয়া মতি
কৃষ্ণ নামে শরীর তেজিল।
তেজিয়া যে কলেবর স্বর্গলোকে নরেশ্বর
হরির সংকীর্ত্তন সবে করে।
মহারাণী জাহ্নবা সতী পূণ্য করে প্রতিনিতি
ক্রন্দন যে রাজার বিচ্ছেদে।
যথাবিধি আয়োজন আনিলেক সেই ক্ষণ
শ্রাদ্ধ দ্রব্য করিয়া রচন।
বৃষোৎসর্গ দান যত নৃপ স্বর্গে যথোচিত
দান করে বিপ্রেতে অর্পণ।
দ্বিজ দম্পতি বিধি অশ্ব নৌকা যত আদি
দান দিলে দানি দ্বিজ তরে।
যত ছিল দ্বিজগণ দান পাইল সেই ক্ষণ
দক্ষিণা দিল যার যেই মতে।
দুঃখিত কাঙ্গালি যত ধন বিতরণ তত
রাজা প্রীতি করে বিতরণ।
পুণ্যবন্ত রাজা ছিল কর্ম্মেতে প্রতিষ্ঠা হৈল
জাহ্নবা রাণীয়ে শ্রাদ্ধ করে।

পদবন্দ

কৃষ্ণমাণিক্যের মৃত্যু আষাঢ় মাসেতে।
তেইস বৎসর রাজত্ব করিল বিহিতে ॥
কৃষ্ণমাণিক্য রাজার রাজত্ব কথন।
সংক্ষেপে কহিল তাহা হৈল সমাপন ॥

ইতি রাজখণ্ডতত্ত্বে কৃষ্ণমাণিক্য রাজত্ব কথনং সমাপ্তং।
রামগঙ্গামাণিক্য নৃপতি জিজ্ঞাসায়াং দুর্গামণি উজীর কথনং চতুর্থ-কাণ্ড সমাপ্তং।

শ্রীরাজমালা

❀❀❀❀❀❀

চতুর্থ লহরের মধ্য-মণি

(টীকা।)

চতুর্থ লহরের মধ্য-মণি

(টীকা।)

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥

❀❀❀❀❀❀

গ্রন্থভাগে উল্লিখিত অনেক স্থূল কথার বিশদ বিবরণ পাদটীকায় প্রদান করা সম্ভবপর হয় নাই। সেই সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে।

রাজামালা চতুর্থ লহর ও তাহার রচয়িতা

রাজামালা প্রথম লহর মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের আদেশানুসারে পণ্ডিতপ্রবর বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর কর্ত্তৃক দুর্লভেন্দ্র চন্তাইর বাক্য অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় লহর মহারাজ অমরমাণিক্যের অনুজ্ঞায়, সেনাপতি রণচতুরনারায়ণের কথিত বিবরণ লইয়া কোনও রাজপণ্ডিত কর্ত্তৃক এবং তৃতীয় লহর মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য ও মহারাজ রামদেবমাণিক্যের আদেশানুসারে পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় গঙ্গাধর সিদ্ধান্তবাগীশ কর্ত্তৃক রচিত হইবার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

অতঃপর কিয়ৎকাল রাজমালার গ্রন্থন কার্য্য স্থগিত ছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে ত্রিপুরাধীশ্বর মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য পুনর্ব্বার রাজমালা রচনাকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন উজীর জয়দেব ঠাকুরের প্রতি রাজমালার চতুর্থ লহর রচনার নিমিত্ত আদেশ করেন। ইনি মহারজ কৃষ্ণমাণিক্যের শাসনকালে উজীর পদে নিয়োজিত ছিলেন। উজীর জয়দেব প্রাচীন, বহুদর্শী এবং জ্ঞানবান ব্যক্তি ছিলেন, এই কারণেই তাঁহার উপর রাজমালা সংগ্রহের ভার অর্পিত হয়। এই রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া,—

"নৃপ সম্বোধিয়া উজীর কহিল আপন।
মুকুন্দমাণিক্য ছিল নৃপতি যখন ॥
সেইকালে জন্মিয়াছি বলি মহারাজ।
তার পূর্ব্বে শুনিয়াছি বৃদ্ধের সমাজ ॥
যাহা শুনিয়াছি, যাহা দেখিল আপন।
সেই সব কহি আমি শুনহ রাজন ॥

এই উক্তিদ্বারা জানা যায়, যোগ্য ব্যক্তির হস্তেই রাজমালা সংগ্রহের ভার অর্পিত হইয়াছিল। উজীরের নিজ বাক্যেই জানাইতেছে, মহারাজ মুকুন্দমাণিক্যের শাসনকালে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহারাজ মুকুন্দ ১৬৫৪—১৬৬০ শকে (১৭৩২—১৭৩৮ খ্রীঃ) রাজত্ব করিয়াছেন। মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য অনেক উপদ্রব ভোগের পর ১৮২১ খ্রীঃ রাজ্যভিষিক্ত হন। সুতরাং এই সময় উজীরের বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক ৯০ বৎসর হইয়াছিল। বৃদ্ধ এবং বহুদর্শী উজীরও রাজাজ্ঞা পালনের নিমিত্ত এই ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। তিনি রাজদরবারে সমগ্র বিবরণ বিবৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু বার্দ্ধক্যবশতঃ স্বয়ং রচনাকার্য্য সম্পাদনে অক্ষম হইয়া, স্বীয় সুযোগ্য পুত্র দুর্গামণি উজীরকে বলিলেন,—

"গোবিন্দমাণিক্যাবধি যত রাজাগণ।
কৃষ্ণমাণিক্য মহারাজা করি সমাপন ॥
রামগঙ্গামাণিক্য স্থানে বলিছি পুর্ব্বেতে।
রাজমালা মধ্যাবৃত লিখহ তাহাতে ॥"

পিতার এই আদেশে অনুপ্রাণীত হইয়া, উজীর দুর্গামণি ঠাকুর, রাজমালার চতুর্থ লহর রচনা করিয়াছেন। এই লহরে মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য হইতে, মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য পর্য্যন্ত নয় জন রাজার বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদতিরিক্ত অল্পকাল রাজত্ব করিয়াছেন, এরূপ কতিপয় রাজার বিবরণও ইহাতে আছে।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ আলোচনায় জানা যাইবে, রাজমালা চতুর্থ লহরের বক্তা জয়দেব ঠাকুর ও রচয়িতা দুর্গামণি ঠাকুর, উভয় ব্যক্তিই 'উজীর' পদে নিয়োজিত ছিলেন। 'উজীর' পদবী মুসলমান শাসনের পদ্ধতি অনুসারে গৃহীত হইয়া থাকিলেও এই উপাধি ত্রিপুরা রাজ্যে নিতান্ত আধুনিক নহে। মহারাজ রত্নমাণিক্যের সময় যে তিনজন বাঙ্গালীকে গৌড় হইতে আনিয়া রাজকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তির উত্তরপুরুষগণ এই পদ লাভ করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। গৌড় হইতে সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে বড় খাণ্ডব ঘোষের অধস্তন ষষ্ঠস্থানীয় প্রজাপতি ঘোষ প্রথম উজীরের পদ প্রাপ্ত হন। ইঁহার উত্তরপুরুষগণের মধ্যেও কতিপয় ব্যক্তি এই সম্মানিত পদ লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ ছত্রমাণিক্যের শাসনকালে এই পদ ঘোষ বংশের হস্ত হইতে সেন বংশের হস্তে অর্পিত হয়। মহারাজ জয়মাণিক্যের সময় আবার ঘোষ বংশের দৌহিত্র রামদন দত্ত উজীর-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইঁহার পরবর্ত্তী কতিপয় উজীরের পরিচয় সংগ্রহ করা দুষ্কর হইয়াছে। কোনো কোনো রাজার শাসনকালে রাজবংশ হইতেও উজীর পদে লোক নির্ব্বাচনের প্রমাণ পাওয়া যায় ; দৃষ্টান্ত স্থলে, মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের পৌত্র

উজীর পদবীর বিবরণ

(জগন্নাথ ঠাকুরের পুত্র) সূর্য্যপ্রতাপনারায়ণের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। ইনি মহারাজ দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের উজীর ছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য, জয়দেব ঠাকুরকে উজীর পদে নিয়োগ করেন। তদবধি ইঁহার বংশধরগণ মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি উক্ত পদ লাভ করিয়াছেন। এই জয়দেব উজীর রাজমালা চতুর্থ লহরের বক্তা এবং তদীয় পুত্র দুর্গামণি উজীর এই লহরের রচয়িতা।

সর্ব্বোচ্চ রাজকর্ম্মচারী বা প্রধান মন্ত্রীর 'উজীর' উপাধি ছিল। এই দায়িত্বপূর্ণ পদে বিশেষ যোগ্যতার ব্যক্তিদিগকে নিয়োগ করা হইত। কৃষ্ণমালা গ্রন্থে পাওয়া যায় ;—

"বিমল কুলেতে জন্ম যে জনার হয়।
দেবেতে দ্বিজেতে ভক্তি যাহার থাকয়॥
শাস্ত্রেতে পণ্ডিত হয়, ধর্ম্মে হয় মতি।
প্রজার পালন জানে, জানে রাজনীতি॥
শিষ্টের রক্ষণ জানে দুষ্টের দমন।
ইঙ্গিতে বুঝিতে পারে সুজন দুর্জ্জন॥
সভা উপযুক্ত কথা কহিবারে জানে।
কাব্যেতে রসিক হয় পরাক্রমি রণে॥
প্রিয় বাণী কহে, হয় প্রিয় দরশন।
সাধয়ে প্রভুর কার্য্য করি প্রাণপণ॥
বিপদে চঞ্চল নহে থাকয়ে সুস্থির।
হেনজন হইবারে উচিত উজীর॥

এই উক্তিদ্বারা জানা যাইবে, ত্রিপুর রাজ্যে কিরূপ উচ্চ শ্রেণীর লোককে উজীর পদে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা ছিল।

বর্ত্তমান কালে এই উপাধি বংশগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; এখন আর রাজকার্য্যের সহিত উক্ত উপাধির বড় বেশী সম্বন্ধ নাই। শেষোক্ত উজীর পরিবারের বংশাবলী আলোচনায় জানা যায়, মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের শাসনকালে জয়দেব ঠাকুর, মহারাজ রাজধরমাণিক্যের শাসনকালে রাজমণি ঠাকুর, মহারাজ রামগঙ্গামণিক্যের সময়ে দুর্গামণি ঠাকুর, মহারাজ কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের সময়ে রামজয় ও কৃষ্ণজয় ঠাকুর, মহারাজ রাধাকিশোর-মাণিক্যের শাসনকালে গোপীকৃষ্ণ ঠাকুর উজীর পদ লাভ করিয়াছেন। মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য, শ্রীযুত ব্রজকৃষ্ণ ঠাকুরকে উজীরের পদ প্রদান করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান মহারাজ মাণিক্যবাহাদুরের সময়ও তিনিই ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন ; তিনি উজীর গোপীকৃষ্ণ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই পরিবারের বংশ-তালিকা পর-পৃষ্ঠায় প্রদান করা যাইতেছে।

মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের পৌত্র সূর্য্যপ্রতাপনারায়ণ

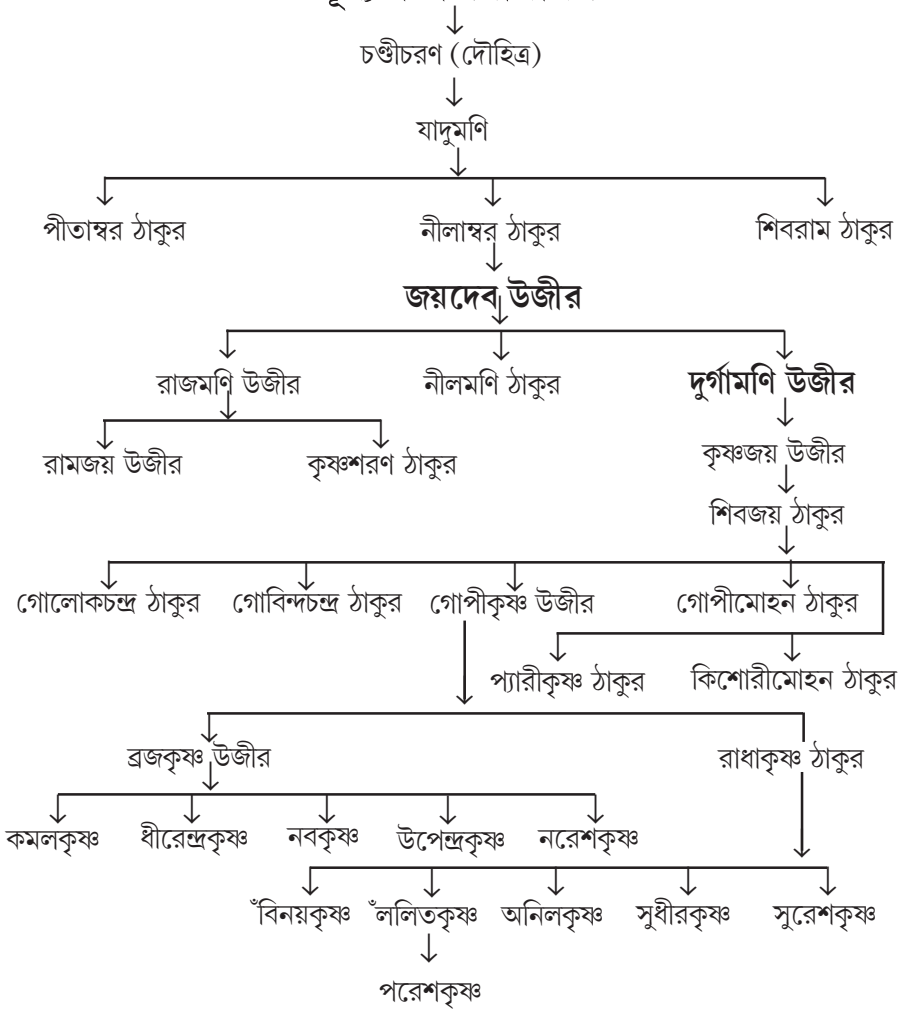

মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্যের আদেশানুসারে উজীর দুর্গামণি কর্ত্তৃক রাজমালার চতুর্থ লহর রচিত হইবার কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। এই লহরের প্রাচীনত্ব নির্ণয় করিতে হইলে, মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্যের শাসনকাল নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। ইঁহার রাজত্বকালের ১৭২৮ শকে (১৮০৬ খ্রীঃ) মুদ্রিত রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, এই মুদ্রা যে তাঁহার রাজ্যলাভের প্রাক্কালে মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই রাজত্বঘটিত কলহে জড়িত হইয়া, নিতান্ত উদ্বিগ্ন হৃদয়ে কালযাপন করিতেছিলেন। তিনি তিন বৎসর রাজ্যশাসন করিবার পর, মহারাজ দুর্গামাণিক্য কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া চারি বৎসর কাল অশেষ দুর্গতিভোগ করিয়াছেন। দুর্গামাণিক্যের পরলোক গমনের পর মহারাজ রামগঙ্গা ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে পুনর্ব্বার রাজ্য

লাভ করিলেন। এবারও কতিপয় ব্যক্তি রাজ্য ও জমিদারীর উপর দাবী স্থাপনের নিমিত্ত প্রয়াসী হওয়ায়, মহারাজকে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় অশান্তি ও উপদ্রব ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি সমস্ত বিবাদ মীমাংসার পর, ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে রাজ্যভিষিক্ত হন। এই সময় হইতে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের চতুর্থ পাদ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া শেষোক্ত সনের ১৪ই নভেম্বর তারিখে মহারাজ রামগঙ্গা লোকলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

উপরোক্ত অবস্থা আলোচনায় বুঝা যাইতেছে, ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দ হইতে মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্যের রাজত্বের সূত্রপাত হইয়া থাকিলেও ১৮২১ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে তিনি সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। সুতরাং তৎকালে অশান্তি ও উদ্বেগ লইয়া রাজমালা সঙ্কলন কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, এমন মনে হয় না। তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগ (১৮২১—১৮২৬ খ্রীঃ) শান্তিপূর্ণ ছিল। সম্যক অবস্থা আলোচনা করিলে বুঝা যায়, এই সময় মধ্যেই রাজমালার চতুর্থ লহর রচিত হইয়াছে ; সুতরাং এই অংশ খ্রীঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগের রচিত এবং ইহার প্রাচীনত্ব কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী নির্ণীত হইতেছে।

রাজমালা রচনা পক্ষে সময়ের আনুকূল্য

এই সময় ত্রিপুরায়, খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গ ভাষার প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। বঙ্গ ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যাইবে, এই শতাব্দীতে সাহিত্যক্ষেত্রে যে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা বঙ্গভাষার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। এই সময় অনেক কৃতী ব্যক্তি বঙ্গ-ভারতীর সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা সাহিত্য-ভাণ্ডারে অনেক মূল্যবান রত্ন প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রেমদাসের চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী, দ্বিজভবানন্দের হরিবংশ, জীবন মৈত্রের ঊষা হরণ, জয়নারায়ণ সেনের হরিলীলা, চৈতন্যদাসের রসভক্তি চন্দ্রিকা, যুগলকিশোর দাসের প্রেমবিলাস প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ ; কৃষ্ণদাসের নারদ পুরাণ, গোবিন্দদাসের গরুড় পুরাণ, গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণ ; অদ্ভুত আচার্য্য, দ্বিজ লক্ষ্মণ, দ্বিজ ভবানী, জগদ্রাম রায়, রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিগণের রচিত রামায়ণ ; রঘুনন্দন গোস্বামীর রামরসায়ণ ; রামেশ্বর নন্দী ও লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাভারত ; রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়ণ ; দ্বিজ কালিদাসের কালিকা মঙ্গল, দ্বিজ রসিকের মনসা মঙ্গল, ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল, নরসিংহ বসু ও সহদেব চক্রবর্তীর ধর্ম্মমহগল প্রভৃতির নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীত চর্চায়ও এই যুগের সাহিত্য বিপুল সম্পদ লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে রামপ্রসাদ সেন ও দেওয়ান রামদুলাল নন্দীর শ্যামাসঙ্গীত, রামনিধি গুপ্তের (নিধুবাবুর) টপ্পা, হরুঠাকুর ও রামবসু প্রভৃতির কবিগান, গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা পালার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেখ মনোহরের গাজীনামা,

দেবাই পণ্ডিতের বৃহন্নারদীয় পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ ত্রিপুরার এই যুগের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি। এই প্রকারের আরও অনেক কবির এবং গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। বঙ্গভাষার এবম্বিধ চর্চা যে রাজমালা চতুর্থ লহর রচনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

রাজমালা সংশোধন

রাজমালা চতুর্থ লহরের রচয়িতা উজীর দুর্গামণি ঠাকুর প্রাচীন রাজমালার সমগ্র ভাগ সংশোধন করিয়াছিলেন। উক্ত লহরের প্রারম্ভেই লিখিত হইয়াছে ;—

"পুরাতন রাজমালা আছিল রচিত।
প্রসঙ্গেতে অলগ্নিক ভাষা যে কুৎসিত॥
পূর্ব্ব প্রসঙ্গ পরে পর পূর্ব্বে কত।
সেইত কারণে লোকে নাহি বুঝে যত॥
ত্রিপুরা রাজ্যের নাম ত্রিপুর যে মতে।
ত্রিপুরা রাজার প্রমাণ না লিখিছে তাতে॥
বার শ আটত্রিশ সন ত্রিপুরা যখনি।
তাহাকে সুধিল পুনি উজীর দুর্গামণি"॥

উদ্ধৃত বাক্যে পাওয়া যাইতেছে, ১২৩৮ ত্রিপুরাব্দে এই সংশোধন কার্য্য নিষ্পাদিত হইয়াছে। সুতরাং রাজমালা চতুর্থ লহর রচনার সমসাময়িক কালেই এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। উজীর মহোদয়ের এই সংশোধন কার্য্য সকলের রুচি-সম্মত হইবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিয়াই যেন তিনি বলিয়াছেন,—

"এহাতে দ্বিরুক্তি যদি কাহার জন্ময়।
পুরাণাদি দর্শিলে যে ঘুচিবে সংশয়
পুরাতন রাজমালা আছয়ে বিদিত।
ইহা সঙ্গে মিলাইলে বুঝিবে নিশ্চিচ

আমরা পুরাতন রাজমালার সহিত সংশোধিত অংশ মিলাইয়া দেখিয়াছি, উজীর মহোদয়ের সংশোধন দ্বারা রাজমালার মূলতঃ কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা ক্ষতি সঙ্ঘটিত হয় নাই, কোনো কোনো স্থানে ভাষা প্রাঞ্জল করিবার ও অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু এই কার্য্যের দ্বারা যে প্রাচীন গ্রন্থের মৌলিকতা নষ্ট হইয়াছে, উজীর মহোদয় বোধ হয় সে কথা ভাবেন নাই। তাঁহার কার্য্যের দ্বারা ভাষার উৎকর্ষ কি অপকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। প্রাচীন ভাষার সহিত অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষার সংমিশ্রণ, অনেক স্থলে খাপছাড়া হইয়াছে।

রাজমালায় ব্যবহৃত ভাষার বিচার পূর্ব্বে করা হয় নাই—এখনও করিব না। এতদ্বিষয়ক আলোচনায় লিপ্ত হওয়া নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার ; বিশেষতঃ উজীর

মহোদয় কর্ত্তৃক ভাষা সংশোধিত হওয়ায়, এই গ্রন্থের প্রথম তিন লহরের আদত ভাষাণ অনেকাংশ রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রাচীন রাজমালা আলোচনা করিলে রচয়িতাগণের ভাষার স্বরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে সত্য, কিন্তু সংশোধিত গ্রন্থের আলোচনা উপলক্ষে, প্রাচীন গ্রন্থের ভাষা-লইয়া নাড়াচাড়া করিতে গেলে সামঞ্জস্য রক্ষা করা নিতান্তই অসম্ভব হইবে। এই সকল কারণে প্রথম তিন লহরের ভাষা তত্ত্বের আলোচনায় নিরস্ত থাকিতে হইয়াছে। চতুর্থ লহর উজীর মহোদয়ের স্বরচিত ; এই অংশের ভাষার উপর অন্য কাহারও হস্তক্ষেপ হয় নাই,—রচয়িতার ভাষা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পূর্ব্ব তিন লহরের ভাষা বিষয়ে যখন কোনো কথা বলিবার উপায় নাই, তখন এই লহরের ভাষা লইয়া বাহুল্য কথার অবতারণা করিতে যাওয়া নিতান্তই অশোভনীয় হইবে। সুতরাং এই লহরের ভাষা সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া, প্রাচীন ভাষার অবস্থা বিষয়ক দুই একটী কথা বলা হইবে মাত্র।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে প্রাকৃত শব্দ প্রয়োগের একটা প্রথা পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। বোলেন্ত, করোন্তি, পিবন্তি, যান্তি প্রভৃতি প্রাকৃত শব্দের প্রয়োগে অনেক বাঙ্গালা সাহিত্যে পাওয়া যায়। রাজমালা চতুর্থ লহরেও এবম্বিধ শব্দ প্রয়োগের আভাস পাওয়া যাইতেছে। দুই একটী দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদান করা গেল ;—

"জগন্নাথ ঠাকুর জামাতা সম্বোধিয়া।
বলিলেন্ত আমা পুত্র আন ফিরাইয়া ॥"
গোবিন্দমাণিক্য খণ্ড।

"ছত্রমাণিক্যের পুত্র উৎসব রায় নাম।
বলিলেন্ত এই রাজ্যে কাটা মারা কাম ॥"
গোবিন্দমাণিক্য খণ্ড।

"নবাবের আর সৈন্য আইসে শুনিয়া।
মহারাজা মুর্শুদাবাদ গেলেন্ত চলিয়া ॥"
কৃষ্ণমাণিক্য খণ্ড।

প্রাকৃত ভাষায় অনেকস্থলে প্রথমার একবচনে 'এ' বর্ণের প্রয়োগ পাওয়া যায়। কর্ত্তৃবাচক তৃতীয়া বিভক্তিতেও ঐরূপ 'এ' ব্যবহৃত হইত। প্রাকৃত হইতে, বাঙ্গালা ভাষায়ও এই ব্যবহার গৃহীত হইবার নিদর্শন অনেক প্রাচীন গ্রন্থে রহিয়াছে। রাজমালা চতুর্থ লহরে ঐরূপ স্থলে 'এ' প্রয়োগের দৃষ্টান্ত বিস্তর আছে ;—

"মতাইতে রাজধানী করিল রাজন।
ত্রিপুরা পাহাড় দক্ষিণ করএ শাসন ॥"
জয়মাণিক্য খণ্ড।

"উদয়মাণিক্য যদি হএত নৃপতি।
তাহুতের বাকী কর পড়িবেক হাতী॥"
জয়মাণিক্য খণ্ড।

"ইন্দ্রমাণিক্য রাজার কাল প্রাপ্তি হএ।
পুনরপি জয়মাণিক্য দরখাস্ত করএ॥"
জয়মাণিক্য খণ্ড।

ভাষা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু এবিষয় লইয়া কথা বাড়াইব না। মুসলমান প্রভাবের সময় হইতে বঙ্গসাহিত্যে উর্দ্দু ও পারস্য ভাষার অনেক শব্দ স্থান লাভ করিয়াছিল। রাজমালা চতুর্থ লহরে রাজনীতিক আলোচনায় মুসলমানী ভাষার প্রয়োগ অনিবার্য্য হইয়াছিল। নজরানা, মাসরা, জায়গীর, উজীর, নাজির, সুবা, ফৌজ, ফৌজদার, খিলাত, গমি, তাহুত, ওয়াদা, কিস্তিবন্দী, ফরমান, পরোয়ানা, হুজুর, কারসাজি, দরখাস্ত ইত্যাদি বিস্তর উর্দ্দু ও পারস্য ভাষার শব্দ এই লহরে পাওয়া যায়। আবার, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভাবে, অনেক ইংরেজী শব্দ দ্বারাও ইহার কলেবর পুষ্ট হইয়াছে। এই সকল কারণে রাজমালা চতুর্থ লহরে সংস্কৃত, প্রাকৃত, বাঙ্গলা, উর্দ্দু, পারস্য ও ইংরেজী ভাষার সমাবেশ ঘটিয়াছে। সে কালের বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা সর্ব্বত্রই এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল।

এই সময়ও সাহিত্যে প্রাদেশিক ভাষার প্রভাব কথঞ্চিৎ বিদ্যমান ছিল ; রাজমালার চতুর্থ লহরে এ বিষয়ের বিস্তর নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহার কোনো কোনো স্থলে ত্রিপুরার প্রচলিত ভাষারও ছাপ পড়িয়াছে। তদ্বিষয়ক দুই একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদান করা গেল।

(১) "শয়নে স্বপনে দেখে যদি নিদ্রা হয়।
গলাচাপি ধরে তাকে প্রাণ কাঁপে ভয়॥"
রত্নমাণিক্য খণ্ড।

(২) "আছুমণি সুবাকে যে রাখিছে ঢাকাতে।
ঢাকাতে আসিয়া রাজা ছোড়ায় তাহাতে॥"
কৃষ্ণমাণিক্য খণ্ড।

(৩) "সত্ররত্ন নির্ম্মাইল জগন্নাথ পুরে।"
কৃষ্ণমাণিক্য খণ্ড।

গলাচাপি—(গলা টিপিয়া), ছোড়ায়—(ছাড়ায়), সত্ররত্ন—(সতর রত্ন), এই সকল শব্দ ত্রিপুরার কথিত ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে। তবে, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব লহরের তুলনায় এই লহরে প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম পাওয়া যায়।

রাজমালা চতুর্থ লহরে যে-সকল ঐতিহ্য বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা যথাযথ ভাবে সংগ্রহ করিবার পক্ষে রচয়িতার বিস্তর সতর্কতা অবলম্বন করিবার প্রমাণ অনেকস্থলেই পাওয়া যায়। তবে, দীর্ঘকাল পূর্ব্বের বিবরণ সংগ্রহ করিতে গেলে সামান্য ভ্রম প্রমাদ সঙ্ঘটিত হওয়া যেরূপ স্বাভাবিক, এ স্থলেও কিয়ৎপরিমাণে তাহা না ঘটিয়াছে, এমন নহে। কোনো কোনো রাজার কাল নির্ণয় বিষয়ে সামান্য তারতম্য ঘটিয়াছে, এবং মুসলমান ও ইংরেজ শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে অনেকের নাম কতকটা বিকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই সামান্য ত্রুটির দ্বারা রাজমালার ঐতিহাসিক মূল্যের কোনোরূপ লাঘব ঘটে নাই।

চতুর্থ লহরের এতিহাসিক মূল্য

নবাব দরবারে প্রতিভূ রক্ষার নিয়ম

মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের মানবলীলা সম্বরণের পর, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দদেব 'গোবিন্দমাণিক্য' নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। তিনি কিয়ৎপরিমাণে মূসলমানগণের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে, মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে ত্রিপুরার পক্ষে জনৈক প্রতিভূ (Hostage) রাখিবার ব্যবস্থা হয়। প্রতিনিধির মধ্যবর্ত্তিতায় নবাব দরবারে ত্রিপুরা রাজ্যঘটিত সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। এই সকল প্রতিনিধির দায়িত্ব ও গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল ; এবং ইঁহাদের কার্য্যের উপর রাজ্যের ভাল-মন্দ নির্ভর করিত।

মহারাজ গোবিন্দ, স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নক্ষত্র ঠাকুরকে প্রতিনিধিরূপে মুর্শিদাবাদের দরবারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে ;—

"রাজার বৈমাত্র ভ্রাতা নক্ষত্র ঠাকুর।
মুর্শুদাবাদেতে তুলে* নবাব হুজুর ॥"
গোবিন্দমাণিক্য খণ্ড—৬ পৃষ্ঠা।

নবাব দরবারে রক্ষিত প্রতিনিধিকে 'তুল' বলা হইত। উক্ত 'তুল' প্রথা অনেককাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, এবং এই প্রথা রাজ্যের পক্ষে এক গুরুতর অনিষ্টদায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। 'তুল' প্রথা প্রবর্ত্তনের প্রারম্ভেই, প্রথম প্রতিনধি নক্ষত্র ঠাকুর, কিয়ৎকাল নবাব দরবারে অবস্থান করিয়া প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করিলেন এবং এই সুযোগে তাঁহার হৃদয়ে রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিল। তিনি নানা কৌশলে নবাবকে বশীভূত করিয়া, তৎপ্রদত্ত সৈনিক-বলসহ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এবং মহারাজা গোবিন্দমাণিক্যকে অন্তরিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। এই সময় ত্রিপুরা অন্তর্বিপ্লবদ্বারা

* 'তুল' শব্দ দ্বারা স্বীয় তুল্য ব্যক্তি (প্রতিনিধি)-কে বুঝান হইয়াছে।

নক্ষত্র রায় বিশেষ আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ক বিশদ বিবরণ অতঃপর বিবৃতি হইবে।

পরবর্ত্তী রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক 'তুলে' নিয়োজিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই নক্ষত্র ঠাকুরের পদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া, রাজ্যে নানাবিধ অশান্তি ও উপদ্রব ঘটাইয়াছেন। ইঁহাদের আচরণ দ্বারা রাজশ্রী উত্তরোত্তর পরিম্লানা হইয়া উঠিতেছিলেন।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য হইতে জয়মাণিক্য পর্য্যন্ত ভূপতিবৃন্দের শাসনকালে প্রতিভূ নিয়োগের প্রথা স্থিরতর থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার পর নানাবিধ উচ্ছৃঙ্খলা দ্বারা রাজ্যের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। এই বিশৃঙ্খলার ফলে প্রতিভূ নিয়োগের প্রথা বন্ধ হইয়াছে।

পারিবারিক কথা

রাজমালা চতুর্থ লহবে, ত্রিপুরা রাজবংশের পারিবারিক বিবরণ অতি অল্পই পাওয়া যায়। যে সামান্য বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার স্থূলমর্ম্ম নিম্নে প্রদান করা গেল।

বৈবাহিক বিবরণ

রাজমালার চতুর্থ লহর, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের বিবরণ লইয়া আরম্ভ হইয়াছে। ইঁহার মহিষীর নাম মহারাণী গুণবতী মহাদেবী। এই মহারাণীর নাম ব্যতীত অন্য কোনো পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। রাজমালায় লিখিত আছে,—

"গোবিন্দমাণিক্য রাজা হইল রাজন।
গুণবতী মহারাণী বিখ্যাত ভুবন ॥"
গোবিন্দমাণিক্য খণ্ড—৬ পৃষ্ঠা

শ্রেণীমালা গ্রন্থেও মহারাণীর নামোল্লেখ মাত্র আছে, পরিচয়সূচক কোনো কথা নাই।

"কল্যাণের তনয় গোবিন্দ যুবরাজ।
গোবিন্দমাণিক্য নামে হৈল মহারাজ ॥"
গুণবতী নামে হৈল তাহান যে রাণী।
তাহার সন্তান দুই রাম-দুর্গা শুনি ॥"
শ্রেণীমালা।

গোবিন্দমাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহারাজ ছত্রমাণিক্য (নক্ষত্র ঠাকুর) কোথায় বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং মহারাণীর নাম কি, তাহার কোনো বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই ; সুতরাং তদ্বিষয়ে কোনো কথা বলা অসাধ্য হইয়াছে।

শ্রেণীমালা গ্রন্থ আলোচনায় জানা যায়, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র রামদেবমাণিক্যের (রামমাণিক্য) প্রধানা মহিষীর নাম ছিল সত্যবতী। রাজমালায় তাঁহার বহু মহিষীর উল্লেখ পাওয়া যায়,—

"বহুজন ছিল রাণী পরম সুন্দরী ॥"

রামমাণিক্য খণ্ড—১৬ পৃষ্ঠা

রাজমালায় কোনো মহিষীর নামোল্লেখ করা হয় নাই ; এবং তাঁহাদের পরিচয়সূচক কোনো কথাও নাই। রামমাণিক্যের পুত্র মহারাজ রত্নমাণিক্যের প্রধানা মহিষীর নাম রত্নাবতী। এই রাজাও বহুসংখ্যক মহিষী করিয়াছিলেন। রাজমালায় লিখিত আছে,—

"রত্নমাণিক্য রাজা যুবক হইল।
ছয় কুড়িজন কন্যা বিবাহ করিল ॥
মুখ্য রাণী রত্নাবতী বসিল বিদিত।
আর রাণী চতুর্ভিতে হইয়াছে শোভিত ॥"

রত্নমাণিক্য খণ্ড—২০ পৃষ্ঠা।

প্রধান মহিষী ব্যতীত অন্য মহিষীগণের নাম এবং কোনো মহিষীরই পরিচয়জ্ঞাপক বিবরণ পাওয়া গেল না। মহারাজ দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণিক্যের মহিষীর নাম রাজমালায় ধর্ম্মশীলা লিখিত হইয়াছে ; যথা,—

"ধর্ম্মমাণিক্য মহারাজ ধর্ম্মশীলা রাণী।
এই মত গজসিক্কা* হয় রাজধানী ॥"

ধর্ম্মমাণিক্য খণ্ড—২৬ পৃষ্ঠা।

শ্রেণীমালা গ্রন্থ আলোচনায় জানা যায় 'ধর্ম্মশালা' আখ্যা ধর্ম্মমাণিক্যের রাজ্যলাভের পরে প্রদান করা হইয়াছে। এই রাজমহিষীর পূর্ব্ব নাম ছিল—সুভদ্রা। ইঁহারও পিতৃকুলের পরিচয় পাওয়া যায় না। শ্রেণীমালায় লিখিত আছে ;—

"ধর্ম্মমাণিক্য শ্রেণী করিব আখ্যান।
সুভদ্রা নামেতে রাণী ধর্ম্মশীলাখ্যান ॥"

শ্রেণীমালা।

লক্ষ্মণমাণিক্যের (লবঙ্গ বা বনমালী ঠাকুরের) নাম রাজমালায় লিখিত হয় নাই ; এরূপ করিবার কারণ যথা স্থানে বলা হইবে। ইঁহার মহিষীর নাম ছিল মোহদা দেবী। 'মোহদা' শব্দ 'মহোদয়া' শব্দের অপভ্রষ্ট বলিয়াই মনে হয়। ইনি নুরনগর পরগণায় একটী দীর্ঘিকা খনন ও তথায় এক বাজার সংস্থাপন করিয়াছিলেন

---

* গজসিক্কা—মুদ্রা।

; সেই কীর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, এবং স্থানের নাম 'মোহদাগঞ্জ' হইয়াছে। ইনি বেচুরাম কবরার দুহিতা ছিলেন, এই মাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। যথা,—

লক্ষ্মণমাণিক্য পত্নী মোহদা নামেতে।
বেচুরাম কবরা কন্যা জানিবা তাহাতে ॥
মোহদাগঞ্জেতে দীঘী করিয়া খনন।
আপন নামেতে মোহাদাগঞ্জ করে নিরূপণ ॥"

শ্রেণীমালা।

রামাদেবমাণিক্যের পুত্র মহারাজ মুকুন্দমাণিক্যের প্রধানা মহিষীর নাম মাত্র রাজমালায় পাওয়া যায়, পরিচয়সূচক কোনো কথা নাই। তাঁহার রুক্মিণী নাম্নী অন্য এক মহিষীরও নামোল্লেখ আছে।

"মুকুন্দমাণিক্য নাম গজসিক্কা হৈল
প্রভাবতী মহারাণী মোহরে লিখিল ॥
তান ছিল দুই রাণী শ্রেষ্ঠা প্রভাবতী।
জৈন্তা রাজা জ্ঞাতি সুতা ধর্ম্মে ছিল মতি ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র পাঁচকড়ি মুর্শুদাবাদ তুলে।
কৃষ্ণমণি জয়মণি তিন ভাই ছিলে ॥
রুক্মিণী রাণীতে জন্মে হরি ভদ্র মণি।
দুই পক্ষে পঞ্চ পুত্র ছিল নৃপণি ॥"

মুকুন্দমাণিক্য খণ্ড—৩২ পৃষ্ঠা।

এতৎ সম্বন্ধে শ্রেণীমালা গ্রন্থে পাওয়া যায়,—

মুকুন্দমাণিক্য নৃপের রাণী প্রভাবতী।
বড়ুয়া রাজার* জ্ঞাতির হয়েত সন্তনি ॥
* * * *
* * * *
মুকুন্দমাণিক্য পত্নী আর রুক্মিণী।
হরিমণি জয়মণির হয়ত জননী ॥"

শ্রেণীমালা।

রাজমালার উক্তিতে জানা যায়, মহারাজ জয়মাণিক্যের মহিষীর নাম যশোদা মহাদেবী। তাঁহার পরিচয়বিষয়ক কোনো কথার উল্লেখ নাই। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"জয়মাণিক্য রাজা যশোদা নাম রাণী।
এই নামে গজসিক্কা করিল আপনি ॥"

জয়মাণিক্য খণ্ড—৩৭ পৃষ্ঠা।

---

*জয়ন্তিয়ার রাজাকে 'বড়ুয়া রাজা' বলা হইয়াছে।

শ্রেণীমালা গ্রন্থে পাওয়া যায় ; —

"পূর্ব্বে রুদ্রমণি সুবা নাম যে আছিল।
জয়মাণিক্য নামে পরে নৃপ হৈল।
তান মহারাণী হয় যশোদা নামেতে।
জয়মঙ্গল ঠাকুর জন্মিলেক তাতে ॥"

শ্রেণীমালা।

দ্বিতীয় বিজয়মাণিক্যের মহিষীর পরিচয়সূচক কোনো কথা রাজমালায় নাই মাত্র নামোল্লেখ করা হইয়াছে ; যথা,—

"বিজয়মাণিক্য নামে বৈসে সিংহাসন।
সুনন্দা নামেতে রাণী বিখ্যাত সেইক্ষণ ॥"

বিজয়মাণিক্য খণ্ড—৪৪ পৃষ্ঠা।

শ্রেণীমালা গ্রন্থে মহারাজ বিজয়ের সুনন্দা ও সারদা নাম্নী দুই মহিষীর নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থেও তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করা হয় নাই।

মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্যের মহারাণীর নাম দুর্গা মহাদেবী। রাজমালায় লিখিত আছে ;—

"ইন্দ্রমাণিক্য রাজা দুর্গা মহারাণী।
রাজা রাণী নামে গজসিক্কা রাজধানী ॥"

জয়মাণিক্য খণ্ড—৩৭ পৃষ্ঠা।

রাজমালা বা শ্রেণীমালা গ্রন্থে রাজমহিষীর পরিচয় নাই। কৃষ্ণমালা গ্রন্থে, মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্যের লোকান্তরের বিবরণ বর্ণনোপলক্ষে, প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে, —

"যুবরাজ মুখ দেখি, রাণী বলে একি একি,
সঙ্গেত লইয়া সখিগণ।
যুবরাজ বলে বাণী, বলিতে না সরে পুনি,
নরপতি ত্যজিছে জীবন ॥
শুনি চন্দ্রভীম সুতা, হাতে আঘাতিয়া মাথা,
মহীতলে গড়ে অধোমুখে।"

কৃষ্ণমালা।

এই বাক্য দ্বারা জানা যায়, মহারাণী দুর্গা, চন্দ্রভীমের কন্যা ছিলেন। চন্দ্রভীমের কোনও বিবরণ বা পরিচয় পাইবার সুবিধা ঘটিল না।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের মহিষীর নাম জাহ্নবী মহাদেবী। রাজমালা ও শ্রেণীমালা গ্রন্থে এই মাত্র পরিচয় পাওয়া যায় ; যথা—

"কৃষ্ণমাণিক্য রাজা জাহ্নবা মহারাণী।
রাজা রাণী নামে সিক্কা প্রচার তখনি ॥"

কৃষ্ণমাণিক্য খণ্ড—৫০ পৃষ্ঠা।

"কৃষ্ণমাণিক্য রাণী জাহ্নবা নামেতে।
পুত্র কন্যা না হইল তাহান গর্ব্ভেতে ॥"

শ্রেণীমালা।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যই আলোচ্য চতুর্থ লহরের অন্তর্ব্বর্ত্তী শেষ রাজা। এই লহরের অন্তর্গত রাজগণের মধ্যে কে কোন স্থানে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা সংগ্রহ করা বর্ত্তমান কালে অসম্ভব হইয়াছে। যে সামান্য বিবরণ সংগ্রহ করা হইল, তাহা আলোচনায় বুঝা যায়, রাজ্যস্থ লোক সমাজের মধ্যেই রাজপরিবারের যৌনসম্বন্ধ নিবদ্ধ ছিল। জয়ন্তিয়ার রাজপরিবারের সহিত এই সময় হইতে আদানপ্রদানের সূত্রপাত হইয়াছিল মাত্র। সেকালে ত্রিপুর রাজ্য নিতান্ত দুর্গম ও অরণ্যসঙ্কুল ছিল। দূরবর্ত্তী স্থানের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের পক্ষে ইহাই প্রধান অন্তরায় বলিয়া বুঝা যাইতেছে, রাজ্যের পশ্চিম ভাগে সুবিশাল লৌহিত্য সাগর বিদ্যমান থাকায় বঙ্গদেশের সহিত এই রাজ্যের সম্বন্ধ এক রকম বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

রাজপরিবারে বহু বিবাহের প্রথা আবহমান কাল চলিয়া আসিয়াছে। রাজমালা চতুর্থ লহরের ঘটনার সমকালেও এই প্রথা পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছিল। এই লহর আলোচনায় জানা যায়, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র রামমাণিক্য বহু মহিষী গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ রামমাণিক্যের পুত্র রত্নমাণিক্যের ছয় কুড়ি (১২০ জন) মহিষী থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বহুবিবাহ প্রথা

মহারাজ রত্নমাণিক্যের দুই জন মহিষী ছিল। মহারাজ বিজয়মাণিক্যেরও দুই মহিষীর নাম পাওয়া যাইতেছে। অন্যান্য রাজগণের একাধিক মহিষীর নামোল্লেখ না থাকিলেও তাঁহারা যে এই প্রথার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, এমন মনে হয় না। 'শ্রেণীমালা' আলোচনায় জানা যায়, রাজপরিবার এবং এই পরিবার সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যকিগণও একাধিক বিবাহ করিতে বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন। সে-কালে বহুবিবাহ যেন একটা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। ত্রিপুরার বহির্ভাগস্থ অন্যান্য দেশেও এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। একটা কন্যাদান উপলক্ষে যৌতুকস্বরূপ আরও কতিপয় কন্যা পত্নীরূপে বরকে প্রদান করিবার প্রথাও এক সময়ে সমাজে প্রচলিত ছিল।

রাজমালা চতুর্থ লহরের সমসাময়িক কালের সামাজিক অবস্থা আলোচনা করিলে জানা যাইবে, সে-কালে, পুরুষগণ বহুবিবাহের প্রশ্রয় দ্বারা স্বেচ্ছাচার করিলেও মহিলাগণ

সহমরণ প্রথা

সতী-ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবতী ছিলেন। রাজপরিবারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, মহারাজ রত্নমাণিক্যের মহিষী মহারাণী রত্নাবতী এবং মহারাজ মুকুন্দ-মাণিক্যের মহিষী প্রভাবতী মহাদেবী পতির চিতায় আরোহণ করিয়া সতীধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজপরিবারের অন্যান্য মহিলাগণও এই পথ অবলম্বনে

বিমুখ ছিলেন না। যুবরাজ হরমণি ঠাকুরের পত্নী রাণী রত্নমালা পতির সহমৃতা হইয়াছেন, এবিষয়ে রাজমালা বলেন,—

"হরিমণি যুবরাজ হইল মরণ।
রাণী রত্নমালা দেবী সহিতে গমন ॥"

কৃষ্ণমাণিক্য খণ্ড,—৫৩ পৃষ্ঠা।

শ্রেণীমালায়ও এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজমালায় মাত্র এক রাণীর সহগমনের কথা লিখিত হইয়াছে, শ্রেণীমালায় তিন রাণীর উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে,

যথা ঃ—

"হরিমণি যুবরাজ স্বর্গগামী হৈল।
তান সঙ্গে তিন রাণী সহগামী গেল ॥"

শ্রেণীমালা।

রাজপরিবার ব্যতীত অন্যান্য পরিবারের বিষয় আলোচনা করিলেও মহিলাগণের পতির চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিবার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যাইবে। তাহার কতিপয় নিদর্শনের উল্লেখ করা যাইতেছে।

"আছুমণি সুবার যে হইল মরণ।
তান তিন পত্নী সহমৃতা যে তখন ॥"
"দুঃখমণি ঠাকুর গেল স্বর্গপুরী।
সহগামী হইলেক বেচুরি কুমারী ॥"
"রবিলোচন কবরা পত্নী পদ্মলোচন সুতা।
পতি সঙ্গে কুমিল্লাতে গেল সহমৃতা ॥"
"ভদ্রমণি দেওয়ানের কালপ্রাপ্ত হৈল।
তান পত্নী নবদুর্গা সহগামী গেল ॥"

শ্রেণীমালা।

এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। এই সকল বিবরণ আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, তৎকালে ত্রিপুরার, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের রমণী সমাজে স্বামী-সহগামিনী হইবার স্পৃহা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং ঘরে ঘরে সচরাচরই এই ব্রত অনুষ্ঠিত হইত। এক পতির সঙ্গে একাধিক পত্নী সহমৃতা হইবার দৃষ্টান্তও উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে।

রাজার নামের সহিত মহারাণীগণের নামের সাদৃশ্য রক্ষা করা ত্রিপুরার একটী প্রাচীন প্রথা। স্মরণাতীত কালের রাজা আচোঙ্গ ফাএর সময়ে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। * রাজমালার পুর্ব্ব পূর্ব্ব অংশ আলোচনায় জানা গিয়াছে, এই প্রথা উত্তরোত্তর শিথিল হইয়া থাকিলেও

রাজা ও রাণীর এক নাম রক্ষার প্রথা

* আচোঙ্গ রাজার নাম আচোঙ্গ মা রাণী।
তদবধি রাজা রাণী এক নাম জানি"

রাজমালা—১ম লহর, ৫৯ পৃষ্ঠা।

কোনো কোনো রাজা সেই প্রাচীন প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তনের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। রাজমালা চতুর্থ লহরেও এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। মহারাজ রত্নমাণিক্যের প্রধানা মহিষীর নাম রত্নাবতী। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের মহিষীর নাম সুভদ্রা ছিল, তাঁহার যৌবরাজ্য লাভের সময় হইতে সেই নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "ধর্ম্মশীলা" নাম রাখা হয়। এতৎ সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে ;—

"রত্নমাণিক্য রাজা যুবক হইল।
ছয়কুড়ি জন কন্যা বিবাহ করিল ॥
মুখ্য রাণী রত্নাবতী বসিল বিদিত।"

"ধর্ম্মমাণিক্য শ্রেণী করিব ব্যাখ্যান।
সুভদ্রা নামেতে রাণী ধর্ম্মশীলাখ্যান ॥"

ইহা প্রাচীন পদ্ধতি রক্ষার প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? কেবল এ বিষয় লইয়াই কথা নহে— সকল বিষয়েই প্রাচীন পদ্ধতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের প্রবল আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা ত্রিপুর রাজবংশের একটা উল্লেখযোগ্য সদ্‌গুণ।

মৃত রাজার অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পাদন পদ্ধতি

এই বংশের আর একটী বিশেষ প্রথা এই যে, কোনো রাজা লোকলীলা সম্বরণ করিলে তাঁহার উত্তরাধিকারী রাজত্বের ভার গ্রহণ করিয়া, পরলোকগত রাজার অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের আদেশ প্রদান করিবার পর, তাঁহার দেহের দাহ-সংস্কার করা হয়। রাজমালা চতুর্থ লহরের ঘটনার সমকালেও এই নিয়ম পূর্ণমাত্রায় প্রতিপালিত হইয়াছে। মহারাজ মুকুন্দমাণিক্যের দেহরক্ষা কালে, মহারাণী প্রভাবতী বাগশিমূল গ্রামে এবং রাজপুত্র পাঁচকড়ি ঠাকুর প্রতিভূস্বরূপ মুর্শিদাবাদ দরবারে ছিলেন। মহারাজের পরিত্যক্ত দেহ সাত দিবস তৈলপাত্রে রক্ষা করা হয়। অন্তঃপর মহারাণী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, রাজার অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিলেন। এবং পতির চিতারোহণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এই সময় গোবিন্দমামিক্যের ভ্রাতা জগন্নাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র, রুদ্রমণি ঠাকুর সুবার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি প্রধান সেনাপতি ফৌজবিচার নারায়ণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, সিংহাসন অধিকারে প্রয়াসী হইলেন। সেনাপতি, রাজার মৃতদেহ আটক রাখিয়া মহারাণীকে বলিলেন, "রাজ্য অরাজক করিয়া রাজার সহিত মহাপ্রস্থান করা আপনার পক্ষে সঙ্গত হইবে না।" তিনি কৌলিক প্রথা স্মরণ করাইয়া পুনর্ব্বার বলিলেন,—

"নব্যরাজা সিংহাসনে বসিয়া আসন।
মৃত রাজা দহিবারে আদেশ করেন ॥"

নবীন ভূপতি সিংহাসনে বসিয়া আদেশ না-করা পর্য্যন্ত মৃত রাজার অন্ত্যোষ্টি-ক্রিয়া হইতে পারে না —এই হেতু দর্শাইয়া রুদ্রমণিকে রাজা করিবার নিমিত্ত

মহারাণীর সম্মতি চাওয়া হইল। মহারাণী বলিলেন,—"আমি মহাপ্রস্থান করিতেছি, এই সময় আমাকে বাধা দেওয়া বা আমার মতামত চাওয়া নিতান্তই অকর্ত্তব্য। রাজার পুত্র বিদ্যমান থাকিতে অন্যকে রাজা করিবার পক্ষে আমি সম্মতি প্রদান করিতে পারি না। আমাকে তোমাদের হাত হইতে মুক্তি প্রদান কর, আমার দেহ রক্ষার পরে তোমাদের ধর্ম্মানুগত ভাবে যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিও।" অতঃপর সেনাপতি ফৌজবিচার নারায়ণ রাজার মৃতদেহ ছাড়িয়া দিয়া, সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলেন—রুদ্রমণি সুবাকে রাজা করিবার নিমিত্ত মহারাণী সম্মতি দান করিয়াছেন এই অমূলক বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া সুবা রুদ্রমণি সিংহাসন অধিকারপূর্ব্বক মৃত রাজার দাহ সংস্কার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

এই পারিবারিক প্রথা রাজমালা চতুর্থ লহর সংসৃষ্ট সময়ের পরেও অনেক কাল চলিবার নিদর্শন পাওয়া যায়। নানাবিধ ছল প্রতারণার যুগেও প্রাচীন পদ্ধতির প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন অল্প গৌরবের কথা নহে।

শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চ্চা

রাজ পরিবারের শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা

রাজমালা চতুর্থ লহরের অন্তর্ভুক্ত রাজগণের মধ্যে কে কিরূপ বিদ্বান ও শিক্ষিত ছিলেন, তদ্বিবরণ লিখিত হয় নাই। কোনো কোনো রাজার শিক্ষা বিষয়ে সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাত্র। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য (দ্বিতীয়) সম্বন্ধে পাওয়া যাইতেছে ;—

"ধর্ম্মমাণিক্য রাজা ছিল জ্ঞানবান।"

ইহার দ্বারা রাজার শিক্ষা ও জ্ঞান বিষয়ে একটা আভাস পাওয়া যাইতেছে। এই সময় মুসলমানগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হওয়ায়, রাজপরিবার মধ্যে বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের সহিত পারস্য ভাষার চর্চ্চাও চলিতেছিল। মহারাজ মুকুন্দমাণিক্যের পুত্র ভদ্রমণির শিক্ষা সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে ;—

"জয়মণির মৃত্যু হৈল অতি শিশুকাল।
ভদ্রমণি কালপ্রাপ্ত তার পরে হৈল ॥
পার্শি শাস্ত্রেতে ভাল বিদ্যা ছিল জ্ঞান।
যেমত রাজার পুত্র তেমত বিদ্বান ॥"

মুকুন্দমাণিক্য খণ্ড, —৩২ পৃষ্ঠা।

মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্যও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে বিদ্যাবলে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এমনকি, তিনি নবাবের ভাষায় ভুল দর্শাইয়া তাঁহাকে লজ্জিত করিতেও ছাড়েন নাই, এবং পারস্য ভাষায় ধর্ম্ম-গীতি গাহিয়া অনেক সময় তিনি নবাবকে বিমোহিত করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে, —

"ইন্দ্রমাণিক্য রাজা ছিল জিদ্ধবন্ত।
যেই সেই কর্ম্মেতে যে অসহ্য অত্যন্ত ॥

পারশি শাস্ত্রেতে বিদ্যা আছিল বহুল।
তান ভাষা শুনি মগল হইল ব্যাকুল ॥
কি বলিতে কিবা আইসে পারশি ভাষায়।
অশুদ্ধ হইলে তাকে দোষয়ে রাজায় ॥
মুরছিদিয়া গীত রাজা সুস্বরে বলিত।
ভাবেতে আবেশ মঙ্গল রোদন করিত ॥"

জয়মাণিক্য খণ্ড, — ৪১-৪২ পৃষ্ঠা।

এই সকল উক্তি দ্বারা জানা যায়, এই সময় রাজপরিবারের মধ্যে শিক্ষানুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পূর্ব্বে রাজমালার যে-সকল বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্দারা পারস্য ভাষা চর্চ্চার পরিচয় পাওয়া যাইবে। বঙ্গভাষা ত্রিপুরার রাজভাষা, সুতরাং তাহা অবশ্য শিক্ষণীয় ছিল, এতদ্ব্যতীয় শাস্ত্র আলোচনার নিমিত্ত সেকালে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষারও প্রয়োজন ঘটিত। সুতরাং রাজপরিবারের মধ্যে বঙ্গভাষা শিক্ষার রেওয়াজ ছিল, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে ; এই পরিবার চিরদিনই ধর্ম্মপ্রবণ, শাস্ত্রচর্চ্চার উদ্দেশ্যে সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিতেন, এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত হইবে না।

সাহিত্য সেবা

তিপুরেশ্বরগণ তথাকথিত ত্রিপুর রাজ্য চরিদিনই বঙ্গভাষার পক্ষপাতী এবং পৃষ্ঠপোষক। সে কালের দীনা-ক্ষীণা বঙ্গভাষাকে রাজভাষার আসন প্রদান করিয়া তাঁহারা চিরদিনই গৌরব অনুভব করিয়া আসিতেছেন। এই ভাষার পুষ্টিবিধান কল্পেও তাঁহারা অনেক কার্য্য করিয়াছেন।

বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিবিধান।

রাজমালা চতুর্থ লহরের অন্তর্ভুক্ত রাজন্যবর্গের মধ্যেও সাহিত্যসেবা ব্রতে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য ও মহারাজ রামদেবমাণিক্যের আদেশানুসারে রাজমালা তৃতীয় লহর রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কত মূল্যবান, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। গোবিন্দমাণিক্যের অনুজ্ঞায়, বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত বৃহন্নারদীয় পুরাণের নাম এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; উক্ত গ্রন্থের স্থূল বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের অনুজ্ঞায় যে উক্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, গ্রন্থের প্রারম্ভভাগেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বিশদ বিবরণের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল ;—

'চন্দ্রবংশ অবতংস ত্রিপুর ভূপতি।
বিষ্ণুপরায়ণ ধর্ম্মশীল সাধুমতি ॥

গোবিন্দমাণিক্য দেব ধর্ম্ম অবতার।
ধর্ম্মেতে পালিলা রাজ্য বিদিত সংসার ॥
* * * *
* * * *
কহিলেন মহারাজ শুন বিপ্রগণ।
অকালে মরয়ে প্রজা পাপের কারণ ॥
না করে বিষ্ণুর পূজা তুলসী পূজন।
না করে অতিথি সেবা ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
না করে গুরুর পূজা সাধু সমাগম।
তীর্থ সেবা নাহি করে ধর্ম্মে বাসে শ্রম ॥
পুরাণের অর্থ গুরু বুঝিতে সংশয়।
এহাতে উপায় এক মোর মনে লয় ॥
বৃহন্নারদীয় নাম পুরাণ বিশেষ।
এহাতে এসব কথা কহিছে বিশেষ ॥
শুন সব বিপ্রগণ শ্লোক অনুসারে।
ভাষা পদবন্দ কর লোক বুঝিবারে ॥
* * * *
অকালে বুদ্ধি মেধাহীন প্রজা পাপাচারী।
অকালে মরয়ে সব ধর্ম্ম পরিহরি ॥
শুনিয়া পুরাণ কথা হৈব সাধু অতি।
লোক উপকার হেতু করি যে প্রণতি ॥
এমত আদেশ যদি করিল নৃপতি।
সাধুবাদে বিপ্র সবে দিলা অনুমতি ॥
সুষম বিষম যত পুরাণের সার।
আরম্ভিলা ভাষারূপে করিতে প্রচার ॥”

উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে জানা যাইবে, প্রজাবর্গের হিতকামনায়ই মহারাজ এই কার্যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। কেবল গ্রন্থ রচনা করাইয়াই তিনি নিরস্ত রহেন নাই, তাহা সাধারণ্যে প্রচারের পক্ষেও যত্নবান ছিলেন। সেকালে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল না, সুতরাং হস্তলিখিত পুথিই আদর পাইত। তাই, —

“পাঁচালী প্রবন্ধ করি পুস্তক রচিল।
সর্ব্ব লোকে লেখাইতে তাকে আজ্ঞা দিল
এই পাঁচালী পুথি পড়ে যেইজন।
পুরাণের ফল সে যে পায় ততক্ষণ
এতেক জানিয়া প্রজা প্রধান প্রধান।
জনে জনে লিখাইল পুথি একখান”

নৃপতির এবম্বিধ প্রযত্নে, অনেকের গৃহেই এই গ্রন্থের প্রতিলিপি রক্ষিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইল, একমাত্র উজীর-বাড়ী

ব্যতীত কোনো গৃহেই এই গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। বিধিবিড়ম্বনায় উক্ত গ্রন্থখানাও গৃহদাহে বিনষ্ট হইয়াছে। সাহিত্যানুরাগী স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য বাহাদুরের অনুজ্ঞায় পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উজীর-বাড়ীতে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিখানি মুদ্রিত হইয়াছিল, ইহা অতি ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে ; নতুবা উজীর-বাড়ীর পুথি বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই গ্রন্থের অস্তিত্ব বিলোপ হইত।

এই গ্রন্থের রচয়িতা কে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। গ্রন্থের শেষভাগে একস্থানে লিখিত আছে,—"দেবাই পণ্ডিতে কহে।"

এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ মনে করেন, ইহা দেবাই পণ্ডিতের রচিত। প্রাচীন কালে অনেক লেখক হ্রস্ব-'ই' অক্ষরটীকে 'র্হ'-এর ন্যায় লিপি করিতেন, এজন্যই পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান করা হইয়াছে। আমরাও ইতিপূর্ব্বে এই গ্রন্থকে 'দেবাই পণ্ডিতের বৃহন্নারদীয় পুরাণ" নামে অভিহিত করিয়াছি, কিন্তু গ্রন্থের ভণিতা আলোচনা করিলে এই অনুমান বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। ভণিতায় লিখিত আছে,—

"শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য নরেশ্বরে।
নারদীয় অর্থ সবলোকে বুঝিবারে ॥
পাঁচালী করাইল রাজা অনুমতি দিয়া।
পণ্ডিত সকলে কৈল পুরাণ দেখিয়া ॥

'পণ্ডিত সকলে কৈল' এই উক্তিদ্বারা বুঝা যাইতেছে, গ্রন্থখানা একাধিক পণ্ডিতের সমবেত চেষ্টায় রচিত হইয়াছে। গ্রন্থভাগে সন্নিবেশিত 'পাইমু' 'হৈয়া' 'করিমু' 'হইমু' 'অপায়' প্রভৃতি শব্দ আলোচনা করিলে বুঝা যায়, রচয়িতাগণ পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছিলেন। আর একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে 'আহ্মি' 'কোহ্ন' 'শুতিয়া' ইত্যাদি শব্দ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা জেলার প্রাচীন কবিগণের মধ্যে অনেকের লেখায়ই 'তুমি' স্থলে 'তুহ্মি' 'আমি' স্থলে 'আহ্মি' 'কোন' স্থলে 'কোহ্ন' 'শুইয়া' স্থলে শুতিয়া' বা 'হুতিয়া' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার সর্ব্বত্র এবং ত্রিপুরা জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের কথিত ভাষায়ও এই প্রকার অনেক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং এই গ্রন্থের কবিগণ উপরিউক্ত কোনো জেলার অধিবাসী ছিলেন, এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। সেকালে রাজদরবারে ত্রিপুরাবাসী পণ্ডিতগণেরই অধিক আদর ছিল, সুতরাং ইঁহারা ত্রিপুরাবাসী হওয়াও অসম্ভব নহে। এই পণ্ডিতমণ্ডলীর নাম ও পরিচয় সংগ্রহ করা বর্ত্তমান কালে দুঃসাধ্য হইয়াছে।

এই গ্রন্থ রচনার সময় নির্ণায়ক বাক্য গ্রন্থভাগে সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, ইহার প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের সুবিধা ঘটিয়াছে। গ্রন্থের প্রথম ভাগে লিখিত আছে,—

"এক নব বাণ চন্দ্র শাক পরিমাণে।
কার্ত্তিক মাসের পঞ্চ দিন অবসানে
সেই দিনে সভা মধ্যে বসে মহারাজে।
করিলা ধর্ম্মের চিন্তা ধর্ম্মের সমাজে ॥"

উদ্ধৃত কবিতায়— (১), নব—(৯), বাণ—(৫), চন্দ্র—(১) লিখিত আছে। অঙ্কের বামাগতি, এই নিয়মে দেখা যাইতেছে, ১৫৯১ শকের কার্ত্তিক মাসের ৫ই তারিখ রাত্রিকালের দরবারে গ্রন্থ রচনার আদেশ হইয়াছিল। সুতরাং ইহা আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। ইহা মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের দ্বিতীয় বারের রাজত্বকালের গ্রন্থ। এই সময় ধর্ম্মগ্রন্থসমূহের অনুবাদ রচনার প্রবল স্রোতে সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিত হইতেছিল।

এই অনুবাদ অতি সুশৃঙ্খলভাবে দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। এবং ইহার সমগ্র ভাগের ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি সরস। স্থানে স্থানে অনুবাদকের ভাষায় মুগ্ধ হইতে হয়। অনেক কথা 'মটো'রূপে ব্যবহৃত হইবার যোগ্য। দুই একটী পদ এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে।

(১) "কর্ম্মফল দাতা এই ভারত ভুবন।
তাতে থাকি পাপ করে অতি মূর্খজন ॥
কামধেনু ছাড়ি সে যে মূর্খ দুরাচার।
অর্কক্ষীর চেষ্টা করে না জানিয়া সার ॥"

(২) "প্রতিদিন ধর্ম্ম না করয়ে যেই নর।
ব্যর্থ, দিন যায় না পূজয়ে গদাধর ॥
শ্বাসয়ে যে জীবহীন কামারের ভাতি।
তেমন জীবনে জীয়ে সেই মুঢ় মতি ॥"

(৩) "সূর্য্য রশ্মি দিনে করে অন্ধকার নাশ।
গূঢ় অন্ধকার নারে করিতে প্রকাশ ॥
সাধুজন শুদ্ধ বাক্যে রশ্মি পরকাশ।
অন্তরের অন্ধকার সকল বিনাশে ॥"

সমগ্র গ্রন্থই এবম্বিধ মূল্যবান বাক্যে পরিপূর্ণ। অল্প কথায় এই গ্রন্থ পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করা নিতান্তই পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু এস্থলে এতদতিরিক্ত আলোচনা করা নিতান্তই অসম্ভব। এই গ্রন্থদ্বারা মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের যশ ও কীর্ত্তি সুরক্ষিত হইয়াছে।

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য (২য়) বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারতের পদ্যানুবাদ করাইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, সেই গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। সেকালে

মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন না থাকায়, অনেক মূল্যবান গ্রন্থই উক্ত মহাভারতের অবস্থা লাভ করিয়াছে। এই কারণে ভবিষ্যৎ কালের যে গুরুতর ক্ষতি ঘটিয়াছে, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা অসাধ্য।

মহারাজ ছত্রমাণিক্যের প্রপৌত্র জগৎমাণিক্য পদ্মপুরাণের অন্তর্গত 'ক্রিয়াযোগসার' অংশের পদ্যানুবাদ করাইয়াছিলেন। ইহাতে সৃষ্টি প্রকরণ, বৈষ্ণব মাহাত্মা, গঙ্গা মহাত্ম্য, প্রয়োগ মাহাত্ম্য, সাগর সঙ্গম মাহাত্ম্য, বিষ্ণুপূজা মাহাত্ম্য, হরিপূজা বিধি, বিষ্ণু মাহাত্ম্য, পুরুষোত্তমক্ষেত্র মহাত্ম্য, দান মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য, একাদশী মাহাত্ম্য, তুলসী মাহাত্ম্য, অতিথি পূজার ফল ইত্যাদি অনেক মূল্যবান ধর্ম্মোপদেশ আছে। পরিশেষে যুগলক্ষণ বর্ণনদ্বারা গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ইহা পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থের সূচনায় দেবদেবীর বন্দনার পর লিখিত হইয়াছে ;—

"চন্দ্রবংশ অবতংস ত্রিপুর নৃপতি।
ছত্রমাণিক্য দেব সংসারেতে খ্যাতি ॥
তাহান তনয় হৈল মহাভাগ্যবন্ত।
শ্রীযুত উৎসব রায় রাজা মতিমন্ত ॥
* * * *
তাহান তনয় হৈল হরিপরায়ন।
শ্রীলশ্রীযুত রাজা জয়নারায়ণ ॥
* * * *
তাহান তনয় হৈল হরিপরায়ণ।
শ্রীশ্রীযুত জগৎমাণিক্য পুণ্যবান ॥
* * * *
বলিলেন মহারাজ শুন বিপ্রগণ।
অল্পকালে প্রজা মরে পাপের কারণ ॥
না করে বিষ্ণুর পূজা না সেবে তুলসী।
না পূজে অতিথি বিপ্র বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ॥ ইত্যাদি।
* * * *
না বুঝে পুরাণ অর্থ গীতা ভাগবত।
যতেক সকল শ্লোক পাপ উপগত ॥
পুরাণের অর্থকূট বুঝিতে সংশয়।
ইহাও কারণ এক মোর মনে লয় ॥
ক্রিয়া যোগসার নাম উত্তম পুরাণে।
নানা ইতিহাস আছে ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে ॥
সেই পুরাণের শ্লোক অর্থ অনুসারে।
পদবন্ধ করি দেহ লোকে বুঝিবারে ॥
* * * *
হস্ত জোড় করি বলে ব্রাহ্মণ মুকুন্দ।
আজ্ঞা পাইলে আমি এথা করি পদবন্ধ ॥

তুষ্ট হইয়া দিল রাজা সপুষ্প চন্দন।
বস্ত্র আভরণে বিপ্রে করিল অর্চ্চন ॥
নৃপতির আদেশ যে আরোপিয়া মাথে।
আরম্ভিল পদ বন্ধ নৃপতি সাক্ষাতে ॥
বিষম সুষম যত ক্রিয়া যোগসার।
শ্রীবিষ্ণু বন্দিয়া রচে উত্তম পয়ার ॥"

গ্রন্থ রচয়িতার নাম মুকুন্দ, এই মাত্র পাওয়া যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত রচয়িতার পূর্ণ নাম বা পরিচয়সূচক কোনো বিবরণ গ্রন্থভাগে পাওয়া গেল না। বর্ত্তমান কালে অনুসন্ধান দ্বারাও তাহা সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়াছে। এই কারণে আমরা নিতান্তই দুঃখিত আছি। মহারাজ জগৎমাণিক্যের পিতামহ উৎসব রায়ের সময় হইতে তাঁহারা ঢাকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং তদঞ্চলের পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত এই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। এই কারণে রচয়িতা ঢাকা জেলার অধিবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে বিরচিত অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থের ভাষায় ত্রিপুরা অঞ্চলের প্রচলিত কোনো শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না।

এই গ্রন্থ রচনার সময় নির্ণায়ক বিবরণ গ্রন্থভাগেই পাওয়া যাইতেছে। ইহার সূচনায় লিখিত আছে ;—

"বসুবেদ রস অর্ক শক পরিমাণ।
বৈশাখ মাসের দশ দিন অবসান ॥
সোমবারে অমাবস্যা পূণ্য তিথি জানি।
করিল ধর্ম্মের চিন্তা বিপ্রগণে আনি ॥"

বসু—(৮), বেদ—(৪), রস—(৬), অর্ক—(১)। অঙ্কের বামাগতি হিসাবে এই গ্রন্থ ১৬৪৮ শকে রচিত হওয়া জানা যাইতেছে ; সুতরাং ইহা কিঞ্চিদধিক দুই শতাব্দীর প্রাচীন গ্রন্থ।

পদ্মপুরাণের ন্যায় মূল্যবান ও সুবিখ্যাত গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করা অনাবশ্যক। তদন্তর্গত ক্রিয়া যোগসার কত সারগর্ব্ভ, আলোচ্য গ্রন্থ একবার মাত্র পাঠ করিলে তাহা সহজে বুঝা যাইতে পারে। এস্থলে তদ্বিষয়ের সামান্য আভাস প্রদান করা যাইতেছে।

(১) ক্ষত্রবীর সুবাহুর পত্নী চন্দ্রকলার প্রতি, তালধ্বজ পুরীর রাজপুত্র মাধব, বলপ্রয়োগে উদ্যত হইলে চন্দ্রকলা বলিয়াছেন ;—

"পরস্ত্রী হরিতে চাও মনে নাহি ভয়।
হরিলে নরক ভোগ জানিবে নিশ্চয় ॥"

লোভ হতে কাম জন্মে কাম হতে পাপ।
পাপ হতে মৃত্যু হয় আর যে সন্তাপ ॥
* * * *
ভুঞ্জয়ে বিবেকী জনে পরম সম্পদ।
অবিবেকী হৈলে ভুঞ্জে পরম আপদ ॥
আপনি নৃপতি দেখি নাহি পাপ ভয়।
মস্তক উপরে গর্জ্জে শমন দুর্জ্জয় ॥
তাহারে না দেখ তুমি এ দুই নয়নে।
পরলোক ভয় তব না হইল মনে ॥ ইত্যাদি।

(২) চন্দ্রবংশীয় মনোভদ্র রাজা বৃদ্ধাবস্থায় মন্ত্রীবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"পালিনু সকল পৃথ্বী সপ্তদীপ সমে।
সংহারিনু বৈরীপক্ষ আপন বিক্রমে ॥
আপনার গোত্র যত করিনু পালন।
বহু দান করি তুষ্ট করিনু ব্রাহ্মণ ॥
তুষিলাম সর্ব্ব দেব করি যজ্ঞ দান।
সর্ব্ব লোক তুষ্ট হৈয়া করিল বাখান ॥
এখানে আমাতে হৈল জরা পরবেশ।
না হই রাজ্যে যোগ্য দুর্ব্বল বিশেষ ॥
* * * *
কৃপণ দুর্ব্বল হৈলে শত্রু পরকাশ।
মুর্খ মন্ত্রী পরামর্শে নৃপতি বিনাশ ॥
বৃদ্ধ কাল হৈল আর রাজ্যে কোন কার্য্য।
দুই পুত্র রাজা করি দিব সর্ব্ব রাজ্য ॥"

এই প্রকারের ভাব অনেক আছে। কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভাষার ন্যায় এই পুথির ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল ; অধিক আদর্শ প্রদানের সুবিধা ঘটিল না। গ্রন্থের প্রথমাংশে, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের সময়ে রচিত বৃহন্নারদীয় পুরাণের অনেকটা অনুকরণ করা হইয়াছে।

গ্রন্থভাগে সন্নিবেশিত বাক্য আলোচনায় জানা যায়, রাজাজ্ঞানুসারে এই পুথির নকল প্রতি গৃহে রাখা হইয়াছিল, দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান কালে ত্রিপুর রাজ্যে এই পুথি পাওয়া দুরের কথা, ইহার নাম পর্য্যন্ত কাহারও জানা নাই। ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত জাজিসার নিবাসী, মাননীয় শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু চক্রবর্ত্তী বি. এ. মহাশয় ইহার একখানা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার এই সহৃদয়তা দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছি। আরও কত প্রাচীন গ্রন্থ এই ভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা ভগবান জানেন।

ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান

রাজামালার প্রথম তিন লহর আলোচনায় জানা যাইবে, ত্রিপুরেশ্বরগণ পূর্ব্বে শৈব ও শাক্ত ছিলেন, ক্রমশঃ মত পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, পরিশেষে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। এই পরিবার কোন সময় হইতে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা অতঃপর বলা হইবে। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পরেও ইঁহাদের মধ্যে আপন আপন বিশ্বাস ও প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া, কোনো কোনো রাজা শৈব, কেহ শাক্ত এবং কেহ বা বৈষ্ণব মতাবলম্বী হইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজগণের মধ্যে যিনি যে মত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতেই নিবন্ধ থাকিতেন না। ধর্ম্মমত সম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষ উদার ছিলেন। বৈষ্ণব মতের পক্ষপাতী রাজন্যবর্গও চিরদিনই শিব ও শক্তি প্রভৃতি সকল দেবতার প্রতিই শ্রদ্ধাবান ছিলেন। এই উদারতার দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম লহরে, রাজপরিবারের কুলদেবতা— চতুর্দ্দশ দেবতার নামোল্লেখ করা হইয়াছিল, এস্থলেও তাহারই পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে। শিব, দুর্গা, হরি, লক্ষ্মী, বাগেদ্বী, কার্ত্তিকেয়, গণপতি, ব্রহ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, প্রদ্যুম্ন, ও হিমাদ্রি, ইহার চতুর্দ্দশ দেবতার সমষ্টি।* ইহার মধ্যে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতাই আছেন। যে বংশের কুলদেবতার অবস্থা এবম্বিধ, সেই বংশ ধর্ম্মমত বিষয়ে কত উদার, ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। কৈলাসহর বিভাগে অবস্থিত ঊনকোটী তীর্থ ভ্রমণকারিগণ এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ; উক্ত তীর্থে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী সকল সম্প্রদায়ের উপাস্য দেব-দেবী মূর্ত্তির সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিপুরেশ্বরগণই ইহার অধিকাংশ বিগ্রহের স্থাপয়িতা। উদয়পুর ও অমরপুরের মধ্যবর্তী গোমতী নদীর তীরবর্ত্তী দেবতামুড়া নামক পর্ব্বতের প্রস্তরময় গাত্রে উৎকীর্ণ দেব-দেবীর মূর্ত্তিসমূহ বহু প্রাচীন। এখানেও শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের উপাস্য দেব-দেবীর মূর্ত্তিই পাওয়া যায় ; ইহাও ত্রিপুরেশ্বরগণের কীর্ত্তি। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে তাঁহাদের ধর্ম্মমত কত উদার ছিল, তদ্বিষয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ধর্ম্মবিষয়ক উদার মত

রাজমালার চতুর্থ লহর পর্য্যালোচনা করিলেও পূর্ব্ববৎ অবস্থা প্রতীয়মান হইবে। এই লহরের অন্তর্নিবিষ্ট রাজন্যবর্গ কেহ কেহ বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন ; কিন্তু কোনো কোনো স্থলে তাহার ব্যত্যয় ঘটিবার প্রমাণও পাওয়া যায়। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য কোন মত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্ধারণ করিবার সুবিধা নাই। তাঁহার শাসনকালে প্রচারিত

---

* হরোমা হরি মা বাণী কুমারো গণপা বিধিঃ
ক্ষ্মাব্ধির্গঙ্গা শিখী কাম হিমাদ্রিশ্চ চতুর্দ্দশঃ ॥”

মুদ্রায় শিবলিঙ্গ উৎকীর্ণ হইবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। রাজমালায় গোবিন্দমাণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে,—

"রাজার মহর শিবলিঙ্গ সংস্থান।
অন্য পৃষ্ঠে রাজারাণী নামের আখ্যান ॥
গোবিন্দমাণিক্য খণ্ড, — ৬ পৃষ্ঠা।

এই বাক্য দ্বারা মনে হয়, মহারাজ গোবিন্দ শৈব মতাবলম্বী ছিলেন। পক্ষান্তরে, তিনি দেবতা সমক্ষে নরবলি ও পশুবলির প্রথা বন্ধ করিয়া প্রজাবৃন্দের অপ্রিয় হইয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ প্রবাদ। এই কার্য্য দ্বারা যে ঘোর বৈষ্ণবের মত প্রকাশ পাইতেছে, তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। আবার, দেবতা প্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, তিনি সীতাকুণ্ড তীর্থে পর্ব্বতের সানুদেশে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ 'চন্দ্রশেখর' শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, রাজধানী উদয়পুরে স্বীয় অনুজ জগন্নাথ ঠাকুরের সহযোগে এক অপূর্ব্ব প্রস্তরময় মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দারু-ব্রহ্ম মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সকল কার্য্য দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে স্থির মীমাংসায় উপনীত হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহারাজের অনুজ্ঞায় রচিত বৃহন্নারদীয় পুরাণে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা হইয়াছে।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গের মধ্যে ধারবাহিকরূপে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার প্রমাণ নাই। রাজগণের বিশ্বাস ও প্রবৃত্তি অনুসারে কেহ শৈব, কেহ শাক্ত এবং কেহবা বৈষ্ণব মতাবলম্বী হইয়াছেন। গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র মহারাজ রামদেবমাণিক্যের শাসনকালে প্রভু নিত্যানন্দের অধস্তন পঞ্চম স্থানীয় রসিকানন্দ গোস্বামী সন্ন্যাসী বেশে তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি অনিমা-লঘিমাদি ঐশ্বর্য্য সমন্বিত সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। প্রভু রসিকানন্দ বহু তীর্থ ভ্রমণের পর, ত্রিপুরাসুন্দরী পীঠ দেবীর দর্শন মানসে উদয়পুরে আগমন করেন। তথায় রাজভবনের অনতিদূরবর্ত্তী একটা বৃক্ষমূলে তিনি আস্তানা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইবার পর, সন্ন্যাসীর অলৌকিক বিভূতি দর্শনে, মহারাজ রামদেবমাণিক্য তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ইনিই ত্রিপুর রাজপরিবারের নিত্যানন্দ বংশীয় প্রথম গুরু। কিয়ৎকাল উদয়পুরে অবস্থানের পর, প্রভুপাদ রসিকানন্দ স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

নিত্যানন্দ বংশীয় গুরু নির্ব্বাচন

অতঃপর, রসিকানন্দের পুত্র, প্রভু বৃন্দাবনচন্দ্র গোস্বামী কর্ত্তৃক, রামদেবমাণিক্যের পুত্র মহারাজ মুকুন্দমাণিক্য কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মহারাজ মুকুন্দ একনিষ্ঠ গুরুভক্ত ছিলেন। তিনি অষ্টধাতু দ্বারা যুগলমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া সেই বিগ্রহ গুরুর নামানুসারে 'বৃন্দাবনচন্দ্র' নামকরণে প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত বিগ্রহ, ত্রিপুর রাজপরিবারের কুলদেবতা রূপে অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন।

প্রভু বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রথম পুত্র গুরুপ্রসাদ গোস্বামী মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের গুরু ছিলেন। এবং তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র প্রভুপাদ আনন্দচন্দ্র গোস্বামী, কৃষ্ণমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিমণি যুবরাজকে দীক্ষা প্রদান করেন।

এস্থলে একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। নিত্যানন্দ-সন্তানগণ ত্রিপুরায় রাজগুরুর আসন লাভের পর অবধি ত্রিপুরেশ্বর ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের শাসন কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজগুরুগণ স্বদেশে—বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পুরুনিয়া গ্রামে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সময় সময় ত্রিপুরায় আসিয়া রাজা ও রাজ পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে দীক্ষাদান করিয়া যাইতেন। সে কালে নৌকা-পথ ব্যতীত গমনাগমনের অন্য সুবিধা ছিল না, সুতরাং পথ অতিবাহনে দীর্ঘ সময় লাগিত। বিশেষতঃ জলদস্যুর ভয়ে কেহই সহজে দূরদেশে গমন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এই সমস্ত কারণে গোস্বামী প্রভুগণ ত্রিপুরা হইতে একবার চলিয়া গেলে, দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পুনরাগমন ঘটিয়া উঠিত না। ইহার ফলে, নিত্যানন্দ বংশীয় গুরু লাভের পরেও ত্রিপুরেশ্বরগণের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণবমত পরিত্যাগ করিয়া অন্যমত গ্রহণ করিবার নিদর্শন পাওয়া যায়। রামদেবমাণিক্যের অন্যতম পুত্র (মুকুন্দমাণিক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা) ধর্ম্মমাণিক্য (২য়) সম্ভবতঃ কুলগুরুর অভাবেই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে ;—

"শক্তি মন্ত্র উপাসনা ছিল মহারাজ।
শক্তিরূপে মুক্তিদাতা সুতা গিরিরাজ ॥"

ধর্ম্মমাণিক্য খণ্ড—২৬ পৃষ্ঠা।

অন্যত্র পাওয়া যাইতেছে, —

"কাল বশ হৈয়া রাজা কণ্ঠে দুর্গা বাণী।
প্রাণ ত্যাগ করি গেল স্বর্গেতে তখনি ॥"

ধর্ম্মমাণিক্য খণ্ড—৩০ পৃষ্ঠা।

ইহার পরে পাওয়া যায়,—

"ধর্ম্মমাণিক্য নৃপতি ধর্ম্মেতে পালিল ক্ষিতি,
রাজা গেল বিশ্বেশ্বরের স্থান।
শক্তিমন্ত্রে উপাসনা, রাজা করে প্রার্থনা,
শক্তি দেবী মুক্তির কারণ ॥"

ধর্ম্মমাণিক্য খণ্ড,—৩১ পৃষ্ঠা।

এই সকল উক্তি দ্বারা মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের শাক্তমত অবলম্বনের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজা মুকুন্দমাণিক্য নিত্যানন্দ সন্তানের শিষ্যত্ব লাভের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের বিবরণও পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে ; ইনিই রাজামালা চতুর্থ লহরের অন্তর্গত শেষ রাজা। অন্যান্য রাজগণের ধর্ম্মমত সম্বন্ধীয় বিবরণ পরবর্তী

লহরসমূহে ক্রমশঃ পাওয়া যাইবে। ত্রিপুরার রাজগুরু-বংশের এক সংক্ষিপ্ত তালিকা এস্থলে সংযোজিত হইল।

রাজপরিবারের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কিছু বলিবার সুবিধা নাই। স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন,—"রাজধরমাণিক্যের সময়ে নিত্যানন্দ বংশজ গোস্বামিগণ রাজপরিবারে কৃষ্ণমন্ত্রের বীজ বপন করিয়াছেন।" এই উক্তি যে ভ্রান্তিমূলক, পূর্ব্বোক্ত বিবরণ আলোচনা করিলে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ত্রিপুরেশ্বরগণ ধর্ম্ম প্রণোদিত হইয়া যে-সকল জনহিতকর সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, এবং ধর্ম্মের পুষ্টিবিধান কল্পে যে-সকল দেবায়তন গঠন ও দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অতঃপর তাহার স্থূল বিবরণ আলোচনার চেষ্টা করা হইবে।

দেবালয় গঠন ও দেবতা প্রতিষ্ঠা।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের (চন্দ্রনাথ তীর্থে) শীর্ষদেশে এক মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন।* এই বিগ্রহ 'চন্দ্রনাথ শিব' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের নির্ম্মিত শিব মন্দির প্রবল ভূমিকম্পে বিনষ্ট হইবার পর, বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরে গোবিন্দমাণিক্যের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ-বিগ্রহ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছেন। কেহ কেহ বলে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত মন্দিরের

ঁচন্দ্রশেখর শিবের মন্দির।

---

* এতৎ সম্বন্ধে রাজমালায় গোবিন্দমাণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে,—

"চট্টলেতে চন্দ্রশেখর মঠ নিরমিয়া।
দেবার্থেতে মহারাজ জলাশয় দিয়া॥" ইত্যাদি।

শ্রেণীমালা গ্রন্থে গোবিন্দমাণিক্য প্রসঙ্গে পাওয়া যায় ;

"চট্টলেতে চন্দ্রশেখর পর্ব্বত উপরে।
মঠ নির্ম্মাইয়া শিব স্থাপে তদুপরে॥"

রাজাবাবুর বাড়ীতে প্রাপ্ত রাজমালার উক্তি অতিশয় প্রাঞ্জল। উক্ত গ্রন্থে, গোবিন্দমাণিক্য প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে,—

"পাত্রমিত্র পুরোহিত সভাতে বসিয়া।
পুরাণ শ্রবণ করে সন্তোষিত হৈয়া॥
তিন যুগে মহাদেব কাশীতে আছিল।
কলিযুগে চন্দ্রশেখরেতে স্থান কৈল॥
তীর্থরাজ বাড়ব ধর্ম্মের নাহি সীমা।
জল মধ্যে হুতাশন অতুল মহিমা॥
পণ্ডিত সকলে যদি ঐরূপ কহিল।
বাড়ব তীর্থেতে রাজা সসৈন্যে চলিল॥
চন্দ্রশেখরে মঠ করিল রচনা।
তার মধ্যে মহাদেব করিল স্থাপনা॥
পুণ্যাহ তিথিতে মঠ প্রতিষ্ঠা করিল।
ব্রাহ্মণেরে তুষ্ট করি দক্ষিণা যে দিল॥

সহিত মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের স্থাপিত শিবলিঙ্গও বিনষ্ট হইয়াছিল, বর্ত্তমান বিগ্রহ পরবর্ত্তী কালের সংস্থাপিত। বর্ত্তমান লিঙ্গ বিগ্রহের অগ্রভাগের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়াছে। কথিত আছে, জনৈক সন্ন্যাসী নারিকেলোদক দ্বারা বিগ্রহকে স্নান করাইবার অভিপ্রায়ে একটী নারিকেল সঙ্গে আনিয়াছিলেন। নারিকেলটী ভাঙ্গিবার উপযুক্ত বস্তুর অভাবে, সন্ন্যাসী ঠাকুর, শিবের মস্তকে আঘাত করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া লন ; ভক্তের সেই বিকট-ভক্তির ফলে শিবঠাকুরের মস্তক অক্ষুণ্ণ রহিল না, একটী টুকরা খসিয়া পড়িল! আবার কেহ বলেন যাত্রীগণের মধ্যে কোনো ব্যক্তি লোকের ভিড়ের দরুণ বিগ্রহের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া দূর হইতে নারিকেল ছুঁড়িয়া দিয়াছিলেন, সেই নারিকেলের আঘাতে লিঙ্গ-বিগ্রহের এই অবস্থা ঘটিয়াছে। ইহার কোনটি সত্য জানি না। যে কারণেই হউক, দীর্ঘকাল পূর্ব্বে এই বিগ্রহের মস্তক ভগ্ন হইয়াছে, এবং তদবধি 'চন্দ্রনাথ' সেই অবস্থায়ই বিরাজমান আছেন। ইহা বৃহদাকার কৃষ্ণপ্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত, সুগঠিত লিঙ্গ বিগ্রহ।

ঁজগন্নাথ দেবের মন্দির।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের অন্যতর সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি—উদয়পুরস্থিত ঁজগন্নাথ দেবের প্রস্তর- মন্দির। এরূপ সুবৃহৎ এবং সুগঠিত নিরেট প্রস্তরময় মন্দির বঙ্গদেশে দ্বিতীয় একটী নাই। মহারাজ গোবিন্দ কর্ত্তৃক অনুজ জগন্নাথ ঠাকুরের সহযোগে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরটী সাধারণতঃ 'জগন্নাথের দোল' নামে প্রসিদ্ধ। এই মন্দির জগন্নাথ দীঘি বা পুরাতন দীঘি নামক বিস্তীর্ণ সরোবরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত।

মন্দির গাত্রে এক বৃহৎ শিলালিপি সংযোজিত ছিল, তাহাতে এই মন্দিরের মোটামুটি ইতিহাস পাওয়া যায়। উক্ত শিলাখণ্ড মন্দিরের গাত্রচ্যুত হইয়া জঙ্গলাভ্যন্তরে পতিতাবস্থায় ছিল, স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের শাসনকালে, তদীয় প্রধানমন্ত্রী স্বর্গীয় দীনবন্ধু নাজীর মহোদয় তাহা আগরতলায় আনয়ন করেন, তদবধি সেই শিলাখণ্ড রাজপ্রাসাদে রক্ষিত হইতেছে।* শিলালিপির প্রথম দুই পংক্তির অক্ষর বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা উদ্ধারের উপায় নাই। অবশিষ্টাংশ অবিকল রহিয়াছে। মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের সময়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর সমবেত চেষ্টায় ইহার পাঠোদ্ধার হইয়াছিল, স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্যের শাসনকালে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় পুনর্বার ইহার পাঠোদ্ধার করিয়া "শিলালিপি সংগ্রহ" পুস্তিকায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। শিলালিপির পাঠ পর-পৃষ্ঠায় প্রদান করা যাইতেছে।

---

* এই প্রস্তরফলক দীর্ঘে ৩'—১১/২" ইঞ্চি, প্রস্থে ২'—১১/২" ইঞ্চি ও বেধ ৭" ইঞ্চি। এই শিলাগাত্রে ষোলটী পংক্তিতে সমগ্র লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। প্রস্তরের গাত্রজোড়া পংক্তি উৎকীর্ণ হওয়ায়, প্রত্যেক পংক্তিতে শ্লোকের ভগ্নাংশ পতিত হইয়াছে।

বাণী গায়তি ✺ ✺ ✺ ✺
রবো ✺ ✺ ✺ ✺ ✺
সোৎকমনসঃ সেন্দ্রাদি বৃন্দারকাঃ ॥ ১ ॥
শ্রীশ্রীকল্যাণমাণিক্য দেবস্যাদ্ভুত কর্ম্মণঃ।
আসীৎ শ্রীসহরবতী মহিষীন্দুমতী পরা ॥ ২ ॥
সা পুত্রৌ সুষুবে তস্মাদতিতেজোধরাবুভৌ।
শ্রীগোবিন্দজগন্নাথসংজ্ঞকাবমরপ্রভৌ ॥ ৩ ॥
জয়ন্তমিব পৌলোমী পুরুহূতাদনুত্তমাৎ।
দিলীপাদিব রাজেন্দ্রাৎ রঘুরাজং সুদক্ষিণা ॥ ৪ ॥
তয়োর্জ্যায়ান্ সমভবৎ চন্দ্রবংশাবতাংশকঃ।
শ্রীশ্রীগোবিন্দমাণিক্যদেবোরাজাতিসত্তমঃ ॥ ৫ ॥
ততঃ কনীয়ান্ সাধীয়ান্ শ্রীজগন্নাথবীররাট্।
ভ্রাতার্য্যনুমতাকারী যুধিষ্ঠির ইবার্জ্জুনঃ ॥ ৬ ॥
অথ ব্যতীতসময়ে কিয়তি স্বেন কর্ম্মণা।
প্রাপ্তকালা চ মহিষী পুণ্যেভ্যঃ সা দিবং যযৌ ॥ ৭ ॥
শ্রীবিষ্ণবেহনন্তধাম্নে প্রাদাৎ প্রাসাদমুত্তমং।
ততঃ কল্যাণমাণিক্যপিতুরাজ্ঞানুসারতঃ ॥ ৮ ॥
রাজ্ঞ্যাঃ সহরবত্যাস্তু মাতুঃ স্বর্গচয়ায় হি।
শ্রীশ্রীগোবিন্দমাণিক্যদেবোহনুজবরেণ চ ॥ ৯ ॥
শ্রীজগন্নাথবীরেন ভূরিমন্ত্রমহৌজসা।
প্রাদাৎ প্রাসাদমতুলং বিষ্ণোরপি মনোহরং ॥ ১০ ॥
শাকেহ নলাষ্টবাণেন্দৌ প্রাদাৎ প্রসাদমচ্যুতে।
শ্রীশ্রীগোবিন্দমাণিক্যোরাকায়াং মাসি বাহুলে ॥ ১১ ॥
শাকে ১৫৮৩। ত্রিরশীত্যধিক পঞ্চদশ শততম।
শকাব্দিয় কার্ত্তিক ষড়বিংশাংশার্কবাসররাকায়াং ॥ ১২ ॥

অনুবাদ

"বাণী গান করিতেছেন * * * * রব * * * ইন্দ্রাদি দেবগণ উৎকণ্ঠিত চিত্তে আছেন। অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠাতা শ্রীশ্রীকল্যাণমাণিক্য দেবের ইন্দুমতী তুল্যা সহরবতী নামে মহিষী ছিলেন। ইন্দ্রপত্নী শচী যেরূপ জয়ন্তকে প্রসব করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্র দিলীপপত্নী সুদিক্ষণা যেরূপ রঘুকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেইরূপ

কল্যাণ মাণিক্যপত্নী, গোবিন্ত ও জগন্নাথ নামক অতি তেজস্বী দেবতুল্য দুইটী পুত্র প্রসব করেন। তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রকুলভূষণ, সজ্জনাগ্রগণ্য মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য দেব জ্যেষ্ঠ, এবং বীরশ্রেষ্ঠ জগন্নাথ কনিষ্ঠ ছিলেন। জগন্নাথ যুধিষ্ঠির আজ্ঞাবহ অর্জুনের ন্যায়, ভ্রাতার অনুমতি পালনে নিরত ছিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে, সেই রাজমহিষী কালপ্রাপ্ত হইয়া নিজের পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গগমন করিলেন। পরে পিতা কল্যাণমাণিক্যের আজ্ঞানুসারে অনন্তধাম বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে (এই) উত্তম প্রাসাদ দান করেন। শ্রীশ্রীগোবিন্দমাণিক্যদেব বীর, মন্ত্রণানিপুণ ও তেজস্বী অনুজ জগন্নাথদেবের সহিত মাতা সহরবতীর স্বর্গার্থ বিষ্ণুরও মনোহর (এই) অতুল প্রাসাদ দান করেন। শ্রীশ্রীগোবিন্দমাণিক্য ১৫৮৩ শকের কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে প্রাসাদ দান করেন।" শিলালিপি সংগ্রহ—৩১-৩২ পৃষ্ঠা।

এস্থলে একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। রাজমালার সংগ্রাহক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে গোবিন্দমাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছত্রমাণিক্য (নক্ষত্র রায়) ১০৭০ ত্রিপুরাব্দে (১৫৮২ শক) সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।* এবং তিনি ছত্রমাণিক্যের মুদ্রার বিবরণ প্রদান উপলক্ষে উক্ত মুদ্রা ১৫৮২ শকের মুদ্রিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। † প্রকৃতপক্ষে মহারাজ ছত্রমাণিক্যের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার শকাঙ্ক নিতান্ত অস্পষ্ট। টেভার্ণিয়ার স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে ছত্রমাণিক্যের মুদ্রার বিবরণ ও প্রতিকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তিনিও উক্ত মুদ্রার শকাঙ্ক উদ্ধার করিতে পারেন নাই। ‡ পূর্ব্বোক্ত শিলালিপি আলোচনায় জানা যায়, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য ১৫৮৩ শকের কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে ৺জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং ছত্রমাণিক্য কর্ত্তৃক ১৫৮২ শকে রাজ্য অধিকৃত কিম্বা মুদ্রা প্রচারিত হওয়া সম্ভবপর নহে। সমগ্র অবস্থা আলোচনা করিলে বুঝা যায়, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য ১৫৮৩ শকে কিয়ৎকাল রাজত্ব করিবার পর, সেই শকেই ছত্রমাণিক্য সিংহাসন অধিকার করিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন। কৈলাসবাবু এই মুদ্রার পাঠোদ্ধার কালে শকাঙ্ক ১৫৮৩ স্থলে ১৫৮২ লিপি করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত শিলাময় মন্দির বর্ত্তমান জীর্ণ দেহ লইয়াও বিশেষজ্ঞগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। উদীয়মান স্থাপত্যবিদ্ পণ্ডিত শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্থাপত্য বিশারদ মহাশয় উক্ত মন্দির দর্শন করিয়া, বিমুগ্ধ হৃদয়ে আমাদিগকে অনেক কথা বলিয়াছেন, এবং "ভারতীয় স্থাপত্য ও স্বধীন ত্রিপুরা" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"অভিনব ধরণের উক্ত জগন্নাথ দেবের মন্দিরটী যে শুধু স্থাপত্যকাল হিসাবে অতীব মূল্যবান তাহা নহে, উহা হইতে ত্রিপুরার ধর্ম্মযুগের ও সভ্যতার একটী বিশিষ্ট ধারা আবিষ্কার করা বিশেষ

---

* কৈলাসবাবুর রাজমালা—২য় ভাগ, ৭ম অঃ, ৮৫ পৃষ্ঠা।

† ঐ ঐ —১ম ভাগ, ৪র্থ অঃ, ৬৯ পৃষ্ঠা।

‡ Taverniers Travels, in India by J. Phillips — Book V, Part II Page 8.

কষ্টসাধ্য হইবে না বলিয়া লেখকের বিশ্বাস। অবিকল সারনাথ স্তূপের মতো উক্ত মন্দিরের গঠন ; অধিকন্তু উহা পাষাণে নির্ম্মিত। পূর্ব্বে তৎসংলগ্ন নাটমন্দির ছিল। এরূপ 'প্লানের' মন্দির আমি অন্যত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

রবি—৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

শ্রীশবাবুর পূর্ব্বে, ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে গবর্ণমেন্টের Archaeological survey বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, শ্রীযুক্ত কে. এন্, দিক্ষিত মহাশয় উদয়পুরের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ পরিদর্শন করিয়া, উক্ত জগন্নাথের মন্দির সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"This temple is the most important of all the manuments at Udaypur, but has unfortunately fallen into such a state of neglect that a considerable outlay is necessary to preserve it in proper order. It is built in a style characteristic of the later Mohammadan period. It is square in plan with a passage on the east, facing the entrance and recesses in the walls on the other three sides. The top is crowned by a dome with a vaulted roof in pure Mohammadan fashion. The stone used in the building is a kind of ash coloured slate stone. Some rather big blocks of stone are used in the construction of the temple. There has been no attempt at decoration. There are no images on the building. though a few niches are to be found on the exterior walls. The temple was built in 1661. A. D. in the reign of Govinda Manikya, and was originally dedicated to Vishnu.

Conservation :-After clearing away the roots of trees and jungle from the top and on all four sides up to a distance of 25 feet, a fence (permanent wire fence or temporary bamboo fence) should be erected at a distance of 15 to 20 feet from the building. In places. roots have penetrated into the masonry separating the walls from the corner pilasters. They should be throughly extricated and the damage be made good by grouting liquid cement in the cracks and rebuilding displaced masonry with old stones in lime. The tree at the south west corner should be cut down and its roots removed. In the centre of the south wall there is a big crack which was most probably caused by an earthquake. The crack should be filled with cement grouting, the interior of the gap, if too wide. being first filled with clean stone concrete. On the north. except for the presence of small cracks and the cleavage of minarets from the main body. the wall is in fair preservation. The facing of the lower portion has in parts disintegrated through action of the weather. The worst damage. however. has occured in the south-west corner, but unfortunately thick jungle has grown just where there appear to be gaping hollows on the top of the wall masonry. rendering it difficult to see what repairs are needed. Existing gaping hollows should be throughly filled with cement concrete and facing stone work rebuilt in exactly the same type of masonry as the existing wall masonry. The roof of the dome is also thickly overgrown. The water proofing of the dome is a factor of such great importance for the stability of the building that it must be taken up as early as possible after preliminery jungle clerance. The whole roof should be terraced with 4" concrete and plastered with cement coloured with suitable ingredients, so as to match the colour of the stone used in the building. When the repairs as sketched above are completed the surrounding area should be properly sloped, so as to drain off rain-water."

এই মন্দির মোসলেম আমলের শেষ যুগের স্থাপত্য প্রণালীতে গঠিত বলিয়া দিক্ষিত মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এবং মন্দিরটীর দুর্দ্দশা দর্শনে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থা হইতে কি উপায়ে মন্দিরটীকে উদ্ধার করা যাইতে পারে তাহাও বলিয়াছেন। অনেকে প্রয়োজনীয় কথা আছে বলিয়াই মন্তব্যটী এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

এই সকল বিশেষজ্ঞের অভিমত আলোচনা করিলেই মন্দিরটীর গৌরব অনুভব করা যাইতে পারে। এই মন্দিরের গাঁথুনীতে পাঁচ হস্ত পরিমিত দীর্ঘ ও অর্দ্ধ হস্তেরও অধিক পুরু প্রস্তরখণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ প্রস্তর কোথা হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে, এবং তৎকালে কি উপায়ে ইহা আনীত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ইতিহাস—বিশেষতঃ মন্দির গাত্রস্থ শিলালিপি আলোচনা করিলে জানা যায়, মন্দিরটী কিঞ্চিন্যূন তিনশত বৎসরের প্রাচীন কীর্ত্তি। ইহার উপরে বৃহদাকারের বৃক্ষসমূহ জন্মিয়াছিল। এখন সেই সকল-বৃক্ষ কর্ত্তন করা হইয়াছে, কিন্তু মন্দিরের যে ক্ষতি ঘটিয়াছে, তাহা সংশোধনের কোনোরূপ চেষ্টা করা হয় না। এই কারণে মন্দিরের পেছন দিকের (পশ্চিম দিকের) এবং আরও কোনো কোনো অংশের দেওয়াল ধ্বসিয়া যাইতেছে।

মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রস্তর নির্ম্মিত দেওয়াল ছিল, এখনও তাহার চিহ্ন বিদ্যামান রহিয়াছে। মন্দিরটী পূর্ব্বদ্বারী, ইহার সম্মুখে নাটমন্দির এবং দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তিবিশিষ্ট, কারুকার্য্যখচিত 'রেলিং' ছিল। তাহার খণ্ড খণ্ড অংশগুলি নানা স্থানে নীত হইয়াছে। এই রেলিং-এর একখণ্ড আগরতলায় শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় কর্ণেন মহিমচন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে রক্ষিত হইতেছে।

জগন্নাথ দীঘির উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটী নাতিবৃহৎ মন্দির আছে। তাহা কারুকার্য্যখচিত ইষ্টক দ্বারা অলঙ্কৃত। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা কালে এই মন্দিরটী 'গুঞ্জিকা মন্দির' রূপে ব্যবহৃত হইত, জনপ্রবাদে এরূপ জানা যায়। এই প্রবাদ অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ নেই। এই মন্দিরের নিকট একটী বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পতিতাবস্থায় আছে, তাহা ক্রমবর্দ্ধনশীল ; দিন দিনই ইহার আকার বৃদ্ধি পাইতেছে। রমণীগণ সন্তানের মঙ্গল-কামনায় এই প্রস্তরের উপর দুগ্ধ ঢালিয়া থাকেন।

মহারাণী গুণবতী মহাদেবীর বিষ্ণু মন্দির

উদয়পুরস্থ মহাদেবের (ভৈরবের) বাড়ীর কিয়দ্দুর পূর্ব্বদিকে একটী প্রাঙ্গণে শ্রেণীবদ্ধভাবে তিনটী মন্দির আছে। পূর্ব্বদিকের মন্দিরদ্বয়ে শিলালিপি নাই। পশ্চিম দিকের মন্দিরটীর পশ্চিম পার্শ্বের দেওয়ালগাত্রে একটা শিলাখণ্ড সংযোজিত আছে। তাহাতে উৎকীর্ণ বাক্য দ্বারা জানা যায়, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের মহিষী গুণবতী মহাদেবী এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ১৫৯০ শকাব্দের বৈশাখ মাসের যুগাদ্যা দিনে বিষ্ণুর

উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন। ইহার সংলগ্ন মন্দিরদ্বয়ও এই মহারাণীর নির্ম্মিত বলিয়া স্থানীয় লোকের বিশ্বাস।

মন্দির গাত্রে সংযোজিত শিলালিপির প্রথম চারি পংক্তি অস্পষ্ট। মধ্যবর্তী অংশ এরূপভাবে বিনষ্ট হইয়াছে যে, তাহা উদ্ধার করিবার উপায় নাই। শেষ ভাগের কতিপয় পংক্তির পাঠ পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বহু চেষ্টায় উদ্ধার করিয়াছিলেন ; তাহা এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে।

—শৌর্য্যায়া রঘুনায়কস্য মহতো গাম্ভীর্য্যমম্ভো
নিধেস্ত্যাগ + ল মর্হ। সৌন্দর্য্যংকুসুমায়ুধস্য
পরমং শ্রীগোবিন্দ ম
* * * * * কৃষ্ণ
* * * * * *
* * * * * *
শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবস্ত্রিপুরনরপতি
গণ্যঃ। তৎপত্নী পুণ্যশীলা সুমতী * গুণবতী বিষ্ণবে সা বরেণ্যা শাকে
খাঙ্কেষুচন্দ্রে মঠমতুলমমুং মাধবেহদাদ্‌যুগাদৌ। † শকাব্দ ঃ ১৫৯০

এই লিপির অবিনষ্টাংশ হইতে যে-সকল বাক্য উদ্ধার হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে বুঝা যায়, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য শৌর্য্যে রঘুর ন্যায়, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায়, সৌন্দর্য্যে কন্দর্পের ন্যায় এবং দানে বলির ন্যায় ছিলেন, এই ভাবগুলি বর্ণিত হইয়াছিল। শেষ চারি পংক্তির মর্ম্ম এই,—

"ত্রিপুর নরপতি শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব (জ্ঞানীদিগের ?) অগ্রগণ্য ছিলেন। ১৫৯০ শকে তাঁহার মহিষী পুণ্যশীলা, সুমতী এবং বরণীয়া গুণবতী দেবী বৈশাখ মাসের যুগাদ্যা দিবসে এই অতুলনীয় মঠ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দান করেন।"

---

* 'পুণ্যশীলা' ও 'সুমতী' মহারাণীর বিশেষণ ; তাঁহার নাম গুণবতী।

† 'যুগাদ্যা' শব্দকে 'যুগাদৌ' লিপি করা হইয়াছে। যুগাদ্যা—যুগান্ত তিথি, পুরাণের মতে—

"বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু তৃতীয়ায়াং কৃতং যুগম্।
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু ত্রেতাথ নবমেহহনি
অথ ভাদ্র পদে কৃষ্ণ ত্রয়োদশ্যান্ত দ্বাপরম্।
মাঘে চ পৌর্ণমাস্যাং বৈ ঘোরং কলিযুগং স্মৃতম্'
ব্রহ্মপুরাণ।

প্রধানতঃ চারি যুগের আরম্ভ তিথিকে যুগাদ্য বলা হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কোনো তিথিকেও 'যুগাদ্যা' তিথির ন্যায় পুণ্যপ্রদ বলা হইয়াছে।

শিলালিপির বাক্যদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এই মন্দিরে বিষ্ণু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। সেই বিগ্রহ কোন্ সময় কি ভাবে বিলুপ্ত হইয়াছেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। মঘ অথবা মুসলমান কর্ত্তৃক ইহা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনাই অধিক। এই মন্দির মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের দ্বিতীয় বারের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মহারাজ রামমাণিক্যের প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমন্দির-সমুহ

উদয়পুরস্থ শিব বাড়ীর প্রাচীর অভ্যন্তরে অবস্থিত চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দিরের পশ্চিম দিকে যে মন্দিরটী অবস্থিত, তাহার গাত্রে অদ্যাপি শিলালিপি সংযোজিত আছে। উক্ত লিপির অনেকাংশ বিনষ্ট হইয়াছে। এই প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ অসম্পূর্ণ বিবরণ আলোচনায় পাওয়া যায়, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র, মহারাজ রামদেবমাণিক্য ১৫৯৫ শকে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দান করেন। শিলালিপির বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ,—

স্বর্লোক স্থিত পারিজাত কুসুম ক্ষৌণী
রুহারোপণং চক্রেশ রা দ্বারা
বতা দ্বাবি য পথি পরিগতা
নিঃশ্রাঙ্ক যনান তনয়া
নিজ্জিত্য ভূমাণ্ডজঃ । ১ । রবিন্দ
মধুপঃ কল্যাণদেবো জ্যম
শেষ ধর্ম্মনিবহৈঃ স্ব তৎপু
ত্রোহতি গুণাকরঃ প্র তৃন্
যোহর্চ্চযি ২ শ্রীগোবিন্দ না ঃ পা
দাব্জকো জীবতা? । ২। ⊏ মহে
কৃতিনঃ পুত্রো মহাত্মা সতা বাজ্যানীয় রাজ
মা কুশলঃ শান্তো বিনীতঃ সদা। । রা
মঃ প দা শাকে
বাণ নবেষু সোম বিমিতে জ্যৈষ্ঠে তিথৌ ॥

এই লিপিদ্বারা স্পষ্ট অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। এই মাত্র বুঝা যায় যে, পারিজাত হরণের বিবরণ লইয়া শ্লোকটি রচিত হইয়াছে ; এবং বিষ্ণুর গুণ বর্ণন করাই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য। এই কারণে বুঝা যায়, মন্দিরটী বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দান করা হইয়াছিল। স্থানীয় লোকেও ইহাকে বিষ্ণু মন্দির বলিয়াই জানে।

শিলালিপিতে "কল্যাণ দেব," "গোবিন্দ" এবং "রাম" এই তিনটী নাম পাওয়া যায়। মন্দিরটী ১৫৯৫ শকে নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহাও পাওয়া যাইতেছে। এই সমস্ত বিষয় আলোচনায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, ১৫৯৫ শকে মহারাজ রাম মাণিক্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। শিলালিপিতে তিনি আপন নামের সহিত

পিতা গোবিন্দমাণিক্য ও পিতামহ কল্যাণমাণিক্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ত্রিপুরায় অনেক তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে এই পদ্ধতি অবলম্বনের নিদর্শন পাওয়া যায়। মহারাজ রামদেবমাণিক্য ১৫৯৫ শকে রাজ্যলাভ করেন ; সেই শকেই এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহার বয়স আড়াই শত বৎসর স্থিরীকৃত হইতেছে। মন্দির নির্ম্মিত হইবার পরে কখনও সংস্কার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সেকালের সুদৃঢ় গাঁথুনীর গুণে এখনও মন্দিরটী অক্ষুণ্ণ অবস্থায় আছে।

মহারাজ রামমাণিক্যের নির্ম্মিত আর একটী বিষ্ণুমন্দির গোমতী নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী রাজবাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বিরাজমান রহিয়াছে। এই মন্দিরটী এখনও সুদৃঢ় আছে। ইহার পশ্চাদ্ভাগের দেওয়ালে, বাহিরের দিকে সম্বন্ধ শিলালিপিতে মন্দিরের বিবরণ লিখিত আছে। এই শিলা-পট্টে উৎকীর্ণ অক্ষরগুলির অতি অল্পই বিনষ্ট হইয়াছে। লুপ্তাংশ বন্ধনীর অভ্যন্তরে সংযোজিত করিয়া শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যে পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে।

প্রোদ্যদ্দোর্দ্দণ্ডঘাতৈঃ কুবলয়দশনোৎপাটনং যশ্চকার,
চানূরং দৈবতেজঃপরিভবচতুরং বেশ্ম নিন্যে যমশ্য।
বাদ্যোঘৈর্দ্বন্দ্বভীতং প্রবলতরবলৈ স্ত্রাসিতাশেষলোকং,
প্রস্ফুর্জ্জদ্‌বাহুদর্পাদমরবলহৃতং যশ্চ কংসং জঘান।
(ভূদেব) স্তস্য পাদাম্বুজযুগলগলৎ স্বাদুমাধ্বীক (ধা) রা
লুব্ধস্বান্তর্দ্বিরেফোনিজতনুজনিবৎপালিতাশেষলোকঃ।
দুষ্টানাং চণ্ডদণ্ডং (বিদধদ) তিতমাং নীতিবিদ্যৈকবিদ্বান্,
ক্ষ্মাপৃষ্ঠোদ্‌ঘৃষ্টমৌলিক্ষিতিপতিনিবহৈর্বন্দ্যমানাঙ্ঘ্রি যুগ্মঃ।
আসীৎ গোবিন্দদেবঃ ক্ষিতিবলয়পতিঃ সর্ব্বধর্ম্মৈককর্ম্মা,
মর্ম্মোদ্‌ঘাটি রিপূণাং নিশিতশরশতৈ সঙ্গরে ত্যক্তভঙ্গঃ।
রত্ন স্বর্ণাণুরাশি প্রচুরতরসমুত্তুঙ্গ মাতঙ্গ দাতা,
সৌন্দর্য্যৈশ্বর্য্যবীর্যৈর্জিতকুসুমধনুর্দ্দেবরাজপ্রভাবঃ।
তস্মাজ্জাতঃ সমস্তক্ষিতিপতিবিজয়ী শৌর্যগাম্ভীর্য্যসিন্ধুঃ,
শ্রীশ্রীরামঃ ক্ষিতীন্দ্রস্ত্রিপুরকুলপতিস্তাতভক্তঃ সুচেতাঃ।
যৎকীর্ত্তীনাং প্রতানৈর্বিমলতরপটৈঃ প্রাবৃতে সর্ব্বলোকে,
নগ্নোহপ্যাজন্ম শম্ভু পিহিতবসনতাং প্রাপ্তবান্ দৈবযোগাৎ।
শ্রীমান্ রত্নাদিদানৈঃ শমিতবসুমতীদী (ন) সন্দোহদৈন্যঃ,
স্ফুর্জ্জৎকর্পূরপূরস্ফুরদমরধুনীশুভ্রকীর্ত্তিপ্রতাপ (ঃ)।
তাতস্বর্গাভিলাষী বিমলতরমতির্বিষ্ণবে স ক্ষিতীন্দ্রঃ,
প্রাদাৎ প্রাসাদরাজং শশধরকিরণং ভক্তিতোহভ্রংকষাগ্রম্ ॥
গ্রহাঙ্কবাণশুভ্রাংশুসম্মিতে শকবৎসরে।
পৌর্ণমাস্যামসৌ দত্তোমকরস্থে দিবাকরে ॥

অনুবাদ

"যিনি প্রচণ্ড বাহুদণ্ডের আঘাতে কুবলয় নামক হস্তীর দশন উৎপাটিত করিয়াছিলেন, চানূর নামক (কংসের অনুচর) দেবতাদিগের তেজ পরাভবকারী হইলেও তাহাকে বাদ্য শব্দেই ভয়াতুর করিয়া যিনি যমালয়ে পাঠাইয়াছিলে, যিনি প্রবল পরাক্রমের দ্বারা ত্রিভুবনের ত্রাসজনক, প্রবল বাহুবলে দেবতাদিগের পরাভাবকারী কংসকে সংহার করিয়াছিলেন, তাঁহার পাদপদ্ম হইতে ক্ষরিত সুমধুর মকরন্দ ধারাতে যাঁহার অন্তঃকরণরূপ ভ্রমর বিমুগ্ধ ছিল, যিনি অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাগণকে পালন করিয়াছেন, যিনি দুষ্টদিগের প্রতি গুরুতর দণ্ড বিধান করিয়া নীতিশাস্ত্র পারদর্শী বলিয়া পরিচিত ছিলেন, যাঁহার পদযুগল বন্দনার সময়ে নরপতিবৃন্দের মুকুটসকল পৃথিবীর পৃষ্টে ঘর্ষিত হইতে, কেবল ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান যাঁহার ব্রত ছিল, সেই গোবিন্দদেব (ত্রিপুরার) নরপতি ছিলেন। তিনি সুতীক্ষ্ণ শায়ক দ্বারা রিপুকুলের মর্ম্মভেদ করিতেন, যুদ্ধস্থল হইতে কদাচ পলায়ন করিতেন না, তিনি প্রভুতপরিমাণে স্বর্ণ রত্ন এবং সুবৃহৎ মাতঙ্গ দান করিতেন। সৌন্দর্য্য সম্পদে তিনি কন্দর্পকেও জয় করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার প্রভাব ছিল। ত্রিপুর কুলপতি, পিতৃভক্ত, সাধু-হৃদয়, শৌর্য্য-গাম্ভীর্য্য-সিন্ধু, সমস্ত নরপতিদিগের বিজেতা, শ্রীশ্রীরামদেব তাঁহা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বিস্তৃত কীর্ত্তিকলাপরূপ শুভ্র বসনে ত্রিভুবন আচ্ছাদিত হওয়াতে, মহাদেব আজন্ম উলঙ্গ হইলেও দৈববশতঃ বসনধারী বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। সমৃদ্ধিশালী মহারাজ রামদেব, রত্নাদিদানের দ্বারা পৃথিবীস্থ দরিদ্রদিগের দারিদ্র্য প্রশমিত করিয়াছিলেন। কর্পূরপ্রবাহ ও উজ্জ্বল সুরধুনীর ন্যায় শুভ্র কীর্ত্তিশালী, প্রতাপান্বিত, নির্ম্মলান্তঃকরণ মহারাজ পিতার স্বর্গাভিলাষে এই উন্নত 'শশধরকিরণ' প্রাসাদ ১৫৯৯ শকের মাঘী পূর্ণিমা দিনে ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দান করেন।"

এই সময় তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে কর্ত্তার আত্মশ্লাঘা প্রকাশের যুগ ছিল। সমগ্র বঙ্গদেশের রাজন্যবর্গ তাম্রশাসনে আত্মগৌরবসূচক যে-সকল কথা উৎকীর্ণ করিয়াছেন, রাজমালা দ্বিতীয় লহরে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে প্রদর্শনের চেষ্টা করা হইয়াছে।* শিলালিপিতেও এই প্রথা বর্জ্জন করা হয় নাই। আলোচ্য শিলালিপিতে, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের পদযুগল বন্দনাকালে নরপতিবৃন্দের রাজমুকুট পৃথিবীপৃষ্ঠে ঘর্ষিত হইবার কথাটী বাদ পড়ে নাই। ধর্ম্মভাব প্রাণোদিত হইয়া দেবায়তন প্রতিষ্ঠা কালেও এবম্বিধ পৌরুষ বাক্য প্রয়োগদ্বারা ধর্ম্মভাবকে কথঞ্চিৎ ম্লান করা হইয়াছে, তবে, মহারাজ রামমাণিক্য এস্থলে আত্ম-গরিমা প্রকাশ না করিয়া পিতৃ-গরিমা ঘোষণা করিয়াছেন ; এতদ্দ্বারা তাঁহার 'পিতৃভক্ত' বিশেষণের সার্থকতা রক্ষা পাইয়াছে বলিতে হইবে। তাম্রশাসন বা শিলালিপিতে এবম্বিধ শ্লাঘাজনক বাক্যের প্রয়োগ লক্ষ্য করিলে, সেকালের রাজগণ অপেক্ষা তাঁহাদের আশ্রিত পণ্ডিতমণ্ডলীর রুচির প্রতিই সমধিক দৃষ্টি নিপতিত হইয়া থাকে।

শিলালিপির শেষাংশ আলোচনায় জানা যায়, ১৫৯৯ শকের মাঘী পূর্ণিমায় এই মন্দির বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে

---

* রাজমালা—২য় লহর, ১৮৫—১৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কলি যুগ আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং ইহা যুগাদ্যা তিথি, এবং পুণ্যকার্য্য সম্পাদনের পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত। মন্দিরটী আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন, এখনও বিশেষ সুদৃঢ় আছে। ইহার শীর্ষদেশে যে-সকল বৃক্ষ জন্মিয়াছে, তাহা উৎসারণ ও সংস্কার করা হইলে মন্দিরটী আরও অনেককাল স্থায়ী হইতে পারে।

মহারাজ রামদেবমাণিক্য কর্ত্তৃক ১৬০৩ শকে উদয়পুরস্থ ঁত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দির সংস্কৃত হইয়াছিল। এই সংস্কারের নিদর্শনস্বরূপ মন্দিরগাত্রে (পূর্ব্বদিকে) যে শিলালিপি সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে উৎকীর্ণ শ্লোক এস্থলে প্রদান করা গেল।

তৎপুত্রো ধর্ম্মচেতাঃ ক্ষিতিপতিতিলকঃ কান্তদান্তো বদান্যঃ
শ্রীশ্রীমান্ সত্যবাদী লিখিলগুণযুতো রামমাণিক্যদেবঃ।
চক্রে প্রাসাদরাজং বিটপিবিদলিতং বীরধীরো মনোজ্ঞং
পূর্ব্বস্মাদম্বিকায়ৈ বিবিধরুচিচয়ং ধন্যমাণিক্য দত্তং ॥
বীরশ্রীযুতরামদেব নৃপতির্বিপ্রোহব্জ ভানুঃ কৃতিঃ
কালীপাদসরোজলুব্ধমধুপঃ পৃথ্বীপতীনাং বরঃ।
বাতোদ ঘাতবিভিন্নদেবসদনং চক্রে মনোজ্ঞং বরং
শাকে নেত্রবিয়দ্রসেন্দুমিলিতে পীঠে ভবান্যাঃ পুনঃ ॥
শকাব্দ ১৬০৩

মর্ম্ম ;—

"তাঁহার (গোবিন্দমাণিক্যের) পুত্র মহারাজ রামদেবমাণিক্য ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, লিখিল-গুণ-সম্পন্ন, কমনীয় মূর্ত্তি, জিতেন্দ্রিয় এবং বদান্য ছিলেন। মহারাজ ধন্যমাণিক্য অম্বিকার উদ্দেশ্যে যে মন্দির দান করিয়াছিলেন, তাহার উপর বৃক্ষাদি জন্মিয়া ফাটিয়া যাওয়ায়, বীরবর ও ধীর প্রকৃতি মহারাজ রামদেব ঐ মন্দির মনোজ্ঞ করেন। দ্বিজপঙ্কজসবিতা, কালীপাদপদ্মলুব্ধমধুপ ভূপতি শ্রীযুত রামমাণিক্য ১৬০৩ শকে বাতাঘাত বিদারিত দেবমন্দির মনোজ্ঞ করেন। শকাব্দ ১৬০৩"

এই সময় রামমাণিক্যের শ্যালক বলিভীমনারায়ণ বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন। মহারাজ কৌলিক প্রথা অতিক্রম করিয়া ইঁহাকে 'যুবরাজ' উপাধি প্রদান করেন। মহারাজ রামমাণিক্যের শাসনকালে, ইঁহারই তত্ত্বাবধানে ঁত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দিরের সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে সংযোজিত শিলালিপি পাঠে ইহা প্রতীয়মান হয়। উক্ত লিপিতে উৎকীর্ণ বাক্যগুলি পরপৃষ্ঠায় প্রদান করা হইল।

এ এ তু	মাম	
শ্রীবলিভিম		না
রায়ণ	ত্রিপুরা	
শ্রীহরিবল্লভ	না	
রায়ণ	বিশ্বাস	
	শক ১৬ ৩	

এই শিলালিপি ১৬০৩ শকের, সুতরাং মহারাজ রামদেবমাণিক্যের শাসনকালের। এই মহারাজ কর্ত্তৃক মন্দির সংস্কার কার্য্যে বলিভীমনারায়ণ ও হরিবল্লভনারায়ণ তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, এতদ্ভিন্ন ইঁহাদের নাম মন্দিরগাত্রে সংযোজিত হইবার অন্য কারণ পরিলক্ষিত হয় না।

উদয়পুরে, গোমতী নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী রাজবাড়ীর পশ্চিমদিকে একটী মন্দির আছে। তাহার অবস্থা এখনও নিতান্ত মন্দ নহে। সাধারণ লোকে ইহাকে ভুবনেশ্বরী মন্দির বলে, কিন্তু এই বাক্য নির্ভরযোগ্য নহে। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্যমাণিক্য এক মণ পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা ভুবনেশ্বরী বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।* তাঁহার পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী অন্য কোনো রাজা 'ভুবনেশ্বরী' বিগ্রহ স্থাপন করিবার প্রমাণ নাই। আমার সহকারী শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দাস উদয়পুর পরিভ্রমণোপলক্ষে উক্ত মন্দিরের গাত্রচ্যুত একখণ্ড শিলালিপি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। শিলাপট্ট বর্ত্তমান সময়ে 'রাজমালা' কার্য্যলয়ে রক্ষিত হইতেছে। তাহার অধিকাংশ অক্ষর বিনষ্ট হওয়ায় তৎসাহায্যে মন্দিরের সম্যক বিবরণ জানিবার উপায় নাই। তবে, এই মন্দির যে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দান করা হইয়াছিল, শিলালিপি হইতে এ কথা উদ্ধার করা যাইতে পারে ; সুতরাং ইহাকে ভুবনেশ্বরীর মন্দির বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হইবে না। উক্ত শিলালিপির বর্ত্তমান অবস্থা নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

বাদিে তাশ

তিতি যুগ্মং বাণী পদ্মাস্য চন্দ্র প্রচুরতর সুধা পা
সানন্দ চিত্তং যোগি ধ্যানাদগম্যং জলদরুচি বপু নন্দসূ
নতো ॥ ভুপাল মহিষী ধন্যা সতী রত্নাবতী বরা। তর্ধ
নির্মিতো রেজে প্রাসাদঃ প্রীতয়ে হরেঃ ॥ আসী স্বর্গ
ঃ সুবিমল হৃদয়স্তেন ধর্ম চেতা স্তৎ পুত্রঃ পুণ্য শী
জনমনাঃ সান্ত সন্তোষ দামঃ। তৎপত্নী শ্রী
মঠ মিমং বিষ্ণবে কুন্দ শুভ্রং কা
বিশাকে সুশীলা শ

* এই ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তির বিবরণ রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ৯৪ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে।

এই শিলালিপির লুপ্তাংশ উদ্ধার করা অসম্ভব। অথচ উদ্ধৃত অসম্পূর্ণ বাক্য দ্বারা প্রকৃতভাব গ্রহণ করাও দুঃসাধ্য। শিলাখণ্ডের তৃতীয় পংক্তিতে 'জলদরুচিবপু নন্দ সূ (নং)", চতুর্থ পংক্তিতে 'ভূপাল মহিষী ধন্যা সতী রত্নাবতী বরা", পঞ্চম পংক্তিতে "প্রীতয়ে হরেঃ "—এই সকল বাক্য পাওয়া যায়। এতদ্বারা ইহাই বুঝা যায়, রাজমহিষী রত্নাবতী মহাদেবী, শ্রীহরির প্রীতি কামনায় এই মন্দির প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাণী রত্নাবতী দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের প্রাধানা মহিষী ছিলেন। রাজমালায় রত্নমাণিক্য খণ্ডে পাওয়া যাইতেছে,—

"মুখ্যরাণী রত্নাবতী বসিল বিদিত।
আর রাণী চতুর্ভিতে হইয়াছে শোভিত ॥"*

শিলালিপির বাক্যের সহিত রাজমালার বাক্য একত্রিত করিলে বুঝা যায়, মহারাজ দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের মহিষী মহারাণী রত্নাবতী উক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দান করিয়াছিলেন। রত্নমাণিক্যের মহিষী ব্যতীত অন্য কোনো রাজমহিষীর রত্নাবতী নাম ছিল এমন কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। রত্নমাণিক্য দুইবার রাজত্ব করিয়াছেন। প্রথমবার ১৬০৪ শকে রাজ্য লাভ করিয়া সেই শকেই সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার ১৬০৭ হইতে ১৬৩৪ শক পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিয়াছেন। এই সময়েই উক্ত মন্দির নির্ম্মিত হওয়া সম্ভবপর। শিলালিপির শেষ অংশ বিনষ্ট হওয়ায়, বিশুদ্ধ ভাবে সময় নির্দ্ধারণ পক্ষেও অন্তরায় ঘটিয়াছে। মহারাজ রত্নমাণিক্যের শাসনকাল ধরিয়া হিসাব করিলে এই মন্দিরের প্রাচীনত্ব কিঞ্চিদধিক দুই শতাব্দী দাঁড়াইবে।

উক্ত শিলালিপি সম্বন্ধে আরও বলিবার কথা আছে। লিপির ষষ্ঠ পংক্তির 'স্তৎপুত্র পুন্য শী' এবং সপ্তম পংক্তির 'তৎপত্নী শ্রী' বাক্যমাত্র উদ্ধার করা যাইতে পারে। মহারাণী রত্নাবতীর নামের পরে ঐ সকল শব্দ সংযোজিত হওয়ায়, স্বতঃই মনে হয়, উক্ত মহারাণীর পুত্র এবং পুত্রবধূর বিবরণ লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজ রত্নমাণিক্যের সন্তান ছিল না। এরূপ অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত শব্দগুলি কি উদ্দেশ্যে বব্যহৃত হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্তই দুঃসাধ্য। 'তৎপুত্র পূণ্যশী (ল)' ও 'তৎপত্নী শ্রী' শব্দের সঙ্গে এই সকল শব্দ সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণের নামোল্লেখ ছিল, ইহা বুঝা যায়। শিলালিপিতে উৎকীর্ণ ঐ সকল নামের অংশ বিনষ্ট হওয়ায়, ইহা এক জটিল প্রহেলিকায় পরিণত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ক প্রকৃত তথ্য উদঘাটন যোগ্য কোনো সূত্র পাইবার উপায় দেখা যায় না।

---

* "রত্নমাণিক্য রাজা স্বর্গগামী হৈল।
তার রাণী রত্নাবতী সহগামী গেল ॥"

† "রত্ন মহেন্দ্র দুহের না রহে সন্ততি।"
শ্রেণীমালা

কুমিল্লার রাজরাজেশ্বরী বিগ্রহ মহারাজ দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের আর এক প্রখ্যাত কীর্ত্তি। মহারাজ বারাণসী ধাম হইতে এই মূর্ত্তি আনয়নপূর্ব্বক স্থাপন করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে 'ত্রিপুর বংশাবলী' পুস্তিকায় লিখিত আছে ;—

"মহারাজা রত্নমাণিক্য বাহাদুর।
কাশীধাম হৈতে কালী আনিল সত্বর ॥
সেই কালী কুমিল্লা নগরে স্থাপিল।
রাজরাজেশ্বরী বলি নামকরণ দিল ॥"

প্রবাদ বাক্যে জানা যায়, জনৈক সন্ন্যাসী এই দেবীর প্রথম পূজক ছিলেন। এই প্রবাদ ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয় না ; কারণ, সুদীর্ঘ কাল হইতে সংসারত্যাগী 'গিরি' সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ শিষ্য পরম্পরা এই দেবালয়ের মোহান্ত পদ লাভ করিয়া আসিয়াছেন। দেবালয়ের প্রথম মোহান্তের সময় হইতেই ক্রমাগত এই নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই দেবালয়ের শেষ মোহান্ত রামচন্দ্র গিরি, দার পরিগ্রহ করিয়া গৃহী হওয়ায়, তদবধি মোহান্তের পদ উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই বিগ্রহের মহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচলিত আছে। কথিত আছে, এই দেবালয়ের স্থান পূর্ব্বে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। একদা প্রদোষকালে কুমিল্লার তদানীন্তন জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট ইলিয়ট সাহেব* অশ্বারোহণে দেবালয়ের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তৎকালে দেবালয়ের আরতি বাদ্য শ্রবণে তাঁহার অশ্ব উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। এই ঘটনায় সাহেব ক্রোধান্বিত হইয়া আদেশ করিলেন, — দেবীমূর্ত্তি এখনই এখান হইতে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। তৎপর পূজক সন্ন্যাসীর অনুনয় বিনয়ে বাধ্য হইয়া বিগ্রহটী এক রাত্রির নিমিত্ত সেই স্থানে রাখিবার পক্ষে সম্মতি প্রদান করিলেন।

সাহেব সেই রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছিলেন। সেই শব্দে তাঁহার পত্নী সহসা জাগ্রতা হইয়া দেখিলেন, পতির মুখ হইতে অনর্গল ধারায় রক্তস্রাব হইতেছে। পত্নীর শুশ্রূষায় সাহেব সংজ্ঞালাভ করিয়া অতি কষ্টে বলিলেন,— নিদ্রিতাবস্থায় তিনি অনুভব করিতেছিলেন, কোনো ব্যক্তি তাঁহাকে সবলে চাপিয়া ধরিয়া বলিতেছে, —"রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি স্থানান্তরিত করিলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য।"

---

* ইনি বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার চার্লস ইলিয়ট্ সাহেবের পিতা ছিলেন। কুমিল্লা হইতে পশ্চিমদিকে ২১ মাইল দূরবর্ত্তী ইলিয়ট্গঞ্জ বাজার ইঁহার প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ লোক কর্ত্তৃক ইঁহার নাম বিকৃত হইয়া, 'আইলর সাহেব' হইয়াছিল, তদনুসারে অনেকে ইলিয়ট্গঞ্জকে আইলরগঞ্জ বলে।

এই ঘটনার পর সাহেব নিজ ব্যয়ে দেবীর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, এবং তিনি যতকাল কুমিল্লায় ছিলেন, দেবীর সেবাপূজার ব্যয় বাবত দৈনিক এক টাকা প্রদান করিতেন।

আর একটী কথা কুমিল্লার প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও অনেকে অবগত আছেন। উক্ত দেবালয়ের পূর্ব্ব দিকে জনৈক ব্রাহ্মণের বাসা ছিল, তিনি মোক্তারী ব্যবসা করিতেন। তাঁহার অল্পবয়স্কা দুইটী কন্যা ছিল, প্রতিদিন ঁরাজরাজেশ্বরী দেবির অর্চ্চনান্তে শঙ্খ ঘন্টা ও কাঁসরধ্বনি শুনিলেই বালিকাদ্বয় দেবালয়ে উপস্থিত হইত, এবং পূজারী ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে প্রসাদ প্রদান করিতেন।

একদিন ঘটনাক্রমে বালিকাদ্বয় সময়মত দেবালয়ে উপস্থিত হইতে পারে নাই। বিলম্বে আসিয়া দেখিল, পূজারী ও ভৃত্যগণ দেবমন্দিরের দ্বার তালা দ্বারা আবদ্ধ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। জনপ্রাণীবিহীন মন্দিরের দ্বারদেশে কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া বড় মেয়েটী নিরাশ হইয়া ভগ্নীকে বলিল,—"এখানে কেহই নাই, মন্দিরের দরজা বদ্ধ, সুতরাং প্রসাদ পাইবার আশা নাই, চল বাসায় যাই।" ছোট বালিকাটী দিদির কথায় রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইতে রাজী হইল না, সে প্রসাদ পাইবার জন্য কাঁদিতে লাগিল। বালিকাটী যখন অধীর হইয়া কাঁদিতেছিল, তখন অকস্মাৎ মন্দিরের দ্বার উদঘাটন করিয়া একটী বালিকা বাহিরে আসিল এবং তাহাদের সম্মুখে প্রসাদের থালাখানা রাখিয়া মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক পুনর্ব্বার দ্বার রুদ্ধ করিল।

বালিকাগণ প্রসাদ পাইয়া হৃষ্টচিত্তে তাহা খাইতে খাইতে দেবালয় হইতে বাহির হইতেছে, এমন সময় পূজারি ঠাকুর আসিলেন। ছোট মেয়েটী তাঁহাকে দেখিয়া অভিমান-ভরে বলিতে লগিল—"ঠাকুর, তুমি প্রসাদ না দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিলে, আমি তোমাকে ডাকিয়া ডাকিয়া খুব কাঁদিয়াছি!" ঠাকুর বলিলেন—"তোমাদের জন্য প্রসাদ রাখিয়াছি—আইস, এখনই দিব।" এই কথা শুনিয়া বালিকাদ্বয় সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"তোমার মেয়ে দরজা খুলিয়া আমাদিগকে প্রসাদ বাহির করিয়া দিয়াছে ; এই দেখ প্রসাদ পাইয়াছি, থালাখানা বারাণ্ডায় রাখিয়া আসিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া এবং তাহাদের হস্তে প্রসাদ দেখিয়া ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হইলেন। তিনি জানিতেন, সেই সময় দেবালয় জনশূন্য ছিল, বিশেষতঃ তাঁহার কোনও কন্যা দেবালয়ে অবস্থান করে না। মনিন্দরের দ্বার তালা দ্বারা অবরুদ্ধ—ইহারা কেমন করিয়া প্রসাদ পাইল? ব্রাহ্মণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বালিকাদ্বয়কে লইয়া মন্দিরের বারাণ্ডায় গেলেন, দেখিলেন, দ্বার পূর্ব্ববৎ বন্ধ রহিয়াছে। বালিকাদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত অবস্থা জানিলেন এবং বুঝিলেন, সত্যসত্যই জনৈক বালিকা দ্বার উদঘাটন করিয়া তাহাদিগকে প্রসাদের থালা বাহির করিয়া দিয়েছে।

থালাখানা বালিকাগণ বারাণ্ডার এক কোণে রাখিয়াছিল, সেই স্থানেই রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, ইহা মায়েরই কার্য্য! তিনি দ্বার উন্মোচন করিয়া দেবীর পাদমূলে পতিত হইলেন এবং ব্যাকুল হৃদয়ে দর্শন কামনা জানাইয়া বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বালিকাদ্বয় ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না, তাহারা ভয়-বিহ্বল চিত্তে বাসার দিকে ছুটিয়া পালাইল।

সকলেই ঁরাজ-রাজেশ্বরী বিগ্রহকে জাগ্রত দেবী বলিয়া বিশ্বাস ও ভক্তি করিয়া থাকে ; এবং সকল সম্প্রদায়ের লোকই আন্তরিক ভক্তির সহিত এই দেবালয়ে ভোগ ও বলি প্রদান করে।

মহারাজ রত্নমাণিক্যের অন্যতম সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি কসবায় ঁকালিকা বিগ্রহ স্থাপন। রাজমালা তৃতীয় লহরে বলা হইয়াছে, মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে এখানে পর্ব্বতের সানুদেশস্থ দুর্গাভ্যন্তরে, খড়ের গৃহে কালিকা বিগ্রহ স্থাপন করা হইয়াছিল। তৎপর মহারাজ কল্যাণমাণিক্য বর্ত্তমান ইষ্টকময় মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ঁকালীকা দেবীকে দান করেন। মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে যে শিলালিপি সংযোজিত আছে, তাহা আলোচনায় বুঝা যায়, মহারাজ দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য এই মন্দিরের সংস্কার করাইয়াছিলেন।*

এই মন্দিরে বর্ত্তমান কালে যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিতা আছেন, তাহাও মহারাজ রত্নমাণিক্য কর্ত্তৃক স্থাপিতা হইয়াছেন। রাজমালায় রত্নমাণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে,—

"কসবাতে কালীমূর্ত্তি করিল স্থাপন।
দশভূজা ভগবতী পতিত তারণ॥"

রত্নমাণিক্য খণ্ড,—২০ পৃষ্ঠা

এই সময় বলিভীম নারায়ণ (রত্নমাণিক্যের মাতুল ও যুবরাজ) বিশেষ প্রভাবশালী এবং রাজ্যের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রাজমালার ভাষা আলোচনায় বুঝা যায়, তাঁহার তত্ত্বাবধানেই এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা হন। এই সময় মহারাজ বিজয়মাণিক্যের বা মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের সময়ের বিগ্রহ ছিল কি না, থাকিলে তাহার অবস্থা কি ঘটিয়াছিল, জানা যায় না। বর্ত্তমান বিগ্রহের বিবরণ ত্রিপুর বংশাবলী গ্রন্থে, রত্নমাণিক্য প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদান করা হইল।

"মনে মনে আদ্যাশক্তি ভাবিতে লাগিল।
কৃপা করি জয়কালী স্বপ্ন দেখাইল॥
কাশীম নগর পরগণাতে আমি বাস করি।
তথা হৈতে রাজা তুমি আমাকে নেও হরি॥
গ্রামেতে আমাকে দ্বিজে কৈরাছে স্থাপন।
এই স্থানে থাকি আমার তৃপ্তি নাই মন॥

---

* রাজমালা—৩য় লহর, ১৭০—১৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পর্ব্বত শিখরে থাকি মনে অভিলাষ।
কার স্থানে রাজা তুমি না কর প্রকাশ ॥
গোপনেতে তুমি মোরে তথাকারে নিয়া।
স্থাপন করহ রাজা ভক্তিযুক্ত হৈয়া ॥”

প্রবাদ বাক্যেও জানা যায়, এই বিগ্রহ শ্রীহট্ট জেলার অন্তঃপাতী কাশীমনগর পরগণাস্থ ধর্ম্মগড় গ্রামে কোনও ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন। ধর্ম্মগড় দত্ত পাড়া নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই বিগ্রহের কতক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আলাপে এবং তাঁহার সংগৃহীত বিবরণ আলোচনায় জানা গিয়াছে, উক্ত দেবীর অবস্থানের বেদী এখনও ধর্ম্মগড়ে বিদ্যমান আছে। এই বেদীর উপর এক সুদৃঢ় মন্দির ছিল। উক্ত মন্দির একটী মাত্র প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। তাহার অভ্যন্তরের আয়তন ১২′ x ১২′ ফুট এবং বাহিরের পরিমাপ ১৮′ x১৮′ ফুট ; উচ্চতা অনুমান ৫২½′ ফুট (৩৫ হস্ত)। মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে একটী বৃহদাকারের দ্বার এবং দক্ষিণ পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র দ্বার ও উত্তর পার্শ্বে একটী জানালা ছিল। কোণচতুষ্টয় চারিটী উপমন্দির দ্বারা পরিশোভিত ছিল। পাঁচটী চূড়াবিশিষ্ট বলিয়া এই মন্দির ‘পঞ্চরত্ন’ নামে অভিহিত হইত। মন্দিরের ঠিক মধ্যস্থলে দেবীর আসন ছিল, অবস্থাদৃষ্টে অনুমতি হয়, বিগ্রহের চতুর্দ্দিকে সাধকগণ উপবেশন করিয়া যোগ সাধন করিতে পারেন, এরূপ ব্যবস্থা ছিল।

পশ্চিম দ্বারের সম্মুখ ভাগে দোচালা গৃহের আকারবিশিষ্ট দরদালান (বাহিরের মণ্ডপ) ছিল। দেবালয়ের চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত থাকিবার নিদর্শন পাওয়া যায় ; তাহার মৃত্তিকা গর্ত্তস্থিত অংশ এখনও বিদ্যমান আছে। পশ্চিম দিকস্থ প্রাচীরের মধ্যভাগে প্রবেশদ্বার, এবং সেই দ্বারের উপরে দোচালা গৃহাকৃতি একটী প্রকোষ্ঠ ছিল। এই প্রকোষ্ঠে প্রহরী থাকিবার অথবা উৎসবাদি উপলক্ষে তাহা নহবৎরূপে ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা অধিক বলিয়া মনে হয়। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের প্রবল ভূমিকম্পে এই মন্দিরের নানা স্থান বিদীর্ণ হইয়া থাকিলেও তাহা ব্যবহারোপযোগী ছিল, অর্থাভাবে তৎপর মন্দিরের সংস্কার হইতে পারে নাই। ১৩৫২ বঙ্গাব্দের ২৪শে আষাঢ় তারিখের ভীষণ ভূমিকম্পে এই মন্দির ভূমিসাৎ হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে স্থানীয় সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে মন্দিরের ইষ্টকরাশি অপসারিত, ও দেবীর আসনের উপর একখানা টিনের গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। অল্প দিন হইল, সেই গৃহে পূর্ব্ব মূর্ত্তির অনুরূপ একখানা ক্ষুদ্র মূর্ত্তি সংস্থাপন করা হইয়াছে।

এই মন্দিরের গাঁথুনীতে প্রাচীন কালের নাতিস্থূল ইষ্টক ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে একখানি লিপিযুক্ত ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে। স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলী সেই

লিপির পাঠ উদ্ধারে অসমর্থ হওয়ায়, তাহা এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হয়, তথায় নির্ণীত হইয়াছে, উক্ত ইষ্টকে ক্রমাগত কতিপয় অক্ষর মাত্র লিখিত আছে, তদ্বারা কোনও বাক্য রচিত হয় নাই। এই সকল অক্ষর অশোকের সমসাময়িক অক্ষরের অনুরূপ বলিয়া সোসাইটির পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন। রাজা অশোকবর্দ্ধন ২৭৩ খ্রীঃ পূঃ অব্দে রাজ্যলাভ করিয়া ২৩২ খ্রীঃ পূঃ অব্দ পর্যন্ত্য ৪১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার শাসন একবিংশতি শতাব্দীরও অধিক প্রাচীন কালের কথা। অশোকের সময়ের প্রচলিত অক্ষর তাঁহার তিরোধানের পরে অনেক কাল চলিয়া থাকিলেও মন্দিরটীর প্রাচীনত্ব মোটামুটি ভাবে দুই সহস্র বৎসর নির্ণয় করা যাইতে পারে। এই মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিগ্রহ কত কালের এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতা কে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে, এই মূর্ত্তির সহিত যে ত্রিপুরেশ্বরগণের কোনোরূপ সম্বন্ধ ছিল না, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। বিগ্রহটী ত্রিপুরেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত হইলে মহারাজ রত্নমাণিক্য তাহা রাত্রিযোগে গোপনে আনিতে বাধ্য হইতেন না। এই দেবালয় হইতেই মহারাজ মূর্ত্তিটী আনয়ন করিয়া ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পরবর্ত্তী কালে এই মন্দিরে একটী বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল।

এই দেবালয়ের দক্ষিণ দিকে একটী পুষ্করিণী আছে। ইহার উত্তর পাড়ে দেবালয়ের ব্যবহার্য্য পাকা ঘাট অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

কসবার দুর্গে সংস্থাপনের পর হইতে এই বিগ্রহ জয়কালী, নামে অবিহিতা হইয়াছেন, অনেকে ইঁহাকে কসবারকালীও বলে। মূর্ত্তিটী একখণ্ড উৎকৃষ্ট কৃষ্ণ প্রস্তরে খোদিত। ইহার উচ্চতা প্রায় ৪১/২ ফুট হইবে, ইহা দশভূজা মূর্ত্তি, সিংহারূঢ়া, তন্নিম্নে অসুর মূর্ত্তি, অসুরের বাম পার্শ্বে মহিষের মস্তক অঙ্কিত আছে। পাদপীঠে উৎকীর্ণ শিবলিঙ্গের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী বৃষভমূর্ত্তি আছে, ক্ষয় হেতু তাহা নিতান্তই অস্পষ্ট। সতর্কভাবে দৃষ্টি করিলে বৃষের দুইখানা পা মাত্র লক্ষ্য করা যায়। দেবীর হস্তস্থিত অস্ত্র গুলিও ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। সিংহের মুখ দক্ষিণমুখী, দেবীর বামদিকে অবস্থিত। অসুর হাঁটু গাড়িয়া উপবিষ্টভাবে আছে। তাহার অবয়বে আক্রমণের ভাব নাই ; তাহার বাম হস্ত বাম হাঁটুর উপরে বিন্যস্ত এবং দক্ষিণ হস্তের কনুইদেশ সিংহের কবলগত। হস্তে কোনো অস্ত্র ছিল কিনা বুঝা যায় না ; এই স্থান ক্ষয় হইয়া গিয়াছে।

কোন ধ্যান মন্ত্রে ই দেবীর অর্চ্চনা করা হয়, পূজক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাহা বলিতে অসম্মত হন। অনেক পীড়াপীড়ির পরে কিয়দংশ মাত্র বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদান করা হইল।

"দশভুজা ত্রিনেত্রাঞ্চ সিংহ বাহিনীশ্বরী।
শবোপরি স্থিতাং দেবী নাগ যজ্ঞোপবিতিনাং ॥"

এই মূর্ত্তি কাশীমনগরে থাকাকালে কোন্ ধ্যানে পূজিতা হইতেন, তাহা কাহারও জানা নাই। অধুনা পূর্ব্বোক্ত কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়, শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত মহাদেবী বড় কাপন গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকিশোর তন্ত্ররত্ন মহাশয় হইতে এক ধ্যানমন্ত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। এই মন্ত্র মায়া তন্ত্রের অষ্টচত্বারিংশৎ পটলে উক্ত হইয়াছে। মন্ত্রটী এই ;—

"মহালিঙ্গাৎ সমুদ্ভূতং পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং।
তস্যোপরি মহাসিংহং স্বয়ংসম্ভু মায়াত্মকং ॥
তৎপৃষ্ঠে চিন্তয়েদ্দেবীং মহাকালীং মহেশ্বরীং।
রক্ত বস্ত্র পরিধানাং নানালঙ্কার ভূষিতাং ॥
খড়্গ চর্ম্ম গদাশূল পদ্মং দক্ষোর্দ্ধতঃ ন্যসেৎ।
পাশাঙ্কুশ শরংচাপং ত্রিশূলং বামতঃ ক্রমাৎ ॥
কৃষ্ণবর্ণাং মহাদেবীং দিগ্বাহুভির্ব্বিরাজিতাং।
লিঙ্গপার্শ্বে শুক্লবর্ণং বৃষভং ধর্ম্মরূপিনং ॥
উত্তমাঙ্গং লুলাপস্য বামপার্শ্বে ব্যবস্থিতং।
এবং কল্পতরুমূলে ধ্যায়েদ্ব্রহ্ম স্বরূপিনীং ॥"

ইহা মহাকালীর ধ্যান। দেবীমূর্ত্তির প্রত্যেক অঙ্গের সহিত এই ধ্যানমন্ত্রের সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইতেছে, সুতরাং ইহা 'মহাকালী' বিগ্রহ বলিয়াই বুঝা যায়। বর্ত্তমান পুরোহিতগণ যে ধ্যানে দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাহা এই মূর্ত্তির প্রকৃত ধ্যান বলিয়া মনে হয় না। এই বিগ্রহ সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কোনো কথা বলিবার সুবিধা নাই।

মহারাজ রামমাণিক্য স্বীয় শ্যালক বলিভীমনারায়ণকে যৌবরাজ্য প্রদানের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। রামমাণিক্যের পুত্র দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের শাসনকালেও বলিভীমের 'যুবরাজ' উপাধি অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময় তিনি শাসনভার গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। এই কারণেই তাঁহার তত্ত্বাবধানে কসবার "কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত বলিভীমের আরও অনেক কীর্ত্তি আছে। তিনি বিলনীয়া বিভাগের অন্তর্গত পিনাক পাথর নামক স্থানে এক বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় একটী নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই স্থানে অনেক দীঘিপুষ্করিণী ও রাস্তাঘাট ইত্যাদি প্রাচীন সমৃদ্ধির নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। পিনাক পাথরে অবস্থিত বলিভীম নারায়ণের দীঘির নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

পিনাক পাথরের অর্ন্তভুক্ত 'দেবারু' ও 'ঠাকুরাণী টীলা' নামক স্থানে বৃহদাকারের শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ বিষ্ণুমূর্ত্তি, হনুমান মূর্ত্তি, নৃসিংহমূর্ত্তি এবং অষ্টভুজা মহিষাসুরমর্দ্দিনী শক্তিমূর্ত্তি প্রভৃতি অনেকগুলি বিগ্রহ পর্ব্বত কন্দরে ভূপতিত

অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মূর্ত্তির বিশালত্ব দর্শনে আমাদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হইয়াছিল। যে কালে রেল, ষ্টিমার প্রভৃতি এতদঞ্চলে চলাচল ছিল না, সেই সময় কোন্ স্থান হইতে কি উপায়ে এই সকল বিগ্রহ আনয়ন করা হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। এই সকল প্রস্তর উৎকৃষ্ট শ্রেণীর না হইলেও নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে এই শ্রেণীর প্রস্তর নাই। ইহা রাজ্যমধ্যে পাওয়া গিয়া থাকিলেও দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আনা হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দীর্ঘকালের রৌদ্র-বৃষ্টিতে মূর্ত্তিগুলির অনেকাংশ ক্ষয় হইয়াছে, সুতরাং কারুকার্য্যের বিচার করা দুঃসাধ্য। তবে মোটামুটিভাবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই সকল বিগ্রহের তক্ষণশিল্প উচ্চাঙ্গের নহে। মূর্ত্তিসমূহের বিশালত্বই ইহাদের বিশেষত্ব বলিয়া মনে হয়।

এই সকল মূর্ত্তির মধ্যে কোনো কোনোটী ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখনও মন্দিরের ভগ্নস্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি দণ্ডায়মান অবস্থায়ই ছিল, গুপ্তধনলোভী তস্কর কর্ত্তৃক তাহা ভূপাতিত হইয়াছে। বিগ্রহের পাদপীঠের নিম্নে মৃত্তিকাগর্ত্তে গুপ্তধন আছে মনে করিয়াই তাহার মাটি খুঁড়িয়া এবম্বিধ অপচয় ঘটাইয়াছে। কোনো কোনো মূর্ত্তি স্থানান্তরিত হইয়াছে বলিয়াও মনে হয়। একটী অষ্টভূজা মহিষাসুরমর্দ্দিনী মূর্ত্তির নিম্নভাগ মৃত্তিকাগর্ত্তে প্রোথিত অবস্থায় আছে। মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুরের প্রযত্নে তদঞ্চলের অধিবাসী মঘদিগের দ্বারা মৃত্তিকা খনন করাইয়া, মূর্ত্তিটী উদ্ধারের চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই সময় আমিও তাঁহার সহযাত্রী ছিলাম। তাহা উত্তোলন করা মনুষ্যের অসাধ্য হওয়ায়, সঙ্গীয় একটী হস্তী দ্বারাও টানানো হইয়াছিল। সমস্তদিন চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারায়, ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। সে দিন প্রখর রৌদ্র ভোগ, কঠোর পরিশ্রম এবং উপবাস আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, কিন্তু এত করিয়াও বিগ্রহ উদ্ধার করা যাইতে পারিল না। এই সকল কীর্ত্তি যাহাতে নির্জ্জন অরণ্যেই বিলয় না হয়, তৎপক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া একান্ত সঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে।

গোবিন্দমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগন্নাথ ঠাকুর। জগন্নাথের পুত্র চম্পকরায় এবং কন্যার নাম দ্বিতীয়া দেবী। এই দ্বিতীয়া দেবী মেহেরকুল পরগণার অন্তর্গত লালমাই পাহাড়ের নিম্নভাবে এক দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই জলাশয় সাধারণের নিকট 'দুত্যার দীঘি' নামে পরিচিত। 'দ্বিতীয়া' শব্দ অপভ্রংশ হইয়া 'দুত্যা' নাম ধারণ করিয়াছে। অনভিজ্ঞতাবশতঃ কেহ কেহ ইহাকে দুত্যা রাজার দীঘিও বলে। এই দীঘির পশ্চিমদিকে পাহাড়ের শীর্ষ দেশে দ্বিতীয়া ঠাকুরাণী দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার একটী

চণ্ডিকা মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই দীঘি ও দেবায়তন সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে ;—

"চম্পক রায় দেওয়ান ছিল হৈল যুবরাজ।
তার ভগ্নী দ্বিতীয়া নামে করে পূণ্যকাজ॥
মেহেরকুল উদয়পুর দীর্ঘিকা খনিল।
দৌল সেতু চণ্ডীমুড়া চণ্ডিকা স্থাপিল॥"

রত্নমাণিক্য খণ্ড—২৩ পৃষ্ঠা।

লালমাই পাহাড়ের শৃঙ্গদেশে চণ্ডিকা মূর্ত্তি স্থাপনের সময় হইতে, সেই শৃঙ্গটীর নাম 'চণ্ডীমুড়া' হইয়াছে। এই বিগ্রহ কোন সময় কি অবস্থায় অন্তর্হিতা হইয়াছেন, তাহা জানিবার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্থানীয় লোকে বলে, জনৈক উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি বিগ্রহটী মন্দির হইতে নিয়া কোথায় ফেলিয়া দিয়াছে, তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীমুড়ার অদূরবর্ত্তী হরিপুর গ্রামে জনৈক নমঃশূদ্র জাতীর গৃহস্থ ভবনে প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ এক দশভূজা মহিষাসুরমর্দ্দিনী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। ইহা উক্ত গ্রামের একটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে তাহার গর্ত্তে পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তি পূর্ব্বের কোথায় ছিল এবং কি কারণে কতকাল পূর্ব্বে, কাহাকর্ত্তৃক মূর্ত্তিটী পুষ্করিণী গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কাহারও কিছু জানা নাই। যে পুষ্করিণীতে বিগ্রহটী পাওয়া গিয়াছে, সেই পুষ্করিণী বহু প্রাচীন, ইহার বয়স বা বিবরণও গ্রাম্য সাধারণের অগোচর। আমাদের মনে হয়, এই দশভুজা মূর্ত্তিই 'চণ্ডিকা' নামকরণে চণ্ডীমুড়ার মন্দিরে স্থাপন করা হইয়াছিল, মুসলমানগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, অথবা অপহরণ উদ্দেশ্যে ইহা কোনো ব্যক্তি কর্ত্তৃক জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে ; পূর্ব্বোক্ত রূপ ক্ষিপ্ত ব্যাক্তিদ্বারা এই কার্য্য হওয়াও বিচিত্র নহে। অনুমান ভিন্ন এ কথার কোনও প্রমাণ নাই। কিন্তু এবম্বিধ মূর্ত্তি হরিপুর গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে কোথাও স্থাপিত ছিল, অথবা সে কালে এরূপ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবার উপযুক্ত লোক তদঞ্চলে ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই কারণেও ইহা ত্রিপুর রাজপরিবারের কীর্ত্তি বলিয়া স্বতঃই হৃদয়ে ধারণা হয়।

মূর্ত্তিটী কিঞ্চিদধিক দুই হস্ত পরিমিত উচ্চ প্রস্তরফলক খোদিত। ইহার শিল্প-নৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য। স্থানান্তরিত এবং জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হইয়াও ইহা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় আছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চণ্ডীমুড়ায় দুইটী মন্দির অবস্থিত। তাহা সাধারণতঃ 'চণ্ডী-মন্দির' নামে প্রসিদ্ধ। ইহার একটীতে চণ্ডীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। অপরটী কোন দেবতার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। ত্রিপুরার পূর্ব্বতন রাজধানী উদয়পুরে যে-সকল প্রাচীন

মন্দির আছে, এই মন্দিরদ্বয় তদনুকরণে গঠিত। ইহা খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর কীর্ত্তি, সুতরাং ইহার প্রাচীনত্ব ন্যূনাধিক আড়াই শত বৎসর। নির্ম্মাণের পরে এই সকল মন্দিরের কখনও সংস্কার হইয়াছে, এমন মনে হয় না। প্রাচীন কালের গাঁথনীর গুণে মন্দির দুইটী এখনও জীর্ণ দেহ লইয়া দণ্ডায়মান আছে। ইহার সমগ্র ভাগ বৃক্ষলতা সমাবৃত। একীট মন্দিরের দ্বারদেশের উপরিভাগে প্রস্তর ফলক সংযোজিত ছিল, এরূপ চিহ্ন পাওয়া যায়।

মন্দিরদ্বয় দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। চাঁদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রথমতঃ এক সুবর্ণমণ্ডিত অষ্টভুজা শক্তিমূর্ত্তি এই স্থানে স্থাপিত করেন—ইহা ১৩২৫ বাঙ্গালা সনের কথা। প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরেই এই বিগ্রহ অপহৃত হওয়ায়, উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুনর্ব্বার কতিপয় মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া মন্দিরদ্বয়ে সংস্থাপিত করিয়াছেন। এক মন্দিরে একটী দণ্ডায়মান দ্বিভুজ মূর্ত্তি ও একটী উপবিষ্টাবস্থায় গঠিত প্রস্তরমূর্ত্তি, একটী ধাতুময় অষ্টভুজা শক্তি মূর্ত্তি, একটী প্রস্তরময় চক্র, এবং অপর মন্দিরে অষ্টধাতু নির্ম্মিত এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হইয়াছে। প্রথমোক্ত মন্দিরে অবস্থিত দণ্ডায়মান মূর্ত্তিটী সূর্য্য মূর্ত্তি ও উপবিষ্ট মূর্ত্তিটী 'চণ্ডীমূর্ত্তি' নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু উপবিষ্ট মূর্ত্তিটীর চালিতে যে সকল মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, তাহা নানা অবস্থাপন্ন বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বোপরিভাগে অঙ্কিত মূর্ত্তিটী ধ্যানী বুদ্ধ হইবার সম্ভাবনাই অধিক। এই কারণে এই বিগ্রহ বৌদ্ধ তান্ত্রিক সময়ের বলিয়াই আমাদের ধারণা হইতেছে।

লালমাই পাহাড়ের স্থূল বিবরণ এবং পূর্ব্বোক্ত অষ্টভুজা শক্তিমূর্ত্তির কথা রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ২৮৯-২৯৭ পৃষ্ঠায় "পাটিকারা" রাজ্যের বিবরণে উল্লেখ করা হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে পুনরালোচনা করা হইল না।

মহারাজ মুকুন্দমাণিক্যের স্থাপিত বিগ্রহ ও মন্দির।

মহারাজ মুকুন্দমাণিক্য স্বীয় গুরু প্রভুপাদ ঁবৃন্দাবনচন্দ্র গোস্বামীর নামানুসারে অষ্টধাতু নির্ম্মিত 'শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র' বিগ্রহ স্থাপন করেন। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে ;—

"বৃন্দাবনচন্দ্র গোসাই নিত্যানন্দ বংশ।
তান কীর্ত্তি কত বলি তিনি দেব অংশ॥
মুকুন্দমাণিক্য রাজার তিনি ইষ্টদেব।
রাজা মনে করে ইষ্ট নামে স্থাপে দেব॥
ইষ্ট মতে ধাতুর বিগ্রহ নির্ম্মাইল।
'বৃন্দাবনচন্দ্র' ইষ্ট নামেতে রাখিল॥
দশকর্ম্ম করাইল যথা বিধি মতে।
উদয়পুরে স্থাপিলেক মন্দির তাহাতে॥"

মুকুন্দমাণিক্য খণ্ড—৩২-৩৩ পৃষ্ঠা।

শ্রেণীমালা গ্রন্থেও এই বিগ্রহের বিবরণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে মুকুন্দমাণিক্য প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে ;—

"আর পুণ্য করিলেন কহিব এখন।
অষ্টধাতুর শ্রীমূর্ত্তি করায় রচন॥
নৃপতির ইষ্ট দেবে এই নাম ছিল।
বৃন্দাবনচন্দ্র নাম তাহান রাখিল॥
আয়োজন করিলেন যথা শাস্ত্রমতে।
প্রতিষ্ঠা বিবাহ করায় দেব যেন তাতে॥
বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির ইষ্টকে নির্ম্মাণ।
ঠাকুর স্থাপিল নৃপ উদয়পুর স্থান॥"

শ্রেণীমালা।

এই সকল বাক্যদ্বারা জানা যাইতেছে, মহারাজ মুকুন্দমাণিক্য, শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়া, তাঁহার দশবিধ সংস্কার সমাপনান্তে উদয়পুরে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময় তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির অদ্যাপি উদয়পুরস্থ ভৈরবের বাড়ীর প্রাচীরাভ্যন্তরে (পশ্চিমদিকে) বিদ্যমান আছে। এই মন্দিরে যে শিলালিপি সংযোজিত আছে, তাহার অক্ষরগুলি বিনষ্ট হওয়ায় পাঠোদ্ধারে উপায় নাই।

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ ত্রিপুর রাজপরিবারের কুলদেবতা। উদয়পুর হইতে আগরতলায় রাজধানী উঠাইয়া আনিবার সময়, মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য কর্ত্তৃক এই বিগ্রহও আগরতলায় নীত হয়, তৎপর দীর্ঘকাল আগরতলাস্থ পুরাতন হাবেলীতে এই বিগ্রহ পূজিত হইতেছিলেন, মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের শাসনকালে ইহা নূতন হাবেলীতে আনীত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে এই বিগ্রহ ঁলক্ষীনারায়ণ ও ঁভুবনমোহন বিগ্রহের সহিত এক সঙ্গে, মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের নির্ম্মিত সুরম্য মন্দিরে সংস্থাপিত আছেন।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের স্থাপিত বিগ্রহ ও মন্দির।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য, উদয়পুর হইতে রাজপাট উঠাইয়া, আগরতলায় নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় উদয়পুর হইতে শ্রীশ্রীচতুর্দ্দশ দেবতা সঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন। আগরতলা, পুরাতন হাবেলীতে এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, সেই মন্দিরে উক্ত দেবতা স্থাপন করা হয়।* বর্ত্তমান কালেও বিগ্রহসমূহ সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

---

* মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য প্রসঙ্গে পাওয়া যায় ;—

"হরিমণি যুবরাজে করিল আদেশ।
আগরতলা ধামে পুরী করহ বিশেষ॥
* * * *
তাহা শুনি যুবরাজ ঝটিতে চলিল।
আগরতলা স্থানে আসি উপনীত হৈল॥

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের অন্য কীর্ত্তি নুরনগর পরগণায় অন্তর্গত রাধানগর গ্রামস্থিত ঁরাধামাধব দেবতার মন্দির। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের স্থাপিত আখাউড়া ষ্টেশনের সন্নিহিত কালিকাগঞ্জ নামক স্থানে পাশাপাশি ভাবে দুইটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়া উক্ত উভয় দীঘির মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী মন্দির (পঞ্চরত্ন) নির্ম্মাণ করা হয়। এই মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধামাধব বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজের আজ্ঞানুসারে রাজমহিষী জাহ্নবী মহাদেবী এই দেবালয় ও দেবতার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পাদন করেন। এতৎ সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে,—

"কালিকাগঞ্জ দুই দীঘি করিয়া খনন।
পাড়মধ্যে নির্ম্মাইল পঞ্চ যে রতন ॥
এগার শ আটসত্তর সনের সময়ে।
মহারাণী জাহ্নবায় প্রতিষ্ঠা করয়ে ॥
রাধামাধব দুই বিগ্রহ করিল যতন।
পঞ্চরত্ন নির্ম্মাইয়া (১) করেন স্থাপন ॥"

কৃষ্ণমালা গ্রন্থে বিষয়টী সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় ;—

"রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের রাণী পুণ্যমতি।
স্থাপিতে দেবতা এক করিলেক মতি ॥
কালিকাগঞ্জেতে পূর্ব্বে আছে জলাশয়।
তথাতে নির্ম্মাণ করাইল দেবালয় ॥
দুই দিকে দুই পুষ্করিণী মনোহর।
তার মধ্যে দেবালয় পরম সুন্দর ॥
পঞ্চরত্ন নামে মঠ ইষ্টক রচিত (২)।
নির্ম্মাইল তারমধ্যে অতি সুললিত ॥

প্রথমত রাজগণ ইট সুরকী দিয়া।
এক মঠ বানাইল মনোরম করিয়া ॥
সেই মঠে চৌদ্দদেব স্থাপন করিল।
তদন্তরে পুরী এক নির্ম্মাণ হইল ॥
ত্রিপুর বংশাবলী।

(১-২) রাজমালা, কৃষ্ণমালা, শ্রেণীমালা ও ত্রিপুর বংশাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে এই দেবালয়কে 'পঞ্চরত্ন' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে উপরতলার মধ্যভাগে দোচালা গৃহের আকারবিশিষ্ট চূড়াটী মাত্র বিদ্যমান আছে। একটী চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরকে 'পঞ্চরত্ন' আখ্যা প্রদান করা হইল কেন, এই সংশয় হৃদয়ে উদিত হওয়ায়, মন্দিরটী দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। তাহা দেখিয়া বুঝা গেল, উপর তলার চতুষ্কোণে চারিটী চূড়া ছিল, তাহা অনেককাল পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছে। এই চূড়াগুলি কি আকারের এবং কতবড় ছিল, তাহা তৎকালে বুঝিবার সুযোগ ঘটে নাই। সৌভাগ্যক্রমে রাজ সরকারী চিত্রশালায় এই মন্দিরের একখানা প্রাচীন চিত্র পাইয়াছি, তদ্দ্বারা মন্দিরের পূর্ব্বাবস্থা জানিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। এই মন্দির যে পাঁচটী চূড়াবিশিষ্ট ছিল, উক্ত চিত্র হস্তগত হইবার পর তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণয় করিতে পারিয়াছি। ইহার

চতুষ্কোণে চারিটী চূড়া এবং মধ্যস্থানে একটী দোচালা গৃহাকারের চূড়া ছিল, বর্ত্তমানকালে শেষোক্ত চূড়াটীমাত্র আছে।

প্রতিষ্ঠা করিতে সেই দেব আয়তন।
ফাল্গুন মাসেতে করিলেক আরম্ভন॥
* * * *
তারপর রামীকে কহিল নৃপমণি।
কর গিয়া পঞ্চরত্ন প্রতিষ্ঠা আপনি॥
তবে মহারাণী নরপতির বচনে।
পঞ্চরত্ন প্রতিষ্ঠা করিল শুভক্ষণে॥
নির্ম্মল করিয়া মূর্ত্তি করিয়া গঠন।
স্থাপিল দেবতা রাধা শ্রীরাধামোহন॥
নব-ধারা-ধর জিনি শ্যাম কলেবর।
তড়িতের প্রায় তাহে হরিত অম্বর॥
মাথে চূড়া হাতে বাঁশী ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা।
কি কহিতে পারি সেই রূপের মহিমা॥
বামেতে রাধিকামূর্ত্তি ভুবন মোহিনী।
স্বরূপে আসিছে যেন দেবী সনাতনী॥
সুবর্ণ রজত মুক্তা প্রবাল রচিত।
অলঙ্কার নানাবিধ তাহাতে ভূষিত॥
পঞ্চরত্নে সেই মূর্ত্তি করিয়া স্থাপন।
নাম করিলেক রাধা শ্রীরাধা মোহন॥”

এই দেবালয় ও দেবতা প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে শ্রেণীমালা গ্রন্থে লিখিত আছে,—

“পরগণে নুরনগর রাধানগর গ্রামে।
পঞ্চরত্ন দিল রাণী জাহ্নবীর নামে॥
তাহার পূর্ব্ব পশ্চিম এ দুই ভাগেতে।
দুই দীর্ঘিকা দিল রাজা রাণী তাতে॥
পঞ্চরত্নে রাধামাধব রাণী যে স্থাপিল।
ঠাকুর সেবার তরে জমি কত দিল॥”

গ্রন্থান্তরে পাওয়া যাইতেছে,—

“তৎপরে নুরনগর রাধানগর গ্রামে।
দুই দীঘি কাটাইল পঞ্চরত্ন সমে॥
দুই দীঘির মধ্যস্থলে পঞ্চরত্ন দিয়া।
রাধামাধব বুদ্ধদেব* তাহাতে স্থাপিয়া॥”

---

* রাধামাধব বিগ্রহের সঙ্গে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা মূর্ত্তিও স্থাপিত হইয়াছিল। এই দারুব্রহ্ম অদ্যাপি রাধামাধবের সহিত পূজিত হইতেছেন। এক সম্প্রদায় বলেন, এই ত্রিমূর্ত্তি বৌদ্ধগণের ধর্ম্ম-যন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই কারণে অনেকে জগন্নাথকে বুদ্ধদেব বলেন ;

প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য তবে স্বয়ং করিল।
মহারাণী জাহ্নবী কীর্ত্তি নিয়োজিল॥"

ত্রিপুর বংশাবলী।

উদ্ধৃত বাক্যাবলী আলোচনা করিলে জানা যায়, এই দেবায়তনের অবস্থানভূমি পূর্ব্বে 'কালিকাগঞ্জ' নামে প্রখ্যাত ছিল, রাধামাধব বিগ্রহ স্থাপনের পর হইতে উক্ত স্থানে 'রাধানগর' নাম হইয়াছে।

রাজমালার বাক্য আলোচনায় জানা যাইতেছে, এই দেবায়তন ১১৮৫ ত্রিপুরাব্দে প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণমালা গ্রন্থে পাওয়া যায়,—

"ষোলশত সাতানব্বই শকের সময়।
প্রতিষ্ঠা হইল পঞ্চরত্ন দেবালয়॥"

কৃষ্ণমালা।

১১৮৫ ত্রিপুরাব্দ ও ১৬৯৭ শক অভিন্ন, সুতরাং উভয় গ্রন্থের নির্দ্ধারিত সময়ের পরস্পর ঐক্য পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই মন্দিরগাত্রে যে শিলালিপি সংযোজিত ছিল, তাহা বর্ত্তমানকালে রাজমালা কার্য্যালয়ে রক্ষিত হইতেছে। উক্ত প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ শ্লোকাবলীতে মন্দিরের স্থূল বিবরণ পাওয়া যায়, প্রতিষ্ঠার শকাঙ্কও তাহাতে লিখিত আছে। শিলালিপি এই ;—

স্বস্তি— আসীদ্ ভূপৈকভূপঃ ক্ষয়িতরিপুকুলঃ কল্যাণদেবঃ ক্ষিতৌ,
তৎপুত্রঃ কীর্ত্তিবল্লী প্রথিত সুরপুরো গোবিন্দদেবো নৃপঃ।
তৎসূনু ধর্ম্মশীলঃ প্রবল নৃপবরো রামদেবঃ প্রতাপী,
তজ্জঃ শ্রীকৃষ্ণসেবানবরত কৃতধীদেবো মুকুন্দো নৃপঃ॥
তৎসূনুর্বিপ্রগোপ্তাহ্যরিকুল বিজয়ৈর্বিশ্ববিভ্রান্ত কীর্ত্তিঃ
শ্রীযুক্তঃ কৃষ্ণদেবঃ ক্ষিতিপতিরিতি তৎপত্নী মহেষী শুভা।
নাম্না শ্রীজাহ্নবী সা পতিচরণরতা বিষ্ণবে কৃষ্ণপ্রীত্যা,
প্রদাদ্ রম্যেষ্টকাভির্বিরচিতমমলং মন্দিরং পঞ্চরত্নং॥
কালিকাগঞ্জকে যাম্যে দীর্ঘিকাদ্বয় মধ্যতঃ
মুণিগ্রহষড়ঙ্কে চ মাঘে মাকরী* সংজ্ঞকে।
ধর্ম্মাকর্ম্ম বিচারে চ রাজদ্বারে ব্যবস্থিতঃ
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণমাণিক্য ভূপতে॥

এমনকি, দশাবতারের মূর্ত্তি অঙ্কনকালে কোনো কোনো চিত্রকর বুদ্ধের স্থলে জগন্নাথের মূর্ত্তি আঁকিয়া থাকেন। এস্থলেও জগন্নাথ বিগ্রহকে বুদ্ধদেব বলা হইয়াছে।

* **মাকরী ;**— প্রধানতঃ মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিকে মাকরী-সপ্তমী বলা হয়। এই মাসের পূর্ণিমা তিথিও মাকরী তিথিমধ্যে পরিগণিত, কিন্তু সপ্তমী তিথিই সমধিক প্রশস্ত। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে,—

"সূর্য্যগ্রহণ তুল্যা হি শুক্লা মাঘস্য সপ্তমী।
অরুণোদয় বেলায়াং তস্যাং স্নানং মহা ফলম্॥
* * * *

মন্তব্য— শ্লোকের ৪র্থ পংক্তিতে 'শ্রীকৃষ্ণ সেবা' স্থলে শিলাখণ্ডে 'শ্রীকৃষ্ণ দেবা' উৎকীর্ণ হইয়াছে। ৫ম পংক্তির "বিজয়ৈ" শব্দে বর্গীয় 'জ' স্থলে আন্ত্যস্থ 'য' ব্যবহৃত হইয়াছে। ৬ষ্ঠ পংক্তিতে 'মহিষী' শব্দকে দেশ প্রচলিত ভাষানুসারে 'মহেষী' করা হইয়াছে। ৯ম পংক্তিতে 'যাম্যে' **শব্দস্থলে** 'খাম্যে' উৎকীর্ণ হইয়াছে। মূলে, শ্লোকানুরোধে পৃথক পৃথক পংক্তি লিপি করা হয় নাই, প্রস্তর ফলকের আয়তন পূর্ণ করিয়া পংক্তি খোদিত হইয়াছে। আটটী পংক্তিতে পূর্ব্বোক্ত সম্যক বাক্য উৎকীর্ণ হইয়াছে। শিলাখণ্ডের আয়তন ২৬″ x ১৩$^{১}/_{২}$ ইঞ্চি।

শিলালিপির মর্ম্ম ;—

"ভূপতিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রিপুকুলের উচ্ছেদকারী, কল্যাণদেব নামে পৃথিবীতে এক নরপতি ছিলেন। তৎাহার পুত্র গোবিন্দদেব কীর্ত্তিদ্বারা সুরলোকেও বিখ্যাত ছিলেন। তৎপুত্র মহারাজ মুকুন্দদেব কৃষ্ণসেবায় নিরত ছিলেন। তাঁহার পুত্র ব্রাহ্মণদিগের রক্ষাকর্ত্তা, শত্রুকুলবিজয়ী মহারাজ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব। তাঁহার পত্নী, পতিভক্তিপরায়ণা জাহ্নবী দক্ষিণ কালিকাগঞ্জে দুইটি দীর্ঘিকার মধ্যস্থলে মনোহর ইষ্টকনির্ম্মিত পঞ্চরত্ন ১৬৯৭ শকের মাঘ মাসে মাকরী (সপ্তমী বা পূর্ণিমা) তিথিতে বিষ্ণু প্রীত্যর্থে দান করেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা নামে কৃষ্ণমাণিক্য নৃপতির দ্বারপণ্ডিত ছিলেন।"

শিলালিপি সংগ্রহ।

কৃষ্ণমালায় পাওয়া যায়, এই দেবায়তন ফাল্গুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; শিলালিপির দ্বারা মাঘের মাকরী তিথিতে প্রতিষ্ঠার কথা পাওয়া যাইতেছে। এতদ্দ্বারা উপলব্ধি হয়, মাঘ মাসের মাকরী তিথি ফাল্গুন মাসে পড়িয়াছিল। তদবস্থায় শিলালিপিতে চান্দ্রমাস ও কৃষ্ণমালায় সৌর মাস ধরিয়া সময় নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

পাঁচটী চূড়াবিশিষ্ট বলিয়া এই মন্দিরের 'পঞ্চরত্ন' নাম হইয়াছে। বর্ত্তমান-কালে একটীমাত্র চূড়া বিদ্যমান থাকিবার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। মন্দিরটী দ্বিতলবিশিষ্ট ; উপর তলার দোচালা আকারের প্রকোষ্ঠটীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া প্রদক্ষিণ করিবার স্থান আছে। এই প্রকোষ্ঠের বহির্ভাগস্থ দেয়ালের গাত্রে এবং নিম্নতলের দেয়ালে প্রস্তরফলকে অঙ্কিত দশাবতারের মূর্ত্তি এবং কৃষ্ণলীলা

অরুণোদয় বেলায়ং শুক্লা মাঘস্য সপ্তমী।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহ শতৈঃ সমাঃ ॥
* * * *
যদ্‌যজ্জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী ॥"

ঘটিত আরও নানাবিধ মূর্ত্তি সংযোজিত ছিল। প্রবল ভূমিকম্পে মন্দিরের অধিকাংশ বিধ্বস্ত হওয়ায়, তৎসহ কতিপয় মূর্ত্তিও বিনষ্ট হইয়াছে। এই সকল মূর্ত্তির কারুকার্য্য, ভাস্করের শিল্প-নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচায়ক। মন্দিরের পূর্ব্বপার্শ্বে ধাতুনির্ম্মিত সূর্য্যের প্রতিকৃতি ও পশ্চিম পার্শ্বে অর্দ্ধচন্দ্রের আকৃতি সংযোজিত ছিল।

মন্দিরের নিম্নতলের আয়তন ৪৫ x ৩০ ফুট, উচ্চতা ৪৫ ফুট হইবে। উপরতলার গৃহটী দেবায়তন ; তাহা নিম্নতল অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র। উপরের গৃহটীর ছাঁদ দোচালা গৃহের আকারে গঠিত। শিলালিপি আলোচনায় এই মন্দিরের প্রাচীনত্ব দেড়শতাব্দী নির্ণীত হইতেছে। নির্ম্মাণের পর ইহার পুনঃ সংস্কার হইবার কোনও প্রমাণ নাই। অবস্থা দৃষ্টে কখনও ইহার সংস্কার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ১৩২৫ বঙ্গাব্দের প্রবল ভূমিকম্পে নিম্নতলের অধিকাংশ ধ্বসিয়া গিয়াছে, এখন ইহার সংস্কার কার্য্য বহু ব্যয় ও কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হয়।

এই মন্দিরের বিবরণযুক্ত একটী শ্লোক কৃষ্ণমালা গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে ; তাহা এই,---

"আসীদ্ ভূমীশবর্য্যঃ কবিকুল-কমলানন্দনাদিত্য মূর্ত্তিঃ
ধীর কৃষ্ণাংঘ্রিপদ্মাসবরসরসিকঃ কৃষ্ণমাণিক্য নামা।
রাজ্ঞী তস্যাতিসাধ্বী বিমলমতিমতী নির্ম্মমে জাহ্নবীদং
শাকে শৈলাঙ্কতকে নৃভৃতি মুররিপোমন্দিরং পঞ্চরত্নং ॥"

মর্ম্ম ;--- কবিকুলরূপ পদ্মের পক্ষে আনন্দদায়ক সূর্য্যস্বরূপ, ধীর স্বভাব, শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ, মগরন্দ রসজ্ঞ, কৃষ্ণমাণিক্য নামে নরপতি ছিলেন। সুনির্ম্মল বুদ্ধিমতী, অতি সাধ্বী, তাঁহার রাজ্ঞী জাহ্নবী ১৬৯৭ শকাব্দে মুরারির প্রীত্যর্থে পঞ্চরত্ন মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

মন্দিরের উপর তলায় শ্রীশ্রীরাধামাধবের যুগল মূর্ত্তি এবং জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দারুময় বিগ্রহ স্থাপন করা হইয়াছিল। মন্দিরটী বিধ্বস্ত হইবার পর সেই সকল বিগ্রহ স্বতন্ত্র গৃহে রক্ষিত ও পূজিত হইতেছেন। মন্দিরটী দক্ষিণ দ্বারী। দুইটী বিশাল বাপীর মধ্যভাগে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বদিকের জলাশয়ের নাম কৃষ্ণসাগর ও পশ্চিমদিকস্থ জলাশয়ের নাম জাহ্নবীসাগর।

এই দেবায়তন ও দীর্ঘিকাদ্বয়ের কথা ত্রিপুর-বংশাবলী গ্রন্থেও উল্লেখ পাওয়া যায় ;—

"তৎপরে নুরনগর রাধানগর গ্রামে।
দুই দীঘি কাটাইল পঞ্চরত্ন সমে ॥*

* সমে—সহিত।

দুই দীঘির মধ্যস্থলে পঞ্চরত্ন দিয়া।
রাধামাধব বুদ্ধদেব* তাহাতে স্থাপিয়া ॥
প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য তবে স্বয়ং করিল।
মহারাণী জাহ্নবায় কীর্ত্তি নিয়োজিল ॥"

দেবার্চ্চন ও অভ্যাগত সন্ন্যাসী মোহান্তগণের সেবায় ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য স্থাপয়িতা কর্ত্তৃক যে দেবোত্তর ভূমি প্রদান করা হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার আয় দ্বারা দেবালয়ের সর্ব্ববিধ ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে। এই ব্যয়ের সম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

"কালিকাগঞ্জেতে রাধামাধব সেবাতে।
কতদূর ভূমি দিছে পুষ্কর্ণী পাড়েতে ॥"

কৃষ্ণমাণিক্য খণ্ড —৫৪ পৃষ্ঠা।

'কৃষ্ণমালা' গ্রন্থে লিখিত আছে ;—

"তবে রাধামোহনের পূজার কারণ।
নিযুক্ত করিয়া দিল পূজক ব্রাহ্মণ ॥
ভূমি দিল দেবোত্তর সনদ করিয়া।
সেই রাধামোহনের সেবার লাগিয়া ॥
পরিচার কতেক করিল নিয়োজন।
দেবালয়ে পরিচর্য্যা করিতে কারণ ॥
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী কিবা সামান্য অতিথি।
যে সকল হয় আসি তথা উপস্থিতি ॥
সে সবার ভক্ষণ সামগ্রী তথা দিতে।
ভাণ্ডার নিযুক্ত করি দিলেক তথাতে ॥
বিমুখ না হয় তথা আসিলে অতিথি।
অদ্যাপি অতিথি সেবা হয় নিতি নিতি ॥"

এই দেবোত্তর ভূমির সনন্দ (তাম্র শাসন) পাওয়া গিয়াছে। তাহা আলোচনায় জানা যায়, রঘুনাথ দাস নামক ব্রজবাসী মোহান্তকে এই দেবালয়ের সেবাইতে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। অদ্যাপি হিন্দুস্থানী সংসার ত্যাগী বৈষ্ণব সাধু পুরুষগণ শিষ্য পরম্পরা এই দেবালয়ের মোহান্তের পদ লাভ করিয়া আসিতেছেন।

উক্ত তাম্র শাসনের দৈর্ঘ্য ১১½ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৫½ ইঞ্চি। ইহাতে ৮ পংক্তিতে সাতটী শ্লোক এবং শাসন সম্পাদনের শকাঙ্ক ও দেবতার সেবাইতের নাম

* জগন্নাথ বিগহকে 'বুদ্ধদেব' বলা হইয়াছে।

ইত্যাদি উৎকীর্ণ হইয়াছে। তাম্র শাসনের বাক্যাবলী নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

Rgd. No. 546
(পারস্য স্বাক্ষর)

মহারাজ
কৃষ্ণমাণিক্যের
পদ্ম মোহর

১ স্বস্তি—যস্যাভূমের্দ্দক্ষিণতো দেবগ্রাম ইতি শ্রুতিঃ তিতাসাখ্যনদী
পশ্চার্দ্দুর্গাপুরাখ্য উত্তরে পূর্ব্বস্যা
২ মচলদ্দেযো মধ্যেচ দীর্ঘিকাদ্বয়ং। তত্তীরে স্থাপিতোদেবো
রাধামোহন সংঙ্গকঃ লক্ষ্মীনা-
৩ রায়ণস্তত্র তয়োঃ পূজার্থ মেব হি। দীর্ঘিকাদ্বয় কেদাবে
যে বসন্তি চ মানবাঃ তেষাং করং পক্ষমিতাং
৪ দ্রোণ ভূমিঞ্চ সাশ্বতীং। প্রাদাত্ শ্রীকৃষ্ণদেবস্ত্রিপুর-
কুলমণির্দ্দানধর্ম্মেযু দক্ষঃ শাকেহঙ্কাষ্টর্তুচন্দ্র
৫ প্রমতি পরিগতে মাঘস্য মন্বাদিকে রাধামোহন তুষ্টয়ে
কৃতিবরঃ সংসারভিত্যাকুল স্তস্মৈ বাহুবলেন
৬ বৈরিবনিতাক্ষ্যাব্ধুতপাড়ুপতিঃ॥ স্ববংশজাতা যে ভূপা
যে কেচিত্ পরবংশজাঃ নিরয়ং যান্ত তে পূব্বের্ম্মম
৭ দত্ত বিনাশকাঃ॥ মদ্দত্ত পালন করা ভূপ বিখ্যাত কীর্ত্তয়ঃ।
করোমি পুরুষৈঃ সার্দ্ধং প্রণামং তেভ্য এব
৮ হি শক ১৬৮৯ রঘুনাথ দাষ ব্রেজবাসি মোহন্তকেই
সেবাতে দেয়া গেলো ।।ঃ ।। ভোগ করিত রহ

এই ফলকের অপর পৃষ্ঠে লিখিত আছে ;—

জাএ	জমি
মৌজে আখাউড়অ—	৪
মৌঃ নারায়ণপুর—	৫
মৌঃ দেবগ্রাম—	৫
মৌঃ চন্দনসার—	১
	১৫
হাট রাধানগর—	

এই তাম্রফলকে ছন্দানুরোধে চরণ বিভাগ করা হয় নাই ; ফলকে এক এক পংক্তিতে যত শব্দ ধরিয়াছে, তাহাই খোদিত হইয়াছে। ছন্দ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া

প্রত্যেক চরণ স্বতন্ত্রভাবে লিপি করিলে যেরূপ দাঁড়াইবে, পাঠ সৌকর্য্যার্থ তাহা এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে।

স্বস্তি— যস্যাভূমের্দ্দক্ষিণতো দেবগ্রাম (১) ইতি শ্রুতিঃ
তিতাসাখ্য (২) নদীপশ্চাদ্দুর্গাপুরাখ্য উত্তরে
পূর্ব্বস্যামচলদ্দেষো (৩) মধ্যে চ দীর্ঘিকাদ্বয়ং।
তত্তীরে স্থাপিতো দেবো রাধামোহন সংঙ্গকঃ (৪)
লক্ষ্মীনারায়ণস্তত্র তয়োঃ পুজার্থ (৫) মেব হি।
দীর্ঘিকাদ্বয় কেদারে (৬) যে বসন্তি চ মানবাঃ
তেষাং করং পক্ষমিতাং দ্রোণ (৭) ভুমিঞ্চ সাশ্বতীং।
প্রাদাৎ শ্রীকৃষ্ণদেবস্ত্রিপুরকুলমণির্দ্দানধের্ম্মেষু দক্ষঃ।
শাকেহঙ্কাষ্টর্তুচন্দ্র (৮) প্রমিত পরিগতে মাঘস্য মন্বাদিকে (৯)
রাধামোহন তুষ্টয়ে কৃতিবরঃ সংসারভিত্যাকুল
স্তস্মৈ বাহুবলের বৈরি বনিতাক্ষ্যাব্ধুত (১০) পাণ্ডুপতিঃ॥
স্ববংশ জাতা যে কেচিৎ পরবংশজাঃ।
নিরয়ং যান্তু তে পূর্ব্বের্ম্মমদত্ত বিনাশকাঃ॥
মদ্দত্ত পালন করা ভূপা বিখ্যাত কীর্ত্তয়ঃ।
করোমি পুরুষৈঃ সার্দ্ধং প্রণামং তেভ্য এব হি॥
শক ১৬৮৯—শ্রীরঘুনাথদায (১১) ব্রেজবাসী (১২) মোহন্তকেই (১৩)
সেবাতে দেয়া (১৪) গেলো (১৫) ।।ঃ ।। ভোগ করিতে রহ

(১) তাম্রশাসন সংশ্লিষ্ট দেবালয়ের এক মাইলের মধ্যে দক্ষিণে দেবগ্রাম অবস্থিত। এখানে এক মহাদেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই বিগ্রহের বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে।

(২) উক্ত স্থানের পশ্চিমদিকে তিতাস নদী প্রবাহমানা। এই নদী ত্রিপুর পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন।

(৩) 'অচলদ্দেষো' বাক্য দ্বারা পার্ব্বত্য প্রদেশ (অরণ্যময় ভূমি) কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই স্থলে তালব্য 'শ' স্থলে মূর্দ্ধন্য 'ষ' ব্যবহৃত হইয়াছে। সে কালে আখাউড়ার পূর্ব্বদিকস্থ স্থানসমূহ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল বলিয়া এরূপ লিখিত হইয়া থাকিবে।

(৪) এস্থলে 'সংজ্ঞকে' শব্দস্থলে 'সংঙ্গকে' অঙ্কিত হইয়াছে।

(৫) 'পূজার্থ' স্থলে 'পুজার্থ' লিখিত হইয়াছে।

(৬) কেদারে—ক্ষেত্রে বা ভূমিতে।

(৭) দ্রোণ—ইহা ভূমির পরিমাণজ্ঞাপক শব্দ। ত্রিপুরায় যে হিসাবে ভূমির পরিমাণ স্থির করা হয়, তাহা এই—২০ ধূরে এক ক্রান্তি, তিন ক্রান্তিতে এক কড়া, চারি কড়ায় এক গণ্ডা, বিশ গণ্ডায় এক কাণি, যোল কাণিতে এক দ্রোণ। ৮ হস্ত পরিমিত নলের ১০x১২ নলে এক কাণি ধরা হয়।

(৮) ইহা তাম্রশাসনের সময় নির্দ্দেশক বাক্য। অঙ্ক—৯, অষ্ট—৮, ঋতু—৬, চন্দ্র—১। 'অঙ্কস্য বামাগতিঃ' এই হিসাবে ১৬৮৯ শক নির্ণীত হইতেছে। শাসনের নিম্নভাগে, অঙ্ক দ্বারাও এই সময় লিখিত হইয়াছে।

তাম্রশাসনের মর্ম্ম

যে ভূমির দক্ষিণ দিকে দেবগ্রাম, পশ্চিমে তিতাস নদী, উত্তরে দূর্গাপুর গ্রাম, পূর্ব্ব দিকে পার্ব্বত্য প্রদেশ, মধ্যভাগে দুইটী দীর্ঘিকা—তাহার তীরে রাধামোহন ও লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল দেবতার পূজার নিমিত্ত, ত্রিপুর কুলমণি, দান ধর্ম্মদক্ষ, কৃতিবর, বাহুবলে বিজিত শত্রুবৃন্দের বনিতাকুলের নেত্র-বারিদ্বারা বিধৌত-পদ ভূপতি শ্রীকৃষ্ণদেব সংসার ভয়াকুল হইয়া, ১৬৮৯ শকে মাঘ মাসের মন্বন্তরা দিনে (মাঘী সপ্তমীতে) রাধামোহনের প্রীতি কামনায়, দীর্ঘিকাদ্বয়ের সন্নিহিত স্থলবাসী মানবগণের দেয় রাজস্ব ও পনেরো দ্রোণ ভূমি চিরস্থায়ীরূপে দান করিলেন। স্ব-বংশসম্ভূত কিম্বা অন্য বংশজাত যে কোনও ভূপতি আমার দান লোপ করিবে, তাহারা তাহাদের ঊর্দ্ধ পুরুষের সহিত নিরয়গামী হইবে। যে সকল বিখ্যাত-কীর্ত্তি ভূপতি আমার দান রক্ষা করিবেন, আমি প্রকৃতিবৃন্দের সহিত তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছি। শক ১৬৮৯। শ্রীরঘুনাথ দাস ব্রজবাসী মোহান্তকেই সেবাতে দেওয়া গেল ॥ ঃ ॥ ভোগ করিতে রহ।

এই তাম্রফলকে যে সকল ভ্রমপ্রমাদ আছে, তাহা রচনাকারী পণ্ডিতের কি খোদাইকারী কর্ম্মকারের ত্রুটীতে ঘটিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে, শেষোক্ত ব্যক্তিদ্বারা প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনাই অধিক। শাসনের ভাষা আলোচনা করিলে বুঝা যায়, ইহার রচয়িতা শ্লোক রচনা কার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন না।

তাম্রফলকের অপর পৃষ্ঠে অঙ্কিত বিবরণ দ্বারা জানা যায়, আখাউড়া, নারায়ণপুর, দেবগ্রাম ও চন্দনসার এই চারিটী মৌজা মধ্যে ১৫ পনর দ্রোণ ভূমি দান করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত রাধানগরের হাটের আয়ও দেবসেবার নিমিত্ত অর্পিত হইয়াছিল।

---

(৯) মন্বাদিক—মন্বন্তরা। এক মনুর লয় ও অপর মনুর আবির্ভাব কালকে মন্বন্তরা বলা হয়। এ স্থলে মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই তিথিকে রথ সপ্তমীও বলে। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে ;—

"যস্মান্নন্বন্তরাদৌতু রথমাপুর্দ্দিবাকরাঃ।
মাঘমাসস্য সপ্তম্যাং তস্মাৎসা রথসপ্তমী।"

ভবিষ্যপুরাণে চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের চতুর্দ্দশটী তিথির নামোল্লেখ পাওয়া যায়, এই গ্রন্থেও মন্বন্তরা মধ্যে—"আষাঢ়স্যাপি দশমী তথা মাঘস্য সপ্তমী" লিখিত হইয়াছে।

(১০) 'অক্ষ্যব্ধুত' শব্দকে 'অক্ষ্যাব্ধুত' করা হইয়াছে। 'ধুত' না হইয়া 'ধূত' হইবে।

(১১) 'দাস' স্থলে 'দাষ' অঙ্কিত হইয়াছে।

(১২) 'ব্রজবাসী' শব্দকে দেশজ ভাষানুসারে 'ব্রেজবাসী' করা হইয়াছে।

(১৩) 'মোহান্ত' স্থলে 'মোহন্ত' শব্দ উৎকীর্ণ হইয়াছে।

(১৪) 'দেওয়া' শব্দ স্থলে 'দেয়া' শব্দ ক্ষোদিত হইয়াছে।

(১৫) 'গেল' স্থলে 'গেলো' লিখিত হইয়াছে।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের অপর কীর্ত্তি—শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা। কুমিল্লা নগরীর পূর্ব্বপ্রান্তে—নগরের উপকণ্ঠে, মহারাজ এক সপ্তদশ রত্ন নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহাতে, জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার দারুময় বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। ত্রিপুরেশ্বরগণ পুরুষানুক্রমে শ্রদ্ধার সহিত এই দেবতার অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন।

এই মঠ সম্বন্ধে পরলোকগত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন,—

"মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য একজন দয়ালু, দাতা ও ধর্ম্ম-নিরত নরপতি ছিলেন। কুমিল্লা নগরীর পূর্ব্ব পার্শ্বে মহারাজ রত্নমাণিক্য যে সতররত্ন নামক দেবমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য সেই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া তাহাতে জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার দারু-মূর্ত্তি সংস্থাপন করেন।"

কৈলাসবাবুর রাজমালা, — ২য় ভাগ, ১১শ অঃ ১৩১ পৃঃ।

'ত্রিপুর বংশাবলী' পুস্তিকায়ও ঐরূপ লিখিত আছে। কিন্তু মহারাজ রত্নমাণিক্য কর্ত্তৃক উক্ত মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইবার কথা ত্রিপুরার অন্য কোনও ইতিহাস-গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই মন্দির সম্বন্ধে রাজমালায় কৃষ্ণমাণিক্য প্রসঙ্গে লিখিত আছে,—

"সত্ররত্ন নির্ম্মাইল জগন্নাথপুরে।
জগন্নাথ মহাপ্রভূ স্থাপিত উপরে॥"

কৃষ্ণমাণিক্য খণ্ড—৫৪ পৃষ্ঠা।

শ্রেণীমালা গ্রন্থে কৃষ্ণমাণিক্য প্রসঙ্গে পাওয়া যায়,—

"নিজে পুষ্করিণী এক দিলেন রাজন।
জগন্নাথ বাটীতে দিল সতররতন॥
* * * *
জগন্নাথ দেব স্থাপন সেখানে করিল।
বাটীর পশ্চিমে এক সরোবর দিল।

'কৃষ্ণমালা' এক বিস্তৃত গ্রন্থ, ইহা একমাত্র মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের বিবরণ লইয়া রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে উক্ত মন্দিরের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

"চন্তাই কহেন পুনি শুন নরপতি।
সতররত্নের কথা কহিব সংপ্রতি॥
শ্রীকৃষ্ণমাণিক্য রাজা অতি মতিমান।
মনে হৈল এক মঠ করিতে নির্ম্মাণ॥
মঠে জগন্নাথ মূর্ত্তি করিব স্থাপন।
ইহা মনে করিয়া করিল আয়োজন॥

দিয়াছে তড়াগ পূর্ব্বে জগন্নাথপুরে।
নির্ম্মাইল সপ্তদশ রত্ন তার তীরে॥
এক মঠে সপ্তদশ মঠের গঠন।
সপ্তদশ রত্ন নাম হৈল সে কারণ॥
একশত হস্ত পরিমাণ মঠ উভে।
নানা মূর্ত্তি চিত্র তাহে ঠাঁই ঠাঁই শোভে॥
সুবর্ণমণ্ডিত তাম্র ঘট সারি সারি।
বসাইছে ঠাঁই ঠাঁই মঠের উপরি॥"

মঠটী সপ্তদশ চূড়াবিশিষ্ট, এজন্য ইহার নাম সপ্তদশ রত্ন বা সতররত্ন হইয়াছে। মন্দিরের প্রধান চূড়াটী একশত হস্ত পরিমিত উচ্চ ; ইহার নিম্নতলের গঠন অষ্টকোণ বিশিষ্ট এবং ইহার ভিত্তি সুবিস্তৃত। মন্দিরটী ত্রি-তল বিশিষ্ট মধ্যতলটী দরজা-জানলাবিহীন গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন। একতল হইতে অন্য তলে উঠিবার শিড়ি ভিতরের দিকে, চর্তুদিকের দেয়ালের সহিত সংলগ্নভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমে উপরের দিকে উঠিয়াছে। ইহার গঠন-নৈপুণ্য দর্শনে আধুনিক স্থাপত্য শিল্পীগণ বিস্মিত হইয়া থাকেন। সলরজঙ্গ্ মহারাজ রাজবল্লভ সেন রায় রায়ানের বাড়ীতে অবিকল এই প্রণালীতে গঠিত একটী মঠ ছিল, তাহা অনেককাল পূর্ব্বে পদ্মানদীর উদরসাৎ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন এই প্রণালীর অন্য কোনো মঠের কথা শুনা যায় না। এই মন্দিরের বহির্ভাগস্থ চতুস্পার্শ্বের দেয়াল গাত্রে নানাবিধ দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তির সহিত কতিপয় অশ্লীলভাবব্যঞ্জক মূর্ত্তিও অঙ্কিত রহিয়াছে। কোনো কোনো প্রসিদ্ধ তীর্থ-ক্ষেত্রের দেব মন্দিরেও এবম্বিধ অশ্লীল-চিত্রাঙ্কিত থাকিবার বিষয় অনেকেই অবগত আছেন ; এ স্থলে পুরীধামের শ্রীমন্দিরের নাম উল্লেখযোগ্য। এরূপ করিবার প্রয়োজনীয়তা বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা এ স্থলে সম্ভবপর নহে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত কৃষ্ণমালার বাক্যে জানা যায়, মঠের চূড়াগুলি সুবর্ণমণ্ডিল তাম্র-ঘট দ্বারা সজ্জিত ছিল। 'ত্রিপুর বংশাবলী' গ্রন্থের মতে ঐ সকল ঘট বা কলসী সুবর্ণনির্ম্মিত ছিল। এতদুভয় গ্রন্থের বাক্য পরস্পর ভিন্ন ভাবাপন্ন হইলেও সমগ্র অবস্থা আলোচনা করিলে ইহার সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতে পারে।

প্রবাদ বাক্যে জানা যায়, এই মন্দির নির্ম্মাণ কালে প্রধান রাজমিস্তিরী অন্যের অগোচরে, মন্দিরের প্রধান চূড়াটির গোড়া হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত শ্রেণীবদ্ধরূপে কতিপয় গর্ত্ত রাখিয়াছিল। তৎপর চূড়াস্থিত সুবর্ণ ঘট অপহরণ করিবার লালসায় একদা রাত্রিকালে সিঁড়ির সাহায্যে উপর তলে উঠিয়া, তথা হইতে পূর্ব্বোক্ত গর্ত্তসমূহে ক্রমে ক্রমে লৌহকীলক প্রোথিত করিয়া তদপুরি পদস্থাপনপূর্ব্বক, ক্রমশঃ চূড়ার অগ্রভাগে উঠিয়াছিল। দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ সে পদ স্খলিত

হইয়া নীচে পড়িয়া যায়, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু ঘটে। রাজমিস্তিরী উপর তলার ছোট ছোট চূড়াগুলির ঘট অনায়াসেই চুরি করিতে পারিত, সেগুলি উপেক্ষা করিয়া, প্রধান চূড়ার প্রতি পূর্ব্ব হইতেই তাহার লুব্ধ দৃষ্টি থাকায় ইহাই বুঝা যায়, প্রধান চূড়ার ঘটটী সুবর্ণনির্ম্মিত এবং অন্যগুলি সুবর্ণমণ্ডিত হইলেও তাম্র নির্ম্মিত ছিল। মিস্তিরীর ইহা পূর্ব্বাবধি জানা থাকাতেই অন্য ঘটগুলি লইবার চেষ্টা না করিয়া, প্রধান চূড়াস্থিত ঘটটী চুরি করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। এই ঘটনার পর সেই লোভনীয় বস্তুর বিনিময়ে সুবর্ণমণ্ডিত তাম্রঘট স্থাপিত হইয়াছে।

প্রধান চূড়ার গাত্রে প্রোথিত-লৌহকিলকসমূহ অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া উক্ত বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। সপ্তদশ রত্নের অবস্থা ভাল থাকা কালেই স্বতন্ত্র একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, সেই মন্দিরে দেবতা স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। শুনা যায়, মন্দিরের চূড়া হইতে পতিত হইয়া লোকের অপমৃত্যু হওয়ায় উক্ত মন্দির অপবিত্র বোধে ত্যাগ করা হইয়াছে। বাস্তব, বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত এমন সুরম্য মন্দির পরিত্যাগ করিয়া, স্বতন্ত্র দেবায়তন নির্ম্মাণের কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না। এই সকল হেতুতে স্বর্ণ-কলস চুরির প্রবাদ বাক্য সত্য বলিয়াই বুঝা যাইতেছে।*

এই মন্দির ১১৮৮ ত্রিপুরাব্দে (১৭০০ শক) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজমালায় পাওয়া যায়,—

"এগার শ আটাশি যে সনের সমএ।
প্রতিষ্ঠা করএ রাজা ধর্ম্মের তনএ ॥"

কৃষ্ণমাণিক্য খণ্ড—৫৪ পৃষ্ঠা।

কৃষ্ণমালা গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"সপ্তদশ শত সংখ্য শকের সময়।
চৈত্রমাসে প্রতিষ্ঠা করিল দেবালয় ॥"

১১৮৮ ত্রিপুরাব্দে ও ১৭০০ শকে পার্থক্য নাই। সুতরাং এই দেবায়তন দেড় শতাব্দীর প্রাচীন কীর্ত্তি। মন্দিরটী এত দৃঢ় যে বারম্বার প্রবল ভূমিকম্পের বেগ সহ্য করিয়াও আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু সংস্কার অভাবে এবং বারম্বার প্রবল ভূমিকম্পের ফলে এই মন্দিরের যে গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সংশোধনের উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না।

---

* ঐতিহাসিকগণ পূর্ব্বে প্রবাদ বাক্য গ্রাহ্য করিতেন না। ক্রমশঃ ভূ-পৃষ্ঠে প্রোথিত নানাবিধ বস্তুর আবিষ্কার হওয়ায় এবং তৎসহ প্রবাদ বাক্যের সামঞ্জস্য লক্ষিত হওয়ায় বর্ত্তমানকালে প্রবাদ বাক্যকে ইতিহাসের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রবাদ বাক্য রঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু কোনো প্রবাদই অমূলক নহে। সুতরাং তাহার ঐতিহাসিক ভিত্তি অস্বীকার করা যাইতে পারে না।

এই মন্দির সম্বন্ধে প্রাচ্য স্থাপত্য বিদ্যা বিশারদ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন,—

"কুমিল্লার 'সতররত্ন' মন্দির বাংলার স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাহার গঠন নৈপুণ্যে বিস্মিত হইতে হয়। ফার্গুসন, হ্যাবেল প্রভৃতির গ্রন্থে উহার উল্লেখ হয় নাই কেন, বুঝিতে পারা যায় না। সংস্কারের অভাবে এই অতুলনীয় মন্দির ধ্বংসের কবলে পড়িয়াছে।"

রবি—৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

এই মন্দিরের উত্তর দিকে সিংহদ্বার ছিল, এখন তাহার ভগ্নস্তূপ মাত্র বিদ্যমান আছে। কৃষ্ণমালা গ্রন্থে এই সিংহদ্বারের বিবরণ পাওয়া যায় ;—

"দুই দিকে দুই মূর্ত্তি সিংহের আকার।
মঠের উত্তরে নির্ম্মাইছে সিংহদ্বার ॥"

এই মন্দিরগাত্রে শিলালিপি নাই। এমন একটী শ্রেষ্ঠ মন্দিরে তাহা না থাকা সম্ভবপর নহে। বোধ হয় সিংহদ্বারে প্রস্তরফলক সংযোজিত ছিল, সেই দ্বারের সঙ্গে সঙ্গে শিলাখণ্ডও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ত্রিপুরায় মন্দিরের সিংহদ্বারে শিলালিপি সংযোজনের দৃষ্টান্ত অন্যত্রও পাওয়া যায় ; উদয়পুরস্থ মহাদেব বাড়ীর সিংহদ্বারে সংযোজিত শিলালিপির কথা এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দারুময় মূর্ত্তি এই মন্দিরের অধিষ্ঠিত বিগ্রহ। মূর্ত্তিত্রয় শ্রীক্ষেত্রের বিগ্রহের অনুকরণে গঠিত ; কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে, পুরীধামের বিগ্রহের ন্যায় এই সকল মূর্ত্তির হস্ত অঙ্গুলী বিবর্জ্জিত নহে, সকল মূর্ত্তির হাতেই অঙ্গুলী আছে। এই বিশেষত্বের দরুন অনেকে মনে করেন, ইহা রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু 'কৃষ্ণমালা' গ্রন্থ আলোচনা করিলে এই সংশয় নিরাশিত হইবে। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে,—

'এইরূপে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া।
দেবতা স্থাপন তাহে করিলেক নিয়া ॥
বলভদ্র জগন্নাথ সুভদ্রা সহিত।
সপ্তদশ রত্নে রাজা করিল স্থাপিত ॥
অপরূপ তিন মূর্ত্তি কি দিব উপম।
জগন্নাথ সুনীল-জলদ জিনি শ্যাম ॥
শরতকালে মেঘ যেমন ধবল।
তেন মত বলভদ্র শরীর উজ্জ্বল ॥
মধ্যে সুভদ্রার মূর্ত্তি গৌরবর্ণ কায়া।
ভূবনমোহন রূপ যেন মহামায়া ॥

এই তিন মূর্ত্তি মঠে করিয়া স্থাপন।
পরম আনন্দ হৈল নৃপতির মন॥"

এই বর্ণনা পাঠ করিলে বিগ্রহের প্রতি রাম-লক্ষ্মণনাদির আরোপ হইতে পারে না। বিশেষতঃ দেবতার গঠন ও অর্চ্চনা পদ্ধতি ইত্যাদি সমস্তই উড়িষ্যার শ্রীমন্দিরের অনুরূপ। উৎকল দেশীয় ব্রাহ্মণ (পাণ্ডা) গণ এই দেবতার পূজক, দেবতা প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ইঁহারা অর্চ্চনার ভার পাইয়াছেন।

জগন্নাথ প্রতিষ্ঠা এক সুবিখ্যাত ঘটনা ; এরূপ সমারোহ ব্যাপার ত্রিপুরায় অতি অল্পই ঘটিয়াছে। এই সময় পঞ্চাগ্নি, দানসাগর, তুলাপুরুষ দান ইত্যাদি বিস্তর পূণ্যকার্য্যানুষ্ঠিত হইয়াছিল, তদ্বিবিরণ যথাস্থানে বিবৃত হইবে। মন্দিরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত সরোবরও এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার গর্ব্ভে একটী ইষ্টকময় প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে পঞ্চ-তীর্থের জল স্থাপিত হইয়াছিল। তদবধি এই বাপী পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। অদ্যাপি রথ দ্বিতীয়া দিনে এবং অন্যান্য তীর্থ-স্নানের তিথিতে এখানে বহু সংখ্যক যাত্রীসমাগম হয়, তাহারা এই সরোবরে স্নানান্তে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকে।

জগন্নাথ দেবের সেবা পূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য কিঞ্চিদধিক ১৫ দ্রোণ ভূমি দেবোত্র সূত্রে প্রদান করিয়াছিলেন। এই দেবোত্র ভূমির সংশ্লিষ্ট তাম্রশাসন ১১৮৬ ত্রিপুরাব্দে সম্পাদিত হইয়াছে। রাজমালায় পাওয়া যায়,—

"জগন্নাথ মহাপ্রভু স্থাপিত যখন।
জগন্নাথপুরে ভূমি দিয়াছে রাজন॥"

কৃষ্ণমাণিক্য খণ্ড—৫৫ পৃষ্ঠা।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, সতররত্ন মঠ ১১৮৮ ত্রিপুরাব্দে (১৭০০ শকে) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাম্রশাসন আলোচনায় জানা যাইতেছে, জগন্নাথ বিগ্রহের সেবার্থ ১১৮৬ ত্রিপুরাব্দে (১৬৯৮ শকে) ভূমি দান করা হইয়াছিল। অথচ রাজমালার বাক্য আলোচনায় জানা যায়, জগন্নাথ বিগ্রহ স্থাপনের সময়ই দেবোত্র ভূমি প্রদান করা হইয়াছে। এই সকল বিবরণ আলোচনা করিলে বুঝা যায়, সতররত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পূর্ব্বে জগন্নাথ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, তদুদ্দেশ্যে দেবোত্র ভূমি প্রদান করা হইয়াছিল, মন্দির নির্ম্মিত হইবার পরে (১৭০০ শকে) সেই বিগ্রহ সপ্তদশ রত্নে নীত হইয়াছেন। দেবতা স্থাপনের পূর্ব্বে তদুদ্দেশ্যে ভূমি দান করা সম্ভবপর নহে, সুতরাং ১৬৯৮ শকে বিগ্রহ স্থাপিত এবং তৎপর ১৭০০ শকে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এরূপ নির্দ্ধারণ করাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব্বোক্ত দেবোত্র ভূমি সংশ্লিষ্ট তাম্রশাসনের প্রতিলিপি পরপৃষ্ঠায় প্রদান করা যাইতেছে।

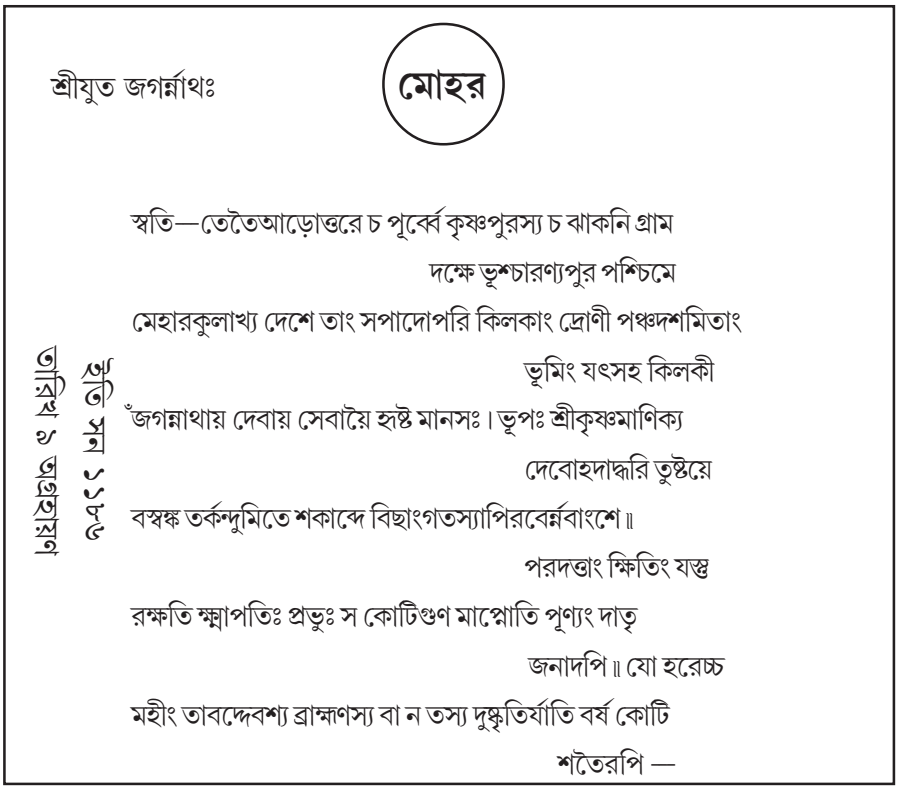

শ্রীযুত জগন্নাথঃ

মোহর

শ্রী সন ১১৮৬

তারিখ ৮ অগ্রহায়ণ

স্বতি—তেতৈআড়োত্তরে চ পূর্ব্বে কৃষ্ণপুরস্য চ ঝাকনি গ্রাম
দক্ষে ভূশ্চারণ্যপুর পশ্চিমে
মেহারকুলাখ্য দেশে তাং সপাদোপরি কিলকাং দ্রোণী পঞ্চদশমিতাং
ভূমিং যৎসহ কিলকী
ঁজগন্নাথায় দেবায় সেবায়ৈ হৃষ্ট মানসঃ। ভূপঃ শ্রীকৃষ্ণমাণিক্য
দেবোহদাদ্ধরি তুষ্টয়ে
বস্বঙ্ক তর্কন্দুমিতে শকাব্দে বিছাংগতস্যাপিরবের্ন্নবাংশে॥
পরদত্তাং ক্ষিতিং যস্তু
রক্ষতি ক্ষ্মাপতিঃ প্রভুঃ স কোটিগুণ মাপ্নোতি পূণ্যং দাতৃ
জনাদপি॥ যো হরেচ্ছ
মহীং তাবদ্দেবশ্য ব্রাহ্মণস্য বা ন তস্য দুষ্কৃতির্যাতি বর্ষ কোটি
শতৈরপি —

ছয় পংক্তিতে এই শাসন-লিপি সম্পাদন করা হইয়াছে। ইহাতে ছন্দানুযায়ী পংক্তি বিভাগ করা হয় নাই। তাহা করিলে, উৎকীর্ণ শ্লোকগুলি নিম্নলিখিতরূপ দাঁড়াইবে।

"তেতৈআড়োত্তরে (১) যা চ পূর্ব্বে কৃষ্ণপুরস্য চ
ঝাকনি গ্রাম দক্ষে ভূশ্চারণ্যপুর পশ্চিমে
মেহারকুলাখ্য দেশে তাং সপাদোপরি কিলকাং (২)
দ্রোণী পঞ্চদশমিতাং ভূমি যৎসহ কিলকী
ঁজগন্নাথায় দেবায় সেবায়ৈ হৃষ্ট মানসঃ
ভূপঃ শ্রীকৃষ্ণমাণিক্য দেবোহদাদ্ধরি তুষ্টয়ে
বস্বঙ্ক তর্কন্দুমিতে (৩) শকাব্দে বিছাং গতস্যাপি রবের্ন্নবাংশে॥
পরদত্তাং ক্ষিতিং যস্তু রক্ষতি ক্ষ্মাপতিঃ প্রভুঃ।
স কোটি গুণমাপ্নোতি পুণ্যং দাতৃ জনাদপি॥
যো হরেচ্ছ মহীং তাবদ্দেবস্য ব্রাহ্মণস্য বা
ন তস্য দুষ্কৃতির্যাতি বর্ষকোটি শতৈরপি—

(১) 'তেতৈয়াড়া' শব্দে অন্তস্থ 'য়' স্থলে 'অ' ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২) 'কীলকাং' স্থলে 'কিলকাং' উৎকীর্ণ হইয়াছে।

(৩) ইহা তাম্রশাসন সম্পাদনের কাল নির্দ্দেশক বাক্য। বসু—৮, অঙ্ক—৯, তর্ক—৬ ইন্দু—১। 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' এই নিয়মে ১৬৯৮ শক নির্দ্ধারিত হইতেছে।

মর্ম্ম ;— মেহারকুল পরগণার অন্তর্গত তেতৈয়াড়ার উত্তর, কৃষ্ণপুরের পূর্ব্ব, ঝাকনি গ্রামের দক্ষিণ, অরণ্যপুরের পশ্চিম, পনর দ্রোণ পরিমিত ভূমি স্তম্ভদ্বারা চিহ্নিত করিয়া, সেই স্তম্বসহ রাজা কৃষ্ণমাণিক্য দেব হরির প্রীত্যর্থে ১৬৯৮ শকের — ৯ই অগ্রহায়ণ তারিখে হৃষ্টচিত্তে জগন্নাথ দেবকে দান করিলেন।

যে ভূপতি পরদত্ত ভূমি রক্ষা করেন, তিনি দাতা অপেক্ষাও কোটিগুণ পূণ্য লাভ করেন। যিনি দেবতা কিম্বা ব্রাহ্মণের ভূমি অপহরণ করেন, শতকোটি বর্ষেও তাহার দুষ্কৃতি মোচন হয় না।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ স্থাপনের সময় হইতে, দেবালয় সহ তৎচতুষ্পার্শ্বস্থ ভূ-ভাগ 'জগন্নাথপুর' আখ্যা লাভ করিয়াছে।

এই জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উল্লেখযোগ্য মহোৎসব। দেবতা প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই এই উৎসব, পূর্ণ আড়ম্বরের সহিত নির্ব্বাহিত হইতেছে। এই রথ বার চাকাবিশিষ্ট। ইহার পরিসর ২৭′ x২৭′ ফুট, উচ্চতা ৩৩′ ফুট। প্রতি বৎসর নবনির্ম্মিত রথদ্বারা উৎসব সমাহিত হয়, এক বৎসরের ব্যবহৃত রথ বা তাহার কোনও সরঞ্জাম পরবর্ত্তী বর্ষে ব্যবহার করা হয় না। এই সময় কুমিল্লানগরী বহু জনাকীর্ণ হইয়া থাকে। ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলার বিস্তর যাত্রীর সমাগম হয়। সাধারণের বিশ্বাস, রথাযাত্রার সময় এই পুণ্যক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রের ন্যায় মাহাত্ম লাভ করে। এই বিগ্রহ, পুরীধামের শ্রীমূর্ত্তি অঙ্গ স্পর্শ করাইয়া আনিয়া স্থাপন করা হইয়াছে। এবং দেবালয়ের পশ্চিম দিকস্থ জলাশয়ের গর্ভে একটী ইষ্টক নির্ম্মিত কুঠরীতে পঞ্চতীর্থের বারি স্থাপনা করা হইয়াছে। তদ্বেতু এই দেবলায় তীর্থের সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছে। চট্টগ্রাম বিভাগে কুমিল্লার রথযাত্রা এক বিরাট উৎসব বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

আখাউড়ার পশ্চিমদিকস্থ দুর্গাপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ মূর্ত্তি মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের অন্যতম কীর্ত্তি। এই দেবালয় 'দুর্গাপুরের আখড়া' নামে অভিহিত হইতেছে।

জলাশয় প্রতিষ্ঠা

পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের বিবরণে দেখা গিয়াছে, জলাশয় খনন ও তৎপ্রতিষ্ঠা ত্রিপুর-ভূপতিবৃন্দের বংশানুক্রমিক ধর্ম্ম। রাজমালা চতুর্থ লহরেও এই ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের বিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। এ স্থলে তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করা যাইতেছে।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য, সীতাকুণ্ড তীর্থে মোহান্তের বাড়ীর সন্নিকটে এক দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, তাহা অত্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। তিষ্ণা পরগণার অন্তর্গত বাতিসা গ্রামে বৈদ্যের বাজারের সন্নিহিত স্থানে তাঁহার খনিত আর এক সরোবর আছে, তাহার জল অতি নির্ম্মল ও সুপেয়। এই সরোবরের উত্তর তীরে একটী ডাক বাংলা স্থাপিত রহিয়াছে।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের মহিষী মহারাণী গুণবতী, কসবা থানার অধীন জাজীয়াড়া গ্রামে এক দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি 'গুণসাগর' নামে পরিচিত হইয়া থাকে। চৌদ্দগ্রামে বর্ত্তমান পুলিশ ষ্টেশনের সন্নিকটে এই মহারাণীর আর একটা দীর্ঘিকা আছে, তাহাও 'গুণসাগর' নামে পরিচিত। কোনো কোনো ব্যক্তি প্রকৃত তথ্য অজ্ঞাত হেতু ইহাকে 'গুণমাণিক্যের দীঘি' বলিয়া থাকে। এই মহারাণীর নামানুসারে তিষ্ণা পরগণায় একটী গ্রামের নাম 'গুণবতী' রক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে, এই গ্রামে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের একটী ষ্টেশন স্থাপিত হওয়ায়, সেই ষ্টেশনের নাম 'গুণবতী' হইয়াছে।

গোবিন্দমাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভাতা মহারাজ ছত্রমাণিক্য, উদয়পুরে এক সরোবর খনন করাইয়াছিলেন, তাহা 'ছত্রসাগর' নামে পরিচিত হইতেছে। এই সরোবরের পরিসর ২৭০ x১৪০ গজ। জলাশয়টী দক্ষিণ চন্দ্রপুর গ্রামে অবস্থিত।

গোবিন্দমাণিক্যের সহোদর ভ্রাতা জগন্নাথঠাকুর কৃতী পুরষ ছিলেন। তিনি তিষ্ণা পরগণায়, কেচকিমুড়া গ্রামে এক বিশাল সরোবর খনন করিয়াছিলেন, তাহা 'জগন্নাথ দীঘি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কুমিল্লা হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত প্রসারিত রাজবর্ত্মের পূর্ব্বপার্শ্বে এই সরোবর অবস্থিত। এই বিশাল বাপীর পশ্চিম পাড়ের উপর দিয়া উক্ত সড়ক চলিয়া গিয়াছে। এই সরোবরের দৈর্ঘ্য কিঞ্চিন্ন্যূন এক মাইল, দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্থ অপেক্ষাকৃত অল্প। জগন্নাথ ঠাকুর উদয়পুরেও এক দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, তাহা জগন্নাথ দীঘি বা পুরাতন দীঘি নামে প্রখ্যাত। এই জলাশয় সোনামুড়া মৌজায় অবস্থিত। ইহার পরিসর ৭৫৪x২১৮ গজ। এই দীর্ঘিকার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পূর্ব্বকথিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। সরকারী অফিস ইত্যাদি ইহার উত্তর তীরে সংস্থাপিত হইয়াছে। এই দীর্ঘিকার তীরে অবস্থিত শিলাময় জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে জগন্নাথ ঠাকুরও ভ্রাতার সহযোগী ছিলেন, মন্দিরের শিলালিপি আলোচনায় ইহা জানা যাইতেছে।

মহারাজ রামমাণিক্য নুরনগর পরগণার অন্তর্গত মাইজখাড় গ্রামে একটী সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। উদয়পুরস্থ দক্ষিণ চন্দ্রপুর গ্রামে তাঁহার আরও দুইটী জলাশয় আছে। এই সরোবরত্রয় 'রাম সাগর' নামে অভিহিত হইয়া

থাকে।* রামমাণিক্যের খনিত উদয়পুরস্থ দীর্ঘিকার মধ্যে একটী খিলপাড়া মৌজায় অবস্থিত, তাহার পরিসর ২৫০ x১৬৫ গজ। দক্ষিণ চন্দ্রপুর গ্রামে অবস্থিত দ্বিতীয় সরোবরের পরিসর ৮০ x ৬০ গজ।

মহেন্দ্রমাণিক্য কর্ত্তৃক উদয়পুরে খনিত জলাশয় খিলপাড়া গ্রামে অদ্যাপি বিদ্যামান রহিয়াছে। তাহার নাম 'মহেন্দ্র সাগর'। এই দীর্ঘিকার পরিসর ২৭০x১৪০ গজ। মহারাজ দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণিক্যের প্রতিষ্ঠিত 'ধর্ম্মাসাগর' মাতারবাড়ী মৌজায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার পরিসর ১৩০x ৬০ গজ। কুমিল্লার সুবিখ্যাত ধর্ম্মসাগরও ইঁহার খনিত বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নির্দ্ধারণ যে প্রমাদপূর্ণ, উক্ত সাগর উৎসর্গকালে সম্পাদিত ব্রহ্মোত্র ভূমির তাম্রশাসন সম্পাদনের কাল আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্টতঃ হৃদয়ঙ্গম হইবে। উক্ত শাসনের প্রতিলিপি রাজমালা প্রথম লহরে প্রদান করা হইয়াছে।

ধর্ম্মমাণিক্যের মহিষী মহারাণী সুভদ্রা (পরবর্ত্তী নাম ধর্ম্মশীলা) কুমিল্লায় এক সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন, তাহা 'নানুয়ার দীর্ঘি নামে পরিচিত। এতৎসম্বন্ধে শ্রেণীমালা গ্রন্থে লিখিত আছে ;—

"ধর্ম্ম মাণিক্য নৃপ ছিল পুণ্যবান।
মুকুন্দের যুবরাজ ভ্রাতৃ যে তাহান ॥
ধর্ম্মশীলা রাণী নামে দীর্ঘিকা খনিল।
কুমিল্লাতে নানুয়ার দীঘি নাম হৈল ॥"

শ্রেণীমালা।

এই উক্তিদ্বারা জানা যাইতেছে, যুবরাজ ধর্ম্মদেবের মহিষী ধর্ম্মশীলাদেবী এই সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। সেকালে যুবরাজের রাণীকে "নানুয়া" বলা হইত।† এই কারণেই উক্ত সরোবরের 'নানুয়ার দীঘি' নাম হইয়াছে।

মহারাজ মুকুন্দমাণিক্য তিষ্ণা পরগণার অন্তর্গত ফাল্গুনকরা গ্রামে এক দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। এই দীর্ঘিকা চৌদ্দগ্রাম বাজার ও বৈদ্যের বাজারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে রাজবর্ত্মের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। এই সরোবরের পূর্ব্ব পাড় দিয়া সড়ক নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত সরোবরের নাম মুকুন্দসাগর, কিন্তু বর্ত্তমান কালে

---

* "রামমাণিক্য দেব নৃপতি হইল।
মেহেরকুল সীমানাতে দীর্ঘিকা এক দিল ॥
উদয়পুরেতে এক খনাইল সাগর।
রামসাগর নাম রাখিল তৎপর ॥"

শ্রেণীমালা।

† "দুর্গারাম ভগ্নী রত্নমালা যেন ছিল।
হরিমণি যুবরাজের নানুয়া কহিল ॥"

শ্রেণীমালা।

ইহা সাধারণের নিকট 'ফাল্গুনকরার দীঘি' নামে পরিচিত হইতেছে। মহারাজ মুকুন্দ, উদয়পুরেও জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। রাজমালায় লিখি আছে,—

"উদয়পুর তিষিণা ফাগুনকরা গ্রাম।
সাগর খনিল রাজা মুকুন্দ সাগর নাম॥"

মুকুন্দমাণিক্য খণ্ড—৩৩ পৃষ্ঠা।

শ্রেণীমালা গ্রন্থেও ফাল্গুনকরার দীঘির উল্লেখ পাওয়া যায়,—

"মুকুন্দমাণিক্য নামে হইয়া রাজন।
তিঞা ফাল্গুনকরা দীঘি দিলেন তখন॥"

শ্রেণীমালা।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য কর্ত্তৃক কালিকাগঞ্জে (পরবর্ত্তী নাম রাধানগর) রাধামাধব বিগ্রহ স্থাপিত ও মন্দির নির্ম্মিত হইবার বিবরণ পূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে। এই দেবায়তনের পূর্ব্বে ও পশ্চিম পার্শ্বে দুইটী বিস্তৃত সরোবর শোভা পাইতেছে। এই সরোবরদ্বয় মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের কীর্ত্তি। উক্ত মহারাজের চরিতাখ্যান 'কৃষ্ণমালা' গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"তারপরে নুরনগরেতে নৃপতি।
খনায় কালিকাগঞ্জে দুই পুষ্করিণী॥
সেই দুই পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা কারণ।
নিমন্ত্রিয়া আনি নানা দেশী দ্বিজগণ॥
* * * *
আপনি বসিয়া রাজা আর রাজ রাণী।
উৎসর্গিল দুই জনে দুই পুষ্করিণী॥
* * * *
শক ষোলশত সাতাশি বৎসরেতে।
প্রতিষ্ঠা করিল বাপী ফাল্গুন মাসেতে॥"

কৃষ্ণমালা।

রাজমালায়ও এই সরোবরদ্বয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় ;—

"কালিকাগঞ্জে দুই দীঘি খনিল রাজন।
রাজা রাণী উৎসর্গিল ইষ্টে সমর্পণ॥
এগার শ পঁচাত্তর সনের যে মাঝে।
ফাল্গুনেতে প্রতিষ্ঠা করয়ে মহারাজে॥"

কৃষ্ণমাণিক্য খণ্ড—৫২ পৃষ্ঠা।

পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে, ১৬৯৭ শকে (১১৮৫ ত্রিপুরাব্দ) শ্রীশ্রীরাধামাধব বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উদ্ধৃত বাক্যে জানা যাইতেছে ১৬৮৭ শকে (১১৭৫ ত্রিপুরাব্দে) দীর্ঘিকাদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দিরের পূর্ব্বদিকের দীর্ঘিকার নাম কৃষ্ণসাগর ও পশ্চিমদিকের জলাশয় জাহ্নবী সাগর নামে পরিচিত। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ বাপী মহারাজ কর্ত্তৃক উৎসর্গিত হইয়াছিল।

মহারাণী জাহ্নবী মহাদেবী কুমিল্লা নগরীতে এক দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, তাহা 'রাণীর দীঘি' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। অল্পকাল পূর্ব্বেও একমাত্র এই

দীর্ঘিকার সুপেয় ও স্বাস্থ্যকর জলদ্বারা অধিকাংশ লোকের জীবন রক্ষা হইতেছিল। বর্ত্তমান কালে সহরের আরও কতিপয় সুবৃহৎ জলাশয় 'রিজার্ভ' করা হইয়াছে এবং কলের জল ব্যবহৃত হইতেছে ; ইহা সত্ত্বেও দীর্ঘিকার গৌরব ও আদর পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত রাজ পরিবারস্থ বহু ব্যক্তি নানাস্থানে বিস্তর জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এস্থলে তাহার সম্যক উল্লেখ করা অসম্ভব। বর্ত্তমান কালে এই ধর্ম্মনিষ্ঠা পরিবারের প্রদত্ত অনেক জলাশয় ভরাট হইয়া শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, অনেক জলাশয় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহা কোন মহাপুরুষের কীর্ত্তি জানা যাইতেছে না, এই সকল কীর্ত্তির কর্ত্তার নাম বিস্মৃতি-গর্ত্তে নিহিত হইযাছে।

ভূমিদান

দেব সেবা ও ব্রাহ্মণ পোষণার্থ দেবোত্র ও ব্রহ্মোত্র সূত্রে নিষ্কর ভূমি দান করা ত্রিপুর রাজবংশের এক বিখ্যাত ও পূণ্যময় কীর্ত্তি। সকল ভূপতিই অল্পাধিক পরিমাণে এই পারমার্থিক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহার সম্পাদিত অনেক সনন্দ ও তাম্রশাসন দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের প্রদত্ত কতিপয় তাম্রশাসন ও সনন্দের বিবরণ এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে। তিনি শুকদেব শর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে এক খণ্ড তাম্রশাসন দ্বারা ব্রহ্মোত্র ভূমি দান করিয়াছিলেন। উক্ত সনন্দ ১০৭৯ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯১ শক) সম্পাদিত হইয়াছিল। সনন্দের লিপি নিম্নে প্রদান করা

মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের তাম্রশাসন

ৎ্ বিষ্ণু

শ্রীরাম সত্য জয়

শ্রীরাম সত্য

স্বস্তি—শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য দেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি রাজনামাদেশোয়ং (১) শ্রীকারকোনবর্গে (২) বিরাজতেহন্যতৎ রাজধানী হস্তিনাপুর (৩) সরকার উদয়পুর (৪) পরগণে মেহেরকুল মৌজে ফুলতলী হাসিল ।। ৬ ।। ০ ছয় দ্রোণ আষ্ট কাণি (৫) ভূমি ৎ্ প্রিতে (৬) ব্রহ্মোত্তর শ্রীশুকদেব শর্ম্মাকে দিলাম এহি ভূমি নিজ হস্তে হাল চাষ করাইয়া পরম সুখে ভোগ করৌক এহি ভূমির মাল খাজানা ও পাচাপঞ্চক (৭) ভেট (৮) বেগার (৯) বীরসিংহ (১০) সম (স্ত মা) না (১১) ইতি সহ ১০৭৯ তেরিখ ১১ কার্ত্তিক শক ১৫৯৮ শন তেরিখ ১ চৈত্র (১২)

গেল। এই তাম্র শাসনের আলোচ্য বিষয়গুলির বিবৃতি নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;—

(১) শাসনের প্রথমাবধি "রাজানামাদেশোয়ং" শব্দ পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষা, ইহার পর 'কারকন' শব্দ পারস্য ভাষাজাত, তাহার সহিত 'বর্গে' সংস্কৃত শব্দ যোগ করা হইয়াছে। এই ভাবে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষার সংমিশ্রণে তাম্রশাসনখানা সম্পাদিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ণাশুদ্ধি বিস্তর আছে।

(২) 'কারকন বর্গে বিরাজতে' বাক্য দ্বারা, বর্তমান কালের প্রচলিত "**মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত**" বাক্যকে বুঝাইতেছে। 'কারকন বর্গ' বাক্যের অর্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ।

(৩) **রাজধানী হস্তিনাপুর**— এই বাক্য প্রয়োগের হেতু এই যে, ত্রিপুর রাজবংশের আদি পুরুষ সম্রাট যযাতির পুত্র দ্রুহ্য, পিতৃরাজ্য হইতে আগমন করিয়াছিলেন, সেই পৈতৃক রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার অভিপ্রায়ে এবং সম্রাট যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় হইতে সম্রাটের আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ "রাজধানী হস্তিনাপুর" বাক্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

(৪) **সরকার উদয়পুর**— ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরে প্রতিষ্ঠিত থাকাকালে সনন্দ ইত্যাদিতে 'সরকার উদয়পুর' লিখিত হইত। আগরতলায় রাজধানী পরিবর্ত্তিত হইবার পরেও অনেককাল সেই প্রাচীন বাক্যই ব্যবহৃত হইতেছিল। মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্যের শাসনকাল হইতে উক্ত শব্দের পরিবর্ত্তে "সরকার আগরতলা" লিখিত হইতেছে।

(৫) **দ্রোণ ও কাণি**—ইহা ভূমির পরিমাণজ্ঞাপক শব্দ। ইহার আর্য্যা এই,—তিন ক্রান্তিতে এক কড়া, চারি কড়ায় এক গণ্ডা, ২০ গণ্ডায় এক কাণি, ১৬ কাণিতে এক দ্রোণ।

(৬) 'প্রীতে' শব্দ স্থলে 'পিতে' লিখিত হইয়াছে। এই শব্দের পূর্ব্বে ৺এইরূপ চিহ্ন দিয়া, এস্থলে প্রযোজ্য 'বিষ্ণুঃ' শব্দটী শাসনের শীর্ষভাগে লিখিত হইয়াছে। তাম্রশাসন-দাতা ও গ্রহীতার নামের নীচে বিষ্ণুর নাম লিপি করা অসঙ্গত বোধে সেই নামটী শীর্ষস্থানে তোলা হইয়াছে।

(৭) **পাচা পঞ্চক**— রাজ সরকারের বিশিষ্ট উৎসব বা অন্যবিধ ব্যাপার উপলক্ষে সকল শ্রেণীর প্রজা হইতে চাঁদা গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল। এই চাঁদা সাধারণত প্রত্যেক ব্যক্তির দেয় রাজস্বের এক-পঞ্চমাংশ পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইত। এই কারণে ইহা 'পাঁচা পঞ্চক' নামে অভিহিত ছিল।

(৮) **ভেট**—কতিপয় নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বোপলক্ষে রাজ্যেশ্বরকে নানাবিধ বস্তু উপঢৌকন প্রদান করিতে প্রজাগণ বাধ্য ছিল, সেই উপঢৌকন বা নজর 'ভেট' নামে অভিহিত হইত। বর্ত্তমান কালেও ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারী বিভাগের তালুকদার প্রভৃতি উত্তরায়ণের ভেট প্রদান করিয়া থাকেন।

(৯) **বেগার**— রাজ্যেশ্বরের বা রাজকার্য্যোপলক্ষে, কর্ম্মচারীবর্গের প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন জন্য তালুকদার প্রভৃতি প্রজাগণ আপন অধীনস্থ লোকদ্বারা সেই সকল কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর কার্য্যনির্ব্বাহক লোকদিগকে 'বেগার' বলে।

(১০) **বীর সিংহ**— যুদ্ধকালে, সকল শ্রেণীর প্রজাই যুদ্ধোপযোগী সরঞ্জাম অথবা তদ্ধিনিময়ে মুদ্রা ও যুদ্ধার্থ সৈন্য প্রদান করিতে বাধ্য ছিল। এই সাহায্যকে 'বীর সিংহ' বলা হইত।

(১১) **'সমস্ত মানা'**— এই দুইটী শব্দের 'স্ত' ও 'মা' এই দুইটী অক্ষর বিনষ্ট হওয়ায় তাহা বন্ধনীর মধ্যে প্রদান করা হইল।

(১২) তাম্রশাসনের শেষভাগে 'সন ১০৭৯ তেরিখ ১১ কার্ত্তিক' ও 'শক ১৫৯৮ সন তেরিখ ১ চৈত্র'— এই দুইটী সন ও তারিখ উৎকীর্ণ হইয়াছে। '১০৭৯' অঙ্ক ত্রিপুরাব্দ সূচক। ১০৭৯ ত্রিপুরাব্দে ১৫৯১ শক ছিল। উৎকীর্ণ শকাঙ্ক '১৫৯৮' হইতে পূর্ব্বোক্ত অঙ্গ সাত বৎসর অগ্রবর্ত্তী। এরূপ পরস্পর সাত বৎসর অন্তরবর্ত্তী দুইটী সনের ও দুইটী তারিখের উল্লেখ থাকিবার কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য ১০৭৯ ত্রিপুরাব্দের (১৫৯১ শক) ১১ ই কার্ত্তিক তারিখে তাম্রশাসন সম্পাদন করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ কোনো কারণে তাহা গ্রহীতাকে প্রদান করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার গোলোকপ্রাপ্তির পর, তদীয় পুত্র রামদেবমাণিক্য পৈতৃক সিংহাসনে আরোহন করণান্তর পিতার সঙ্কল্পিত দান স্থিরতর রাখিয়া, ১৫৯৮ শকের ১ লা চৈত্র তারিখে পিতা কর্ত্তৃক সম্পাদিত তাম্রশাসন অর্পণ করিয়াছেন। এই শাসনে দুইটী মোহর অঙ্কিত হইয়াছে। তাহার একটীতে 'শ্রীরামসত্য জয়' ও অপরটীতে 'শ্ররামসত্য' লিখিত আছে। প্রথমোক্ত মোহর মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের ও শেষোক্ত মোহর মহারাজ রামদেবমাণিক্যের শাসন কালের।* দুই রাজার সময়ের মোহর উৎকীর্ণ হওয়ায়, তদ্বারাও আমাদের অনুমান সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

এই প্রকারের দুইটী মোহর ও দুইটী সন তারিখ যুক্ত মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের আরও কয়েকখানা তাম্রশাসন আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তাহার একখানা বিষয় রাজমালা তৃতীয় লহরে ৮৫ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। আরও কতিপয় শাসনের বিবরণ অতঃপর প্রদান করা হইবে।

---

* মহারাজ রামদেবমাণিক্যের মোহরে যে 'রামসত্য' বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছিল, রাজমালা আলোচনায়ও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে রামদেবমাণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে—

"তাম্রপত্রে লিখি সনদ করিয়া যতন।
রামসত্য নামে ভূমি দ্বিজেতে অর্পণ॥"

রামমাণিক্য খণ্ড, — ১৮ পৃষ্ঠা।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য কেবল দেবতা এবং ব্রাহ্মণকেই ভূমি দান করিয়াছেন, এমন নহে। ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী সাধু পুরুষগণও এই রাজানুগ্রহে বঞ্চিত ছিলেন না। 'একদিল কাজি' নামক ব্যক্তিকে প্রদত্ত একখানা তাম্রশাসনের বিবরণ এস্থলে আলোচনা করা যাইতেছে। উক্ত শাসনে অঙ্কিত বাক্যাবলী এই ;—

৭ স্বস্তি (১) —শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য দেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি রাজনামাদেশোহয়ং শ্রীকারকোনবর্গে বিরাজতেহন্যত রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে মেহেরকুল একদিল কজিরে (২) ৩৩ শন আধা আসিলা আধা জঙ্গলা দেড় দ্রোণ জমি আয়মা (৩) দিছিলেন তান মৌতে (৪) তান ভাই ও পুত্র শনুসারে (৫) মৌজে তেতৈয়াড়া হাসিলাত। (৬) বার কাণি ভূমি শ্রীকাজি হোঁসন ও শ্রীসুকুর মাহামদরে আয়মা দিলাম নিজ হাতালে (৭) চাস করিয়া দোয় (৮) করিআ সুখে রহৌক পাঁচা পঞ্চক ভেট বেগার ইত্যাদি মানা ইতি শন ১০৭৭ তেং ১৯ কাত্তিক। (৯)

(১) এই তাম্রশাসনের প্রারম্ভেই '৭ স্বস্তি' অঙ্কিত হইয়াছে। ত্রিপুরার অনেক শাসন ও সনন্দে এবম্বিধ লিপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে ; অন্যান্য প্রদেশের শাসন এবং শিলালিপিতেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কোনো কোনো শাসনে তৎপরিবর্ত্তে 'ৎ' ব্যবহারেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ এইগুলিকে প্রণবের প্রতিরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু 'কামরূপ শাসনাবলীর' সংগ্রাহক শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এ কথা স্বীকার করেন না ; তিনি বলিয়াছেন ; "আমরা বাল্যকালে বিদ্যারম্ভের সময় '২ ক খ গ ঘ ঙ' এইরূপ লিখিয়াছিলেম। '২' এই চিহ্নটীর নাম আঞ্জী। 'ৎ' ও '৭' এই আঞ্জীরই রূপান্তর"। (কামরূপ শাসনাবলী—৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ব্রাহ্মণ সমাজপত্র ৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় রামনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ আলোচনায় জানা যায়, তাঁহার মতে এই সকল চিহ্নের সহিত ষট্‌চক্রের সম্বন্ধ রহিয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের মতে— (২ বা ৭ বা ৎ) সর্বাকৃতি কুলকুণ্ডলিনীর মধ্যমা ভাবাপন্না চিত্রপ্রতিকৃতি। কাহারও কাহারও মতে এ সমস্ত স্বস্তিক চিহ্ন। এই সকল বিভিন্ন মতের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় ও কোনটী বর্জ্জনীয়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত চিহ্নগুলি যে নিরর্থক নহে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

(২) 'কাজিরে' স্থলে 'কজিরে' উৎকীর্ণ হইয়াছে। 'কাজিকে' শব্দ দেশজ ভাষায় 'কাজিরে' হইয়াছে।

(৩) **আয়মা** — নিস্কর। (৪) **মৌতে**—মৃত্যুর পর।

(৫) 'অংশানুসারে' বাক্যের 'অং' অক্ষরটী বাদ পড়িয়াছে।

(৬) '।।।' এই তিনটী রেখাদ্বারা ৸৹ তিন চৌক অর্থাৎ বার কাণি অঙ্ক লিখিত হইয়াছে।

(৭) অন্যান্য শাসনে 'নিজ হাত হালে' বাক্য পাওয়া যায়।

(৮) 'দোয়া' স্থলে 'দোয়' উৎকীর্ণ হইয়াছে।

(৯) এই তাম্রাশাসনে পূর্ব্ব আলোচিত শাসনের ন্যায় দুইটী মোহর অঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু শেষবার মোহরাঙ্কনের সন তারিখ প্রদান করা হয় নাই।

এই শাসনের ভাষা নিতান্তই অসম্পূর্ণ এবং অস্পষ্ট, এতদ্দ্বারা মোটামুটি ভাবে ইহা বুঝা যাইতেছে, একদিল কাজি নামক ব্যক্তিকে দেড় দ্রোণ ভূমি ৩৩ বৎসরের নিমিত্ত নিষ্কর প্রদান করা হইয়াছিল। উক্ত কাজির মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রের মধ্যে অংশানুসারে প্রত্যেককে (দেড় দ্রোণ ভূমির অর্দ্ধাংশ) ৸৹ বার কাণি ভূমি এই শাসনদ্বারা নিষ্কর সূত্রে প্রদান করা হইয়াছে।

অন্যান্য তাম্রশাসন ও সনন্দের ন্যায় এই তাম্রফলকের ভাষায়ও সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পারস্য শব্দের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। মুসলমান প্রভাবে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই দালিলিক ভাষার এই অবস্থা ঘটিয়াছিল ; বর্ত্তমান কালেও তাহার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। দলিলের ভাষা বোধ হয় চিরদিনই এক অবস্থায় চলিবে।

এই তাম্রশাসনে ভ্রম প্রমাদ ও বর্ণাশুদ্ধি বিস্তর আছে, তাহার আলোচনা করিতে যাওয়া নিরর্থক।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য কর্ত্তৃক গঙ্গানারায়ণ নামক জনৈক পণ্ডিতকে, ভূমি প্রদান-বিষয়ক আর একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। উক্ত শাসনে লিখিত আছে ;—

ওঁ বিষ্ণু

শ্রীরাম সত্য জয় | শ্রীরাম সত্য

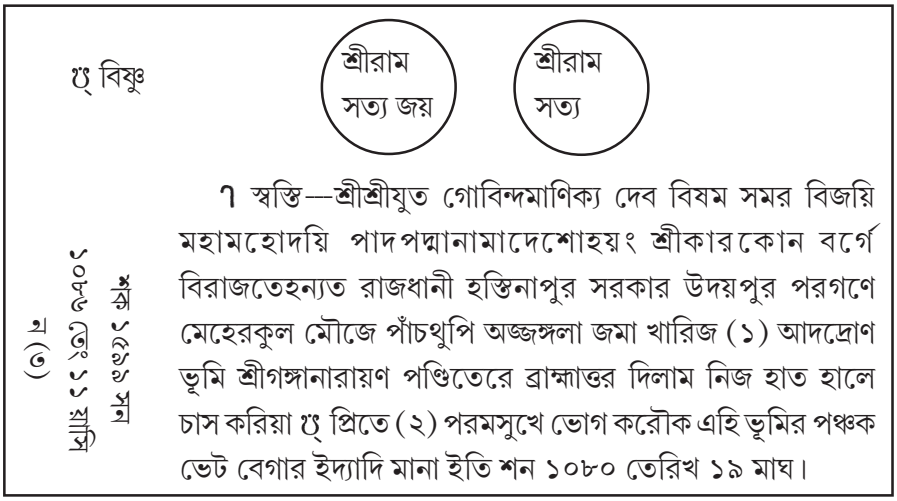

৭ স্বস্তি—শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য দেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি পাদপদ্মানামাদেশোহয়ং শ্রীকারকোন বর্গে বিরাজতেহন্যত রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে মেহেরকুল মৌজে পাঁচথুপি অজ্জঙ্গলা জমা খারিজ (১) আদদ্রোণ ভূমি শ্রীগঙ্গানারায়ণ পণ্ডিতেরে ব্রাহ্মাত্তর দিলাম নিজ হাত হালে চাস করিয়া ওঁ প্রিতে (২) পরমসুখে ভোগ করৌক এহি ভূমির পঞ্চক ভেট বেগার ইদ্যাদি মানা ইতি শন ১০৮০ তেরিখ ১৯ মাঘ।

(৩) থ

শ্রীঃ ১১ ত্রৈং ৫৮০১

সন ৬৬৭১ শ্রী

(১) '৷৷' এই চিহ্নদ্বারা ৷৷০ আট কাণি বা অর্দ্ধ দ্রোণ লিখিত হইয়াছে।

(২) প্রিতে (প্রীতে) শব্দের পূর্ব্বে '৺' এই চিহ্ন দিয়া 'বিষ্ণু' শব্দটী শাসনের শীর্ষভাগে অঙ্কন করা হইয়াছে। এইরূপ করিবার কারণ পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে।

(৩) ১০৮৭ ত্রিপুরা সনের স্থলে '১০৮৬' অঙ্কিত হইয়াছে, এবং 'আশ্বিন' শব্দ স্থলে 'য়াসিন' লিখিত আছে।

এই নরপতির সম্পাদিত আর একখানি তাম্রশাসনের পাঠ এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে। এই তাম্রফলকে দুইটী তারিখ বা দুইটী মোহর অঙ্কিত হয় নাই। এতদ্বারা বুঝা যায়, এই শাসন মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য স্বয়ংই প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ রামদেব মাণিক্যের তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন ঘটে নাই।

৺ বিষ্ণু

শ্রীরাম
সত্য জয়

৭ স্বস্তি—শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য দেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি রাজনামাদে (শোহয়ং) (১) শ্রীকারকোন বগে (২) বিরাজতেহন্যত রাজধানি হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে (মেহেরকুল) (৩) মৌজে পাঁচথুপি॥ আদদ্রোণ ভূমি ব্রহ্মোত্তর কামদেব পণ্ডিতে পাইয়াছিল অখনে সেই ভূ (মি তাহার) (৪) বেটা শ্রীজাদু (৫) পণ্ডিতের দিলাম ৺প্রিতে ব্রহ্মোত্তর এহি ভূমি নিজ হাত হালে চাষ করি অ (া) (৬) সুখে ভোগ করৌক এহার পাঁচা পঞ্চক ভেট বেগার ইত্যাদি মানা ইতি ১০৮৩ তরিখ ২২ কার্ত্তিক (৭)

(১) (৩) (৪) (৬) তাম্রফলকের দক্ষিণ ভাগের কিয়দংশ ভগ্ন হওয়ায় () বন্ধনীর মধ্যে রক্ষিত শব্দগুলি বিনষ্ট হইয়াছে।

(২) 'বর্গে' স্থলে 'বগে' উৎকীর্ণ হইয়াছে।

(৫) 'শ্রীযুদ' স্থলে 'শ্রীজাদু' লিখিত হইয়াছে।

(৭) 'কার্ত্তিক' স্থলে 'কাত্তিক' অঙ্কিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের প্রদত্ত দেবীপ্রসাদ শর্ম্মা নামীয় একখানা, নরসিংহ শর্ম্মা নামীয় একখানা, আবদুলগণি খন্দকার নামীয় একখানা তাম্রশাসন ও দ্বিজরত্ন নারায়ণ পুরোহিত নামীয় ব্রহ্মোত্র ভূমির একখানা সনন্দ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তন্মধ্যে দ্বিজরত্ন নারায়ণ নামীয় সনন্দখানা এস্থলে আলোচনা করা সঙ্গত বোধ হইতেছে। বাহুল্যভয়ে অন্যান্যগুলির আলোচনায় বিরত থাকিতে হইল।

দ্বিজরত্ননারায়ণ রাজ-পুরোহিত এবং সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার যোগ্যতা ও রাজদরবারে প্রতিপত্তি লাভের বিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের যৌবরাজ্য সময়ে তিনি বিপন্নাবস্থায় রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া কষ্টভোগ করিবার কালে ধর্ম্মরত্ননারায়ণ নামক এক পুরোহিত

দুর্ব্বিসহ দুঃখ ও কষ্টকে বরণ করিয়া যুবরাজের সহযাত্রী হইয়াছিলেন, কৃষ্ণমালা গ্রন্থ আলোচনায় এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইনি মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের সময়ে রাজ-পৌরোহিত্যে বরিত উক্ত দ্বিজরত্ননারায়ণ হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নাই। কারণ, গোবিন্দমাণিক্যের প্রায় এক শতাব্দী পরে কৃষ্ণমাণিক্য রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় গোবিন্দমাণিক্যের নিয়োজিত রাজ-পুরোহিত মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের কালে বিদ্যমান থাকা এবং তাঁহার সঙ্গে দুর্গম স্থানে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করা সম্ভবপর নহে। তবে উভয়ের মধ্যে নামের কিয়ৎ পরিমাণে একতা লক্ষিত হইতেছে, রাজ-পুরোহিত দ্বিজরত্ন নারায়ণকে মহারাজ গোবিন্দ ১০৭০ ত্রিপুরাব্দের ২৫ শে বৈশাখ তারিখে, সূর্য্যগ্রহণ কালে তুলাপুরুষ দান ও মহান্ন দান উপলক্ষে এক সনন্দ দ্বারা ২০ বিশ দ্রোণ ভূমি ব্রহ্মোত্র প্রদান করিয়াছিলেন। এই সনন্দ কাগজে লিখিত হইয়াছে। ঁত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর পূজক (দ্বিজরত্ননারায়ণের বংশধর) শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় সনন্দখানা আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। তাহা অতি জীর্ণ এবং কৃচ্ছ্র পাঠ্য হইয়াছে। উক্ত সনন্দের পাঠ নিম্নে প্রদান করা হইল।

ষ্ট্যাম্প মুদ্রিত ৪ টাকা	রামসত্য জয়	রামসত্য	শ্রীরা মাজ্ঞা	৩৪ নং সেহা (পারসী স্বাক্ষর)।

জাএ— জমি—

সাইলা

মৌং চন্দ্রপুর —	১৲
খিলপাড়া —	১২৲
বাসুয়াপাড়া —	১৲
সোণামুড়া —	১৲
ডিয়ারা —	১৲
	১৬৲

বোরুয়া

নলগইর হংসধ্বজের তোলা —	২৲
তিননালিয়া —	১৲
ছাগলনাইয়া —	১৲
	২০৲

বিংশতি দ্রোণ জমি মাত্র।

১৭ স্বস্তি — শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি রাজনামাদেশোয়ং শ্রীকারকনবর্গ বিরাজতেহন্যত পরং রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে উদয়পুর মৌজে চন্দ্রপুর গএরহ সাইলা (১) ও বোরুয়া (২) তুলাপুরুষ ও মহা অন্নদান বাবত সূর্য্যগ্রহণ কালে ঁপ্রীতে বিংশতি দ্রোণ জমি শ্রীদ্বিজরত্ননারায়ণ পুরুহীতকে ব্রহ্মোত্তর দেওয়া গেল। এহি জমির মালখাজানা ও ভেট বেগার বীরসিংহাদি সমস্তাঙ্ক নিষেদ। এহি জমি আমল কাবেজ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক পরম সুখে ভোগ তছরুপ করিতে রহুক। ইতি সন ১০৭০ তেরিখ ২৫ বৈশাখ।

(১) সাইলা — হৈমন্তিক ধান্য উৎপন্নযোগ্য ভূমি।

(২) বোরুয়া — বোরো ধান্য উৎপন্নের উপযোগী ক্ষেত্র।

এই সনদ আলোচনা করিলে, সনন্দ গ্রহীতার ও তাঁহার বংশধরগণের বিশেষ সতর্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য কর্ত্তৃক 'রাম সত্য জয়' মোহর অঙ্কন পূর্ব্বক সনন্দখানা প্রদত্ত হইবার পর, তাহাতে মহারাজ রামদেব মাণিকের 'রাম সত্য' মোহর অঙ্কন করাইয়া লওয়া হইয়াছে। তৎপর পূনর্ব্বার সনন্দখানা মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের সময়ে উপস্থিত করিয়া 'শ্রীরামাজ্ঞা' মোহর অঙ্কন করান হইয়াছে। অতঃপর মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের সময়ে ষ্ট্যাম্প প্রচলিত হওয়ায়, তৎকালের ঘোষিত রাজাজ্ঞানুসারে এই সনন্দে ৪্ চারি টাকার ষ্ট্যাম্প মুদ্রিত করানো হইয়াছে। এতদ্বারা পরবর্ত্তী রাজগণের সময়েও সনন্দখানা প্রবল রাখিবার পক্ষে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

মহারাজ রামদেবমাণিক্যের প্রদত্ত কোনো সনন্দ আমাদের দৃষ্টিগোচর না হইয়া থাকিলেও তিনি তাম্রপত্রদ্বারা ব্রাহ্মণকে ভূমি অপর্ণ করিবার নিদর্শন রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে ;—

"তাম্রপত্রে লিখি সনদ করিয়া যতন।
রামসত্য নামে ভূমি দ্বিজেতে অর্পণ"
রামমাণিক্য খণ্ড—১৮ পৃষ্ঠা।

এতদ্ব্যতীত মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের সম্পাদিত আরও অনেক তাম্রশাসন মহারাজ রামদেবমাণিক্য স্বীয় মোহর অঙ্কনদ্বারা প্রবল গণ্য করিয়াছেন। ইহাও তাঁহার দানশীলতার পরিচায়ক বলিতে হইবে।

মহারাজ দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের প্রদত্ত ভূমি দানের কোনো তাম্রশাসন বা সনন্দ আমরা পাই নাই ; কিন্তু তিনিও দানশীল ছিলেন এবং ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছেন, রাজমালা আলোচনায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"রত্নমাণিক্য পুনঃ হৈল রাজ্যেশ্বর।
দ্বিজে ভূমিদান রাজ্য শাসন তৎপর"
রত্নমাণিক্য খণ্ড — ২৩ পৃষ্ঠা।

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য (২য়) ভূমি দানদ্বারা সৎকীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার প্রদত্ত ভূমি দানের কোনো নিদর্শন না পাইলেও রাজমালার বাক্যদ্বারা এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

"তিল ধেনু তুলা পুরুষ আর যে বিপুল।
শাস্ত্র প্রমাণ দান ভূম্যাদি অতুল"
ধর্ম্মমাণিক্য খণ্ড—৩০ পৃষ্ঠা।

ইহার পর, জয়মাণিক্য ও ইন্দ্রমাণিক্য কিয়ৎকাল প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে সমকালে রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার আপন আপন পক্ষভুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে অনেক ব্যক্তিকে নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। ইঁহাদের দানের কোনও নিদর্শন সংগ্রহ করা যাইতে পারে নাই। এই সকল দান দয়া বা ধর্ম্ম ভাব প্রণোদিত বলিয়া মনে হয় না ; রাজগণ আপন আপন কার্য্যোদ্ধারার্থ লোক হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে ইহা করিয়াছিলেন। ইঁহারা কোনো কোনো স্থলে ধর্ম্ম-সাধনোদ্দেশ্যে ভূমি দান করাও অসম্ভব নহে, আমরা তাহার নিদর্শন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য ঁরাধামাধব দেবতা ও ঁজগন্নাথ দেবাতর সেবায় নিমিত্ত তাম্রশাসনদ্বারা দেবোত্র ভূমি দান করিবার বিবরণ পূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে। * এতদ্ব্যতীত নানকার, খানাবাড়ী ইত্যাদি নানাসূএত্র বহু ব্যক্তিকে তিনি ভূমি প্রদান করিয়াছেন। এই শ্রেণীর কতিপয় সনন্দ ও চিঠী আমরা দেখিয়াছি, বাহুল্যভয়ে তৎ সমস্তের বিবরণ এ স্থলে আলোচনা করা হইল না।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের তাম্যশাসন

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য মেহেরকুল পরগণার অন্তঃপাতী মিথিলাপুর গ্রামের কতক ভূমি স্বীয় গুরুকে নিষ্কর প্রদান করিয়াছিলেন।

চট্টগ্রাম কলেজের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্. এ, মহাশয়, মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের প্রদত্ত একখানা সনন্দের প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহে উক্ত সনন্দের বিবরণ আমরা পাইয়াছি। সনন্দখানা ১১৭১ ত্রিপুরাব্দের ১৩ই বৈশাখ তারিখে সম্পাদিত হইয়াছিল। এতদ্বারা হরিনারায়ণ চৌধুরী, রামবল্লভ চৌধুরী ও সীতারাম চৌধুরীকে মেহেরকুল পরগণার অন্তর্গত তপেরাজাপাড়া ও তপেবাণাসূয়া মধ্যস্থিত ৮।০ আট দ্রোণ চারি কাণি ভূমি বেহারা চাকর পোষণার্থ ইনামসূত্রে প্রদান করা হইয়াছিল। উক্ত সনন্দের শেষ ভাগে লিখিত আছে,— "মাহাফিক তপছিল ৮।০ জমি তোমারগ বেরা চাকর রাখনের জন্য ইনাম দেওয়া গেল। এই জমি দিয়া তোমারঘ পুত্র পৌত্রাধিক্রমে বেরা চাকর রাখিয়া তোমারগ আপন আপন কাজ কর্ম্ম করাও। এই জমির মালখাজানা ও বৃসিংহ (বীরসিংহ) ইত্যাদি সমস্তাঙ্ক নিষেদ।"

নানাকারণে প্রাচীন তাম্রশাসন ও সনন্দ ইত্যাদি সংগ্রহ করা দুষ্কর হইয়াছে. অনেক ব্যক্তি হস্তস্থিত দলিল দর্শাইতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা মনে করেন, ঐ সকল দলিল বাহির করা হইলে, তাহা হারাইতে হইবে, অথবা অন্য কোনোরূপ অনিষ্ট সঙঘটিত হইতে পারে। তাঁহাদের এই ভ্রম-বিশ্বাসের দরুণ আমরা বিশেষ অসুবিধায় পতিত হইতেছি।

---

* পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৫ ও ১২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই গ্রন্থে যে-সকল তাম্রশাসন ও সনন্দের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে, তৎসংসৃষ্টে অনেক ভূমি নানারূপ অবস্থান্তরিতভাবে নানা ব্যক্তির হস্ত ঘুরিয়া পূনর্ব্বার ত্রিপুরেশ্বরের সরকারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। দেবোত্তর ভূমির অবস্থাও অনেক স্থলে তদ্রূপ। সুতরাং আলোচ্য সনন্দ ও তাম্রশাসনের মধ্যে অনেকগুলি এখন আর মূল্য নাই।

অন্যবিধ পুণ্য কার্য্য

দেবায়তন নির্ম্মাণ, বিগ্রহ স্থাপন, জলাশয় প্রতিষ্ঠা এবং ভূমিদান প্রভৃতি পুণ্য-কার্য্যানুষ্ঠান ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের চিরন্তন প্রথা। যে রাজা এসকল কার্য্য সম্যক সম্পাদনের সুযোগলাভ করিতে পারেন নাই, তিনি অন্ততঃ দুই একটী জলাশয় খননদ্বারা জল দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রকারের পুণ্য কার্য্যানুষ্ঠানও ত্রিপুরেশ্বরগণের পুরুষ পরম্পরা কীর্ত্তি।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য বারম্বার কনকের তুলাপুরুষ দান ও তীর্থ ভ্রমণাদি বহুবিধ সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। মহারাজ রামদেবমাণিক্য দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ এবং প্রতিনিয়ত দেবার্চ্চন-নিরত ছিলেন। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য (২য়) তিলধেনু ও তুলাপুরুষ দান ও ষোড়শ দান করিবার নিদর্শন পাওয়া যায় ; তিনি প্রতিদিন নিয়মিতকালে পুরাণ শ্রবণদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতেন। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য তুলাপুরুষ দান, ষোড়শ দান এবং পঞ্চাগ্নি প্রভৃতি কৃচ্ছ্রব্রতের উদযাপন করিয়াছেন। কুমিল্লাস্থ জগন্নাথপুরে ইঁহার দ্বারা সম্পাদিত এক সপ্তাহকাল ব্যাপী মহোৎসব এক চিরস্মরণীয় ঘটনা। 'কৃষ্ণমালা' গ্রন্থে এই মহোৎসবের বিশদ বিবৃতি প্যায়া যায়, বাহুল্যভয়ে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা হইল না।

ভূপালগণের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলে পদে পদে তাঁহাদের ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু নিতান্তই দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতে হইল যে, কালপ্রভাবে, রাজবংশীয় বহু অনধিকারী ব্যক্তি রাজ্যলালসার বশবর্ত্তী হইয়া, সুপবিত্র রাজকুল ও রাজধর্ম্মকে কলুষিত করিতে কুণ্ঠারোধ করেন নাই। অতঃপর তদ্বিষয়ের আলোচনা করা হইবে।

সামরিক বল ও সমর বিবরণ

ত্রিপুরার সামরিক বল কত দৃঢ় ছিল, রাজমালার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় লহর আলোচনায় তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অন্তর্বিপ্লব, বহিঃশত্রুর বারম্বার আক্রমণ ও প্রবল শক্তির সহিত উপর্য্যুপরি সঙ্ঘর্ষের ফলে ত্রিপুরার বাহুবল উত্তরোত্তর শিথিল হইতে চলিয়াছিল। তৎকালে মঘ ও মোগর, এই দুই প্রবল শক্তির সহিত

ত্রিপুরার প্রতিনিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল, এতকাল কোনো শক্তিই ত্রিপুরার বলবীর্য্যের সহিত আঁটিয়া আসিতে পারেন নাই। রাজমালা চতুর্থ লহরে সন্নিবেশিত ঘটনার সমসাময়িক কালে রাজপরিবারস্থ কোনো ব্যক্তি অসঙ্গত স্বার্থসিদ্ধির লালসায় বারম্বার শত্রুপক্ষকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সাহায্যে চিরপ্রতিত শৌর্য্যের মূলে যেভাবে স্বহস্তে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিতেও হৃদয়ে শেলবিদ্ধ হয়।

মহারাজ ছত্র মাণিক্যের ত্রিপুরা আক্রমণ

ত্রিপুর দরবার হইতে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে জনৈক প্রতিনিধি নিযুক্ত রাখিবার নিয়ম ছিল, এই নিয়ম গোবিন্দমাণিক্যের শাসনকালে প্রবর্ত্তিত হইবার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য সিংহাসন লাভ করিয়া, স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে নবাব দরবারে প্রতিভূস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। গোবিন্দমাণিক্যের সিংহাসন লাভে নক্ষত্ররায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি নবাব দরবারে কিয়ৎকাল অবস্থানের পর স্বীয় প্রতিভাবলে নবাবকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে ভ্রাতাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া স্বয়ং সিংহাসন লাভের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে দেবালয়সমূহে বলি বন্ধ করিবার দরুণ চন্তাই প্রমুখ প্রকৃতিপুঞ্জ মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। নক্ষত্ররায় দেখিলেন, রাজ্য অধিকারের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। তিনি বঙ্গের শাসনকর্ত্তা শাহ সুজার অনুকম্পায় লব্ধ মোগল-বাহিনী লইয়া ত্রিপুরা বিজয়ার্থ যাত্রা করিলেন।

মহারাজ গোবিন্দ-মাণিক্যের ত্যাগ স্বীকার

নবাব সৈন্যের আগমনবার্ত্তা পাইয়া মন্ত্রী ও সেনাপতিবর্গ যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত বারম্বার রাজাজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছিলেন, কিন্তু ভ্রাতৃবৎসল ও শান্তিপ্রিয় মহারাজ গোবিন্দ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, হয় ভ্রাতৃশোণিতে সমরাঙ্গণ প্লাবিত হইবে, অথবা আত্মজীবন আহুতি প্রদান করিতে হইবে ; বিশেষতঃ এই ব্যাপারে প্রজাক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তিনি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, নির্ব্বিবাদে রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন* নক্ষত্ররায় 'ছত্রমাণিক্য' নামধারণপূর্ব্বক ত্রিপুরার সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন।

মহারাজ ছত্র-মাণিক্যের সিংহাসন লাভ

---

* গোবিন্দমাণিক্য রাজা বলিল তখন।
ভাই সনে করি যুদ্ধ কিসের কারণ ॥
আত্ম কলহ হইলে প্রজা নষ্ট হয়।
পাপেতে হইব স্থিতি বলিল নিশ্চয় ॥
রাজত্ব করিল আমি বর্ষ পরিমাণ।
এখনি রাজত্ব জান তাহার বিধান ॥
গোবিন্দমাণিক্য খণ্ড—৬-৭ পৃষ্ঠা।

এস্থলে একটী কথার উল্লেখ করা সঙ্গত মনে হইতেছে। নক্ষত্ররায়ের বংশধরগণের হস্তে রক্ষিত রাজমালায় লিখিত আছে— "নক্ষত্ররায় ভীষণ যুদ্ধে গোবিন্দমাণিক্যকে জয় করিয়া ত্রিপুর সিংহাসন অধিকার করেন।" রাজগ্রন্থাগারে রক্ষিত রাজমালার মতে—নক্ষত্ররায় শাহ সুজার সাহায্য লাভে ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তি পরীক্ষার প্রয়োজন হয় নাই। রাজমালার সংগ্রাহক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় এতদুভয় মতের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মতকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—

মহারাজ ছত্র মাণিক্যের সাহায্যকারী কে?

"যে সময়ে সুলতান সুজার আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল, সেই সময় তিনি কিরূপে অন্য ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন? সুতরাং নক্ষত্ররায় যে স্বীয় বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, ইহাই সত্য।"

কৈলাসবাবুর রাজমালা—২য় ভাগ, ৭ম অঃ, ৮৫ পৃঃ।

কৈলাসবাবুর এই মত গ্রণ করিতে দ্বিধাভাব আসে। তিনি এস্থলে শাহ সুজাকে অন্যের সাহায্য প্রদান পক্ষে অক্ষম মনে করিয়া থাকিলেও, সুজা গোবিন্দমাণিক্যকে জয় করিয়া, কুমিল্লা নগরীতে বিজয়ের স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ মসজিদ নির্ম্মাণের কথা বিশ্বাস করেন।* যে ব্যক্তি নক্ষত্ররায়কে সাহায্য করিতে অক্ষম ছিলেন, তিনি ত্রিপুরা জয় করিলেন কি উপায়ে? এবং অন্যের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সমর্থ হওয়া নক্ষত্ররায়ের পক্ষে সম্ভপর ছিল কি না? কি উপায়ে নক্ষত্ররায় রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, সেই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিরর্থক। স্থূল কথা, তিনি রাজত্ব লাভের নিমিত্ত যে পন্থা অবলম্বন করিয়া ছিলেন, তাহা প্রশংসনীয় নহে। বিশেষতঃ তাঁহার প্রদর্শিত পথ, পরবর্ত্তীকালে ত্রিপুরার পক্ষে সাঙ্ঘাতিক অনিষ্টকারী হইয়াছিল।

কৈলাসবাবু যাহাই বলেন না কেন, রাজমালার সার-সঙ্কলয়িতা রেভারেণ্ড্ জেম্‌স লঙ্ সাহেব কিন্তু রাজমালার মতই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার লেখায় পাওয়া যাইতেছে,—

"The step brother of Raja, having obtained assistance from the Nawab of Murshidabad attempted to gain possession of the throne; the Raja being a peaceable man and not wishing to fight with a relative, fled to the king of Arakan, who gave him a hospitable reception."

J. A. S. B.— Vol. XIX

মর্ম্ম ;— রাজার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মুর্শিদাবাদের নবাবের সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শান্তিপ্রিয় রাজা, স্বীয় আত্মীয়ের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইবেন না, এই বলিয়া তিনি পলায়ন করিয়া আরাকান রাজসমীপে উপনীত হইলেন। আরাকান-রাজ তাঁহাকে সাদরে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন।

---

* কৈলাসবাবুর রাজমালা—২য় ভাগ, ৭ম অঃ, ৯৪ পৃষ্ঠা।

এই উক্তিতেও বঙ্গেশ্বরের সাহায্য গ্রহণের এবং গোবিন্দমাণিক্যের বিনাযুদ্ধে রাজ্য ত্যাগের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। ছত্রমাণিক্য (নক্ষত্ররায়) ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। শাহ সুজা ১৬৩৯ খ্রীঃ হইতে ১৬৬০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বঙ্গের শাসনকর্ত্তা পদে নিয়োজিত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং তিনি নক্ষত্ররায়ের সাহায্যকল্পে ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। শাহ সুজা ও মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য সমসাময়িক কালে ভ্রাতৃবিরোধে রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সত্য। সম্ভবতঃ সুজা পলায়নপর হইবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল।

কৈলাসবাবু বলিয়াছেন, গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্যত্যাগের পরে, তাঁহার পুত্র রামদেব ছত্রমাণিক্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এই বিবরণ তিনি কোথায় পাইয়াছেন, জানিবার উপায় নাই। রাজমালায় লিখিত আছে, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইবার কালে তাঁহার পুত্রগণ, ভ্রাতা জগন্নাথদেব এবং ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিলেন;

সুতরাং ছত্রমাণিক্যের বিরুদ্ধে কুমার রামদেবের অস্ত্রধারণ করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ রাজ্যভ্রষ্ট রাজকুমারের পক্ষে নব-জাগ্রত রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা সহজসাধ্য কার্য্য নহে।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য দ্বিতীয় বারের রাজত্বকালে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইবার কোনোরূপ আভাস পাওয়া যায় না।

মহারাজ ছত্রমাণিক্যের রাজত্বকাল

মহারাজ ছত্রমাণিক্য রাজ্যলাভের নিমিত্ত ভ্রাতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা হইবার পরে তিনি কাহারও সহিত আহবে লিপ্ত হন নাই। তাঁহার শাসনকালে রাজ্য সর্ব্বতোভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল।

মহারাজ রামদেব-মাণিক্য ও দ্বারিকা ঠাকুর

গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র মহারাজ রামদেবমাণিক্যের শাসনকালেও সংগ্রামাদি কোনোরূপ অশান্তিজনক ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় নাই। মহারাজ রামদেব স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র (দুর্গাঠাকুরের পুত্র) দ্বারকাঠাকুরকে নবাব দরবারে প্রতিনিধি রাখিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যের দ্বারা মহারাজ রামদেব কিয়ৎ পরিমাণে অশান্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন ; তদ্বিবরণ পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে।

মহারাজ রত্নমাণিক্যের রাজত্বকাল

মহারাজ রামদেবমাণিক্যের পরলোক গমনের পর, তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়স্ক পুত্র রত্নমাণিক্য সিংহাসনারূঢ় হইলেন। নবীন ভূপতির মাতুল বলিভীম-নারায়ণ যুবরাজ আখ্যা গ্রহণ করিয়া শিশু রাজার পক্ষে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। অপ্রতিহত প্রভাবের ফলে বলিভীম অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি মোগল শক্তির প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন।

এজন্য ঢাকার শাসনকর্ত্তা সাইস্তা খাঁ কেশরি দাস নামক সেনাপতির দ্বারা বলিভীমনারায়ণকে ধৃত করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন। এই সময় মোগল শক্তির সহিত ত্রিপুরার সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল।

দ্বারকা ঠাকুর রামদেবমাণিক্যকে অন্তরিত করিয়া রাজ্যলাভের চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন ; এবার তাঁহার অভিষ্ট সাধনের সুযোগ উপস্থিত হইল। একদল নবাবসৈন্যসহ তিনি ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এবং রাজধানী অধিকার ও রাজাকে বিতাড়িত করিয়া, নরেন্দ্রমাণিক্য নাম ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনারূঢ় হইলেন। এ দিকে জগন্নাথ ঠাকুরের পুত্র (মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র) চম্পক রায় ঢাকায় যাইয়া সমগ্র অবস্থা নবাবের গোচর করায়, নবাব রত্নমাণিক্যের সাহায্যার্থ নরেন্দ্রমাণিক্যের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মুসলমান বাহিনী, উদয়পুরের রাজধানী আক্রমণ ও নরেন্দ্রমাণিক্যকে ধৃত করিয়া ঢাকায় লইয়া যাওয়ার পরে, রত্নমাণিক্য পুনর্ব্বার সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।

দ্বারকা ঠাকুর কর্ত্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণ ও বিজয়

মহারাজ রত্নমাণিক্য পুনর্ব্বার রাজ্য লাভ করিলেন, কিন্তু এবার তাঁহার বিপদ অধিকতর ঘনীভূত হইয়া উঠিল। রামদেব মাণিক্যের পুত্র ঘনশ্যাম ঠাকুর (রত্নমাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) এই সময় মুরশিদাবাদের দরবারে প্রতিভূস্বরূপ উপস্থিত ছিলেন। তিনি নবাবকে বশীভূত করিয়া সৈন্য সাহায্য লাভ করিলেন, এবং উদয়পুর আক্রমণ ও রাজাকে বধ করিয়া, মহেন্দ্রমাণিক্য নাম ধারণপূর্ব্বক ত্রিপুরার রাজদণ্ড ধারণ করিলেন।

ঘনশ্যাম ঠাকুর কর্ত্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণ

মহেন্দ্রমাণিক্যের পরলোক গমনের পরে, তাঁহার ভ্রাতা দুর্য্যোধন ঠাকুর রাজত্ব লাভ করেন। তিনি ধর্ম্মমাণিক্য (২য়) নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় ছত্রমাণিক্যের প্রপৌত্র জগৎরাম ঠাকুর ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করিবার অভিলাষী হইলেন। তিনি বরদাখাতের জমিদার আকা সাদেকের সাহায্যে ঢাকা নেয়াবতের দেওয়ান মীর হবিবের সহিত মিলিত হইয়া ঢাকার শাসনকর্ত্তাকে বশীভূত করিলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত সৈন্যদল লইয়া উদয়পুর আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মমাণিক্যের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া তিনি ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। নবাব এই পরাজয়বার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া বৃহৎ সৈন্যদল ত্রিপুরা বিজয়ার্থ প্রেরণ করিলেন। নবাব সৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, এক ভাগ গোমতী নদীপথে এবং আর এক ভাগ কৈলারগড়ের পথে অগ্রসর হইয়া উত্তর ও পশ্চিম দিক হইতে রাজধানী আক্রমণ করিল। মীর হবিব স্বয়ং এই যুদ্ধে নায়ক ছিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর ত্রিপুর সৈন্য পরাজিত হইল। রাজা রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এ দিকে মোগলবাহিনী রাজধানী লুণ্ঠন

জগৎরাম ঠাকুর কর্ত্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণ

করিয়া, জগৎরাম ঠাকুরকে রাজত্ব প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য জগৎশেঠের সাহায্য গ্রহণে পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তদবধি সমতলক্ষেত্র 'রোশনাবাদ' নামকরণে মোগলের অধীনে জমিদারীতে পরিণত হইল, এই আক্রমণ ও বিজয় দ্বারা পার্ব্বত্য প্রদেশের স্বাধীনতা কোনরূপ ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

মণিপুররাজের ত্রিপুরা আক্রমণ

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য মুসলমানগণের সহিত আহবে লিপ্ত থাকিবার কালে সুযোগ বুঝিয়া মণিপুরাধিপতি পামহেইবা (করিম নওয়াজ) ত্রিপুরার উত্তর সীমান্ত রক্ষক সৈন্যদলকে আক্রমণ ও জয় করিযা স্বীয় রাজ্যের সীমারেখা দক্ষিণ দিকে কিয়ৎ পরিমাণে প্রসারিত করিয়াছিলেন। এই সামান্য যুদ্ধে মুষ্টিমেয় ত্রিপুর সৈন্য জয় করিয়া মণিপুরীগণ এত উৎফুল্ল হইয়াছিল যে, তাহারা রাজা পামহেইবাকে 'তাখেলঙাম্বা' (ত্রিপুরা বিজয়ী) উপাধিতে ভূষিত করিয়া গৌরব বোধ করিয়াছিল। এতদুপলক্ষে একখানা গ্রন্থও রচিত হয়, তাহার নাম, "তখেলংনম্বা" (ত্রিপুরা বিজয়)। সেখালের ত্রিপুরা বিজয়ী নিজকে গৌরবান্বিত মনে করা অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু এই বিজয়ের ফল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়।

মহারাজ মুকুন্দমাণিক্য নিয়মিত সংখ্যক হস্তী প্রদান না করায়, তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত নবাবের ফৌজদার সৈন্য সামন্তসহ ত্রিপুরায় আগমন করিলেন, তিনি উদয়পুরে যাইয়া

মহারাজ মুকুন্দমাণিক্যের রাজত্বকাল

ছাউনী করিয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ খেদা করিয়াও ভাল হস্তী ধৃত করিতে না পারায় প্রতিশ্রুত হস্তী প্রদান পক্ষে বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। এই সময় গোবিন্দমাণিক্যের অনুজ জগন্নাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র রুদ্রমণি ঠাকুর সুবা পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং হস্তী খেদা সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। নবাবের ফৌজদার আগমনকালে তিনি উদয়পুরের দক্ষিণে মোতাই নামক স্থানে হস্তী খেদার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তিনি মহারাজকে পত্রদ্বারা জানাইলেন, হস্তী ধৃত করা যাইতে পারে নাই, রাজাজ্ঞা পাইলে তিনি নবাবের ফৌজদারকে আক্রমণ ও বিতাড়িত করিতে প্রস্তুত আছেন। মহারাজ মুকুন্দ দেখিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র পাঁচকড়ি ঠাকুর প্রতিনিধিরূপে নবাব দরবারে উপস্থিত আছেন। রুদ্রমণি সুবার প্রস্তাবানুসারে ফৌজদারের প্রতি অত্যাচার করা হইলে, পুত্রকে তাহার ফলভোগী হইতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি রুদ্রমণির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। রুদ্রমণি পূনর্ব্বার তদ্রূপ প্রস্তাব প্রেরণ করিয়া, আদেশ লাভের পূর্ব্বেই সসৈন্যে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহারাজ মুকুন্দ উভয়সঙ্কটে পড়িয়া, ফৌজদারকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত সুবা রুদ্রমণির পত্র তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। অবিবেচক ফৌজদার কিন্তু উল্টা বুঝিলেন। তিনি মনে করিলেন, রাজার সম্মতি ব্যতীত তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী এবম্বিধ কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারে না।

ফৌজদার ক্রুদ্ধ হইয়া অকস্মাৎ রাজপুরী আক্রমণ করিলেন, এবং মহারাজ মুকুমন্দমাণিক্য, কুমার কৃষ্ণমণি ঠাকুর ও ধর্ম্মমাণিক্যের পুত্র গদাধর ঠাকুরকে ধৃত ও অবরুদ্ধ করিলেন। এ দিকে রাজসৈন্য ফৌজদারকে ধৃত করিবার নিমিত্ত শিবিরের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। মহারাজ মুকুন্দ অবরুদ্ধজনিত অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া, রজনী যোগে বিষপানে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। রাজসৈন্যগণ এই শোকাবহ ঘটনায় বিমর্ষ হইয়া ফৌজদারকে আক্রমণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল।

মুসলমান কর্ত্তৃক রাজধানী আক্রমণ ও রাজার জীবন বিসর্জ্জন

মহারাজ মুকুন্দমাণিক্যের পরলোকগমন কালে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র পাঁচকড়ি ঠাকুর নবাব দরবারে উপস্থিত ছিলেন। এই সুযোগে সুবা রুদ্রমণি জয়মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। পাঁচকড়ি ঠাকুর স্বদেশে আগমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে পিতৃ-বিয়োগের ও জয়মাণিক্যের সিংহাসন অধিকারের বিষয় অবগত হইয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া গেলেন এবং সম্যক অবস্থা জানাইয়া নবাবের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তিনি রাজ্যে আসিয়া নবাবের সাহায্যে সিংহাসন অধিকার ও ইন্দ্রমাণিক্য নাম ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রুদ্রমণি সহজে রাজ্য ত্যাগ করিবার পাত্র ছিলেন না, তিনি মোতাই নামক স্থানে যাইয়া এক নূতন রাজধানী স্থাপন এবং রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলস্থ প্রজাবর্গকে লইয়া একখণ্ড রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিয়ৎকাল এই অবস্থায় অতিবাহিত হইবার পর, মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্যের অনুরোধে নবাব সৈন্য ত্রিপুরায় আগমন করিয়া জয়মাণিক্যকে (রুদ্রমণিকে) ধৃত করিয়া নিয়াছিল।

সুবা রুদ্রমণির ব্যবহার

মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্য কর্ত্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণ

জয়মাণিক্যকে বিতাড়িত করিয়াও মহারাজ ইন্দ্র শান্তিতে রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হইলেন না। সমসের গাজী নামক ত্রিপুরেশ্বরের অধীনস্থ জনৈক প্রজার প্ররোচনায় নবাব সৈন্য কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার রাজ্য আক্রান্ত হইল। ঘোরতর যুদ্ধের পর বিজয়লক্ষ্মী মুসলমানের অঙ্কশায়িনী হইলেন। মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্য ধৃত ও মুরশিদাবাদে নীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, যুবরাজ কৃষ্ণমণি পরিবারবর্গসহ রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক মনু নদীর তীরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

মুসলমান কর্ত্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণ।

যুবরাজ কৃষ্ণমণি দেশান্তরিত অবস্থায় নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া অশেষ দুর্গতি ভোগ করিয়াছিলেন, এবং রাজ্যলাভের পর তাঁহাকে মুসলমান, কুকি, ত্রিপুরা ও ইংরেজের সহিত বারম্বার আহবে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। তদ্বিবরণ অতঃপর বিশদভাবে বিবৃত হইবে। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য, রাজমালা চতুর্থ লহরের অন্তর্গত শেষ রাজা।

সামরিক বিবরণ অতি অল্প কথায় শেষ করিতে হইল। যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা গেল, তদ্দ্বারা উপলব্ধ হইবে, ত্রিপুরার যে সিংহ পরাক্রমে একদিন বঙ্গের সিংহাসন পর্য্যন্ত টলিয়াছিল, যে বিপুল বিক্রমের নিকট মোগল, পাঠান, মঘ ও পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি প্রবল শক্তির মস্তক অবনত হইয়াছিল, সেই শক্তির কত অপচয় ঘটিয়াছে! বলিতে দুঃখ হয়, আত্মদ্রোহিতা এবং অন্তর্বিপ্লবই এই শোচনীয় অবনতির প্রধান কারণ। প্রতিনিয়ত প্রবল মুসলমান শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে ত্রিপুরাকে এরূপ জর্জ্জরিত ও দুর্ব্বল করিয়াছিল যে, পরিশেষে অন্তর্বিপ্লব দমনের নিমিত্তও ত্রিপুরেশ্বরদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান শাসনকর্ত্তার মুখাপেক্ষী হইতে হইত। পরবর্ত্তী বিবরণ আলোচনা করিলে এ বিষয় বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ত্রিপুরার সামরিক বলের অবনতি

রাজ্যঘটিত বিবরণ

রাজধানী প্রতিষ্ঠা

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য, ছত্রমাণিক্য, রামদেব মাণিক্য, রত্নমাণিক্য (২য়), মুকুন্দমাণিক্য ও ইন্দ্রমাণিক্য (২য়), পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের ন্যায় উদয়পুরে রাজপাট প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছেন।

উদয়পুর রাজধানী

মহারাজ জয়মাণিক্য (২য়), ইন্দ্রমাণিক্যের প্রতিযোগীভাবে মোতাই নামক স্থানে নূতন রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। তৎকালে মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্যের রাজধানী উদয়পুরেই ছিল।

মোতাই নামক স্থানে রাজধানী

অতঃপর কিয়ৎকালের নিমিত্ত রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় যুবরাজ কৃষ্ণমণি ঠাকুর (পরে কৃষ্ণমাণিক্য) সপরিবারে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া নানাস্থানে পরিভ্রমণ ও অশেষ বিড়ম্বনা ভোগ করিবার পর, বহু চেষ্টায় পুনর্ব্বার রাজ্যে অধিকার স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিবার পর, কিয়ৎকাল মহারাজ অমরমাণিক্যের অধ্যুষিত রাতাছড়া নামক স্থানে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই স্থানে অধিককাল বাস করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। শত্রু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া নানাস্থানে অবস্থানের পর, মনতলা পরগণায় আসিয়া এক বাড়ী নির্ম্মাণ করেন এবং সেই স্থানে থাকিয়া রাজ্য অধিকারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। কৃষ্ণমণি রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই

আগরতলায় রাজধানী

উদয়পুরের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, মঘ ও মুসলমানগণের আক্রমণ হইতে উদয়পুর নগরী রক্ষা করা নিতান্তই দুরূহ ব্যাপারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাই তিনি উক্ত রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক ১১৭০ ত্রিপুরাব্দে (১৭৬০ খ্রীঃ) আগরতলায় নূতন রাজপাট স্থাপন করেন। তদবধি সেই স্থানেই রাজধানী স্থায়িত্ব লাভ করায়, উদয়পুরের রাজধানীজনিত গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে।

রাজ্যের সীমা

রাজমালা চতুর্থ লহরে সন্নিবিষ্ট ঘটনার কালে রাজ্যের সীমা সম্বন্ধীয় বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সমতল ক্ষেত্র—যাহা মোগল শাসনের কুক্ষিগত ও জমিদারীতে পরিণত হইয়াছিল, তাহা চিরদিনের তরেই রাজ্যের অঙ্কচ্যুত এবং ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারীরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু রাজ্যের সীমা সম্বন্ধে হ্রাস বৃদ্ধি না ঘটিয়া থাকিলেও, উপর্য্যুপরি অন্তর্বিপ্লব ও বহির্বিপ্লবের ফলে রাজ্যের নিতান্তই দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। তদ্বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রজাগণের রাজানুরক্তি

রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকে রাজা এবং রাজ্যের অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবার নিদর্শন আলোচ্য লহরে বিস্তর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। কিন্তু ত্রিপুরা ও কুকি প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রজাবৃন্দের রাজভক্তি ও রাজার প্রতি অনুরক্তি নিতান্তই বিস্ময়ব্যঞ্জক। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের রাজ্যলাভের পূর্ব্ব সময়ে প্রজাবৃন্দের এই অসাধারণ গুণের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সেকালে পার্ব্বত্য প্রজাগণ রাজ্যের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল এবং তাহাদের বাহুবলেই ত্রিপুরার রাজ-শ্রী অম্লান ছিল।

প্রাকৃতিক উপদ্রব

জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ এবং সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ সময় সময় রাজ্যমধ্যে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিত। সংক্রামক পীড়ার মধ্যে বসন্ত রোগের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সংক্রামক রোগের প্রভাব

রাজমালার পূর্ব্ববর্ত্তী লহরসমূহ আলোচনায় দেখা গিয়াছে, অনেক রাজাও ঐ রোগে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। আলোচ্য চতুর্থ লহরে পাওয়া যাইতেছে, মহারাজ ছত্রমাণিক্য বসন্ত রোগে লোকলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। সতর্ক-রক্ষিত রাজদেহ পর্য্যন্ত সংক্রামক রোগাক্রান্ত হওয়ায় সহজেই বুঝা যায়, সেই রোগের প্রকোপ সময় সময় নিতান্তই দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিত। বসন্তের টিকা গ্রহণ না করিবার দরুণই এই রোগ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিত, অবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায়।

বর্ত্তমান সময়েও পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে অনেকে গো-বীজ টিকা গ্রহণ করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক।

জলপ্লাবন ও দুর্ভিক্ষ

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের দেহ রক্ষার পর, তদীয় মহিষী মহারাণী জাহ্নবী মহাদেবী দুই বৎসর কাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই সময় (১১৯৪ ত্রিপুরাব্দে) ভীষণ জলপ্লাবনে সমস্ত সশ্য বিনষ্ট হওয়ায়, রাজ্যমধ্যে দারুণ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষের কথা রাজমালায় যেরূপ ভাষায় বিবৃত হইয়াছে, তাহার আভাস নিম্নে প্রদান করা গেল ;—

"এগার শ চৌরানব্বই ত্রিপুরের সন।
অন্নাভাবে প্রজা ক্ষিতি হইল নিধন॥
মূল্য দিয়া অন্ন নাহি পায় কোন স্থান।
পিতা পুত্র সম্বন্ধেতে অন্ন নাহি দান॥
দুঃখিত কাঙ্গালি যত স্নেহ দূর করে।
ইষ্ট মিত্র পুত্র কন্যা ত্যাগয়ে সত্বরে॥
সহস্রাবধি মৃত্যু হয় অন্নের অভাবে।
বিনা মূল্যে বিক্রী লোক দেখি অসম্ভবে॥"

ইহা ত্রৈপুরী ১১৯৪ সনের অবস্থা। ১১৯৫ সনেও তদ্রূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল ;—

"জলধৌত ধান্য নষ্ট দুর্ভিক্ষ যেমন।
এগার শ পঁচানব্বই হইছে তেমন॥"

উপর্য্যুপরি দুই বৎসরের ভীষণ দুর্ভিক্ষে রাজ্যের যে শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল, উদ্ধৃত রাজমালার বাক্যে তাহার সুস্পষ্ট বিবৃতি পাওয়া যাইতেছে। এ বিষয়ে আর কোনো কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

শিল্প চর্চ্চা ও শিল্পোন্নতি

শিল্প চর্চ্চা ও রাজা সুবড়াই

শিল্প চর্চ্চা ত্রিপুরার চিরাভ্যস্ত উন্নতিজনক সৎকার্য্য। ত্রিপুর রাজ্যের প্রথম শৃঙ্খলাবদ্ধকারী মহারাজ ত্রিলোচন (সুবড়াই রাজা) শিল্প চর্চ্চার আদি প্রবর্ত্তক ; ইহা কলি যুগের প্রারম্ভ কালের কথা। তদবধি রাজ্যমধ্যে নানাবিধ শিল্প কার্য্যের প্রচলন ও ক্রমোন্নতির স্রোত চলিয়া আসিয়াছে।

পার্ব্বত্য প্রজাগণের মধ্যে বহুবিধ শিল্পের আলোচনা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা মহারাজ ত্রিলোচনের প্রদত্ত উৎসাহের ফল বলিয়াই মনে হয়। এই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত নরপতির প্রতি বর্ত্তমান কালেও পার্ব্বত্য অসভ্য সমাজ সর্ব্বান্তঃকরণে

যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে, সভ্য সমাজে তাহার দৃষ্টান্ত সুদুর্ল্লভ। আমরা সভ্যতাভিমানে অন্ধ হইয়া যাহাদিগকে অসভ্য ও বর্ব্বর বলিয়া উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি, তাহাদের কারু নৈপুণ্য একবার মাত্র দর্শন করিলে সেই ধারণা নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিতে হইবে, —সভ্যতা ও শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিমাত্রকেই তাহাদের এই গুণের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইবে। এই সকল গুণের মূলাধার মহারাজ ত্রিলোচন (সুবড়াই রাজা)। সুতরাং পার্ব্বত্য সমাজ আজ পর্য্যন্তও তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। তাহাদের সমাজে প্রচলিত ত্রিপুরা ভাষাজাত যতগুলি রূপকথা আজ পর্য্যন্ত শুনিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটীতেই সুবড়াই রাজার নাম এবং তাঁহার প্রচলিত শিল্প কার্য্যের বিবরণ পাইয়া যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি। রূপকথায় সন্নিবেশিত থাকিবার দরুণই অশিক্ষিত পরিবারের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে সুপবিত্র 'সুবড়াই' নামটী চির জাগরূক রহিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস, বস্ত্র বয়নের প্রধান উপাদান কার্পাস মহারাজ সুবড়াইর প্রযত্নে রাজ্যমধ্যে উৎপাদনের সুত্রপাত হইয়াছিল, এবং যত রকমের শিল্প প্রচলিত আছে, সুবড়াই রাজাই তৎসমুদয়ের প্রবর্ত্তক।

ইহার পরেও রাজগণের কৃপায়ই শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া আসিতেছে এবং বহুবিধ উৎকৃষ্ট শিল্প রাজ অন্তঃপুর হইতে বাহিরে প্রচারিত হইয়াছে। মহারাজ আচং ফাএর মহিষী রাজপরিবারের মধ্যে শিল্পকার্য্যের চর্চ্চা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।* মহারাজ খিচোং ফাএর মহিষী স্বহস্তে শিল্পকার্য্য করিয়া মহিলাবৃন্দকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। পরবর্ত্তীকালেও রাজঅন্তঃপুরে শিল্পচর্চ্চা পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত থাকিবার নিদর্শন পাওয়া যায়। ত্রিপুর রাজ্যে প্রচলিত শিল্পকার্য্যের মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান কার্য্যের স্থূল বিবরণ এ স্থলে প্রদান করা যাইতেছে।

শিল্পকার্য্যের উৎকর্ষ বিধান

ত্রিপুরার শিল্পকার্য্যের মধ্যে বয়ন শিল্পের কথাই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই শিল্পের বিবরণ রাজমালার পূর্ব্ববর্ত্তী লহরসমূহে যথাসম্ভব প্রদান করা হইয়াছে, এ স্থলে অধিক বলিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। অরণ্যবাসী ত্রিপুরা, কুকি, হালাম, ও রিয়াং প্রভৃতি সকল শ্রেণীর রমণীই আপন আপন পরিবারের শাড়ী, পাছড়া, দুবড়া, চাদর প্রভৃতি, প্রতিনিয়ত ব্যবহার্য্য বস্ত্রসমূহ স্বয়ং বয়ন করিয়া লয়। এই কার্য্য রমণী সমাজের করণীয়। বয়ন শিল্পের মধ্যে বক্ষ আবরণী রিয়া (কাঁচলি) শিল্প নৈপুণ্যে কিরূপ উচ্চ স্থান অধিকার করিবার যোগ্য, রাজমালার প্রথম ও দ্বিতীয় লহরে তদ্বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ত্রিপুরার প্রধানমন্ত্রী স্বর্গীয় ধনঞ্জয় ঠাকুর মহোদয় 'রিয়া' শব্দটী সংস্কৃত শব্দের

বয়নশিল্প

* রাজমালা—১ম লহর, ১১৫ পৃষ্ঠা

অপভ্রষ্ট বলিয়া মনে করিতেন ; তাঁহার মতে 'হ্রী-হা' (হ্রী—লজ্জা, হা—ত্যাগ বা নিবারণ) শব্দ হইতে 'রিয়া' শব্দের প্রচলন হইয়াছে। রমণীগণ এই বস্ত্রদ্বারা বক্ষাবৃত করিয়া লজ্জা নিবারণ করে বলিয়াই উত্তরূপ নাম প্রদান করা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। ত্রিপুরা, কুকি ও হালাম প্রভৃতির ভাষা আলোচনা করিলে সংস্কৃতমূলক অনেক শব্দ পাওয়া যায়।

ত্রিপুরায় বর্ত্তমানকালেও বয়ন শিল্পের প্রচলন কত বেশী, বিগত ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আদম সুমারীর ফল আলোচনা করিলে তাহা বুঝা যাইবে। এই গণনাকার্য্যে জানা গিয়াছে, রাজ্যস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে ৯৮,৯৬৮ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১,৯২৫ জন অল্পবয়স্কা বালিকার সংখ্যা বাদ দিলে, তাঁত পরিচালনের উপযোগী জনসংখ্যা ৯৭,০৪৩ আছে। তাহাদের মধ্যে ৪১,৪২৪ খানি তাঁত ও ৪১,১১৯ টী চরকা চলিতেছে। বিলাতী সূতার প্রভাবে, চরকার প্রচলন নিতান্তই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

বাঁশ ও বেতদ্বারা নিত্যপ্রয়োজনীয় নানাবিধ সুদৃশ্য ও টেকসই বস্তু প্রস্তুত করা হয়। এতজ্জাতীয় শিল্পের মধ্যে টেবুল, নানাপ্রকারের আসন, আবজ্জীনার ঝুড়ি, বাজার সদায়ের ঝুড়ি, অকর্ম্মণ্য কাগজের ঝুড়ি, পেটারা, আলোকাধার, ডালা, কুলা, ধুচনী, লাই, ওড়া, ধারী, চাটাই ও পাঙ্খা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কারুকার্য্যখচিত ঘরের বেড়া, টংগৃহ, তোরণদ্বার, বিবাহ বেদীর বেড়া ইত্যাদি অনেক কাজ দেখিলে শিল্পীগণের নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বংশ ও বেত্র শিল্প

ত্রিপুরার কাষ্ঠশিল্পও উল্লেখযোগ্য। পর্ব্বতবাসীগণ বৃহদাকারের বৃক্ষ খোদাই করিয়া কোন্দা ও লং নৌকা প্রস্তুত করে। এই দুই জাতীয় নৌকা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এবং তলা চেপ্টা হওয়ায় অল্প জলে চলাচল করিবার পক্ষে সুবিধাজনক ; অথচ জলের অভ্যন্তরস্থ অদৃশ্য বৃক্ষ ও প্রস্তরের আঘাতে এই সকল নৌকার কোনরূপ ক্ষতি হয় না। পার্ব্বত্য নদীপথে গমনাগমনের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের সমরতরীসমূহের মধ্যে অন্যান্য জাতীয় নৌকাসহ এই দুই জাতীয় নৌকা ব্যবহৃত হইবার প্রমাণ রাজমালা দ্বিতীয় লহরে পাওয়া গিয়াছে।*

কাষ্ঠ শিল্প

টেবুল, চেয়ার, আলমিরা, তাক, কেবিনেট, স্ক্রিন, চৌকি, পিড়ি, গামলা প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় সুন্দর সুন্দর বস্তু কাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেতার, এসরাজ প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রও কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত হয়। আনন্দের কথা

---

* রাজমালা—২য় লহর, ১১৭—১১৮ পৃষ্ঠা

এই যে, রাজবরিবারস্থ অনেক ব্যক্তিও এই কার্য্যে সুদক্ষ, এবং বিস্তর শ্রম স্বীকার করিয়া স্বহস্তে অনেক কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

ধাতুশিল্প

ত্রিপুরার ধাতুশিল্পের কথা এ স্থলে উল্লেখ করিবার যোগ্য। রাজমালা দ্বিতীয় লহরে পাওয়া গিয়াছে, মহারাজ বিজয়মাণিক্য ধ্বজঘাট হইতে বাণিয়া (সুবর্ণ বণিক) ও কাঁসারী (কাংস বণিক) আনিয়া রাজ্যমধ্যে কাস-পিত্তলের বাসন ও সুবর্ণাদি নির্ম্মিত নানাবিধ আভরণ নির্ম্মাণের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল কারু-শিল্প দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়া, রাজ্যকে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছে। লোহাদ্বারা দাও, কাস্তিয়া, খন্তা, কোদাল, কুড়াল, কাটারী, টাক্কল (ত্রিপুরা ও কুকি প্রভৃতির ব্যবহার্য্য দাও) ইত্যাদি গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুসকল নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ভল্ল, তরবারি, জাঠা প্রভৃতি অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতেও দেখা যায়।

মৃৎশিল্প

হাড়ি, সড়া, কলসী, ঘট, থালা, গ্লাস, সুরাই, কলকী প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের বাসন ও প্রয়োজনীয় বস্তু মৃত্তিকাদ্বারা নির্ম্মাণ করা হয়। নানাবিধ খেলেনা ও দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণের কথা এ স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চীনা বাসন প্রস্তুত করিবার মৃত্তিকা (Kaolin) রাজধানী আগরতলার সন্নিহিত স্থানেই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা নির্ম্মিত চায়ের পেয়ালা ও বাসন ইত্যাদি উৎকৃষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে।

দন্ত ও শৃঙ্গশিল্প

গজদন্তদ্বারা কৌটা, বাক্স, চেয়ার, খেলেনা, প্রতিমূর্ত্তি, পাটী ও বিবিধ প্রকারের কারুকার্য্যখচিত বস্তু নির্ম্মিত হয়। রাজসিংহাসন ও দরবারে ব্যবহৃত রাজাসন গজদন্তখচিত। এতদ্ব্যতীত নানাবিধ কারুকার্য্য সমন্বিত বস্তু গজদন্ত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। রাজমালা তৃতীয় লহরে এতজ্জাতীয় কতিপয় বস্তুর আদর্শ প্রদান করা হইয়াছে।

হরিণ, মহিষ ও গবয়ের শৃঙ্গদ্বারা নিত্য ব্যবহার্য্য নানাবিধ বস্তু নির্ম্মাণ করা হয়। গৃহ-সজ্জার অনেক উপকরণ এতদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

চর্ম্মশিল্প

ছাগ, গো, মেষ ও মহিষাদির চর্ম্ম পাকা করিয়া তদ্দ্বারা পাদুকা, দোয়ালী প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে পাদুকার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইদানীন্তন গজ-চর্ম্মেরও ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে. এতজ্জাতীয় চর্ম্ম নির্ম্মিত ট্রাঙ্ক ও উপবেশনের আসনাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

বিবিধ শিল্প

খড়, লতা ইত্যাদির দ্বারা নানাবিধ বস্তু নির্ম্মিত হয়। সীবন শিল্পও ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য সম্পদ। তৎসমস্তের সম্যক উল্লেখ করিতে হইলে স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন হয়।

সমাজতত্ত্ব

রাজমালা চতুর্থ লহরের ঘটনার সমসাময়িক কালে সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা সম্যক অবগত হইবার উপায় নাই। মোটামুটি এই বুঝা যায়, সাধারণতঃ সকলেই দেব দ্বিজে শ্রদ্ধাবান এবং সৎকর্ম্মান্বিত ছিলেন। রাজপরিবারস্থ অনেক ব্যক্তিকে রাজ্যলাভের প্রয়াসী হইয়া অসঙ্গত পথ অবলম্বন করিতে দেখা থাকিলেও তাঁহারা ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠানে বিমুখ ছিলেন না। এই সময়ও পূর্ব্বকালের ন্যায় সমাজে মদিরার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই যুগের সমাজ সম্বন্ধীয় একটী কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের শাসনকালের পূর্ব্বে ত্রিপুরাবাসিগণ পরিষ্কৃত লবণ ব্যবহার করা দূরের কথা, এই বস্তু তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে কি না, সে বিষয়েও সন্দেহের উদ্রেক হয়। বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত যে রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল, সেই রাজ্যে কখনও লবণের অভাব ঘটিয়াছে, এমন কথা মনে করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ ত্রিপুর রাজ্যে সামুদ্র-লবণ ব্যতীত, উদ্ভিজ্জ-লবণ ও খনিজ লবণ ব্যবহারের প্রথা স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমান কালেও লবণাক্ত উদ্ভিদ পদার্থ এবং লবণের খনি রাজ্য মধ্যে বিস্তর আছে ; এবং তৎসমস্ত হইতে ক্ষার ও লবণ সংগ্রহ করিবার প্রণালী সকলেরই জানা আছে। এতদ্ব্যতীত কোনো কোনো পার্ব্বত্য-নির্ঝরিণীর জল এত কটু যে, তদ্দ্বারা যে-কোন বস্তু পাক করিলে আর অন্য লবণের প্রয়োজন হয় না। এই সকল বিবরণ আলোচনা করিলে বুঝা যায়, রাজ্যমধ্যে কখনও লবণের অভাব ঘটে নাই, কিন্তু অপরিষ্কৃত এবং কদর্য্য ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সমাজে পরিষ্কৃত লবণের ব্যবহার

মহারাজ গোব্দিমাণিক্যের সময়ে এক বণিক রাজ্যমধ্যে শুভ্র ও পরিষ্কৃত লবণের প্রথম আমদানী করে। ত্রিপুরেশ্বর হস্তীর বিনিময়ে সেই লবণ ক্রয় করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে ;—

"একজন সদাগর আনিল লবণ।
হস্তী দিয়া সেই লবণ লইল রাজন॥"

গোবিন্দমাণিক্য খণ্ড—১৩ পৃষ্ঠা।

মহারাজ ছত্রমাণিক্যের বংশধরগণের হস্তে রক্ষিত পুথির বাক্য অধিকতর প্রাঞ্জল ও পরিস্ফুট ; তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

"ধনবন্দ এক সাধু দেশেতে আসিল।
দুই সহস্র মণ লবণ নৌকাএ আনিল॥

রাজার সাক্ষাতে সাধু পত্র পাঠাইল।
পত্র শুনি মহারাজ সন্তোষ হইল ॥
উপযুক্ত চর পাঠাইল তার পাশে।
লবণের কিরূপ মূল্য কহ সবিশেষে ॥
আনিছি রাজার দেশে হস্তীর কারণ।
লবণ আনিছি আমি দুই সহস্র মণ ॥
সাধুর এমত কথা রাজায় শুনিয়া।
সাধুরে দিলেক হস্তী লবণ রাখিয়া ॥"

সেকালে বিনিময় বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। চন্দ্রধর ও ধনপতি প্রভৃতি রাজকল্প প্রাচীন বণিকগণ বিনিময় বাণিজ্যের ফলে কিরূপ ধনকুবের হইয়াছিলেন, প্রাচীন সাহিত্যামোদি ব্যক্তিগণ তাহা অবগত আছে। ত্রিপুরেশ্বর দুই সহস্র মণ লবণের বিনিময়ে হস্তী প্রদান করিয়াছিলেন,—চন্দ্রধরের 'জিরার বদলে হীরা' লাভের তুলনায় ইহা অতিরিক্ত মূল্য বলা যাইতে পারে না। সেকালে ত্রিপুর রাজ্যের হস্তী-বিভব এত অধিক ছিল যে, সাধারণ গৃহস্থের নিকট গো ছাগাদি যেরূপ মূল্যবান বিবেচিত হইত, রাজগণ হস্তীকে তদপেক্ষা অধিক মূল্যবান বলিয়া মনে করিতেন না। রাজ্যময় আরণ্য হস্তী ছিল, প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক হস্তী ধৃত করিবার ব্যবস্থা ছিল, এবং ত্রিপুরেশ্বরগণ বিনা মূল্যে বিস্তর হস্তী সম্পদের অধিকারী ছিলেন।

এই মূল্যবান ও সুদুর্ল্লভ বস্তু ক্রয় করিয়া, উদারচেতা গোবিন্দমাণিক্য একাকী ভোগ করেন নাই, অথবা কেবল পরিবার মধ্যে তাহা বিতরণ করিয়াছেন, এমনও নহে ;—

"উদয়পুর প্রজা যত পাত্রমিত্রগণ।
সকলকে মহারাজা দিল সে লবণ ॥"

এই লবণ বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে, 'নিমকের সত্য' পালনের কথাও সকলকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, যথা,—

"রাজা বলে এই লবণ খাও যেই জন।
আমা বংশে দুষ্ট ভাব না কর কখন ॥"

এই সময় হইতে ত্রিপুর রাজ্যে পরিষ্কৃত লবণের আমদানী ও ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল, ইহা স্পষ্টতরভাবে বুঝা যাইতেছে। বণিকের আনীত লবণ অভিনব এবং আশ্চর্য্যজনক মনে না হইলে তাহা হস্তীর বিনিময়ে গ্রহণ করা সম্ভব হইত না।

শাসন তন্ত্র

রাজমালা চতুর্থ লহরে সন্নিবিষ্ট ঘটনার সমসাময়িক কালে উজীর, সুবা ও দেওয়ান পদবীধারী প্রধান কল্পের কর্ম্মচারীবর্গদ্বারা শাসন-পরিষদ গঠিত হইয়াছিল। কোনো কোনো রাজার শাসনকালে যুবরাজগণ দ্বারা রাজ্য শাসিত হইবার প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে যে পদ্ধতি অবলম্বনে শাসনতন্ত্র গঠিত হইত, এই সময় তাহার বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

শাসন প্রণালী

মহারাজ রত্নমাণিক্য (১ম) মুসলমান শাসনের অনুকরণে যে শাসন প্রণালী রাজ্যে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই সময় পর্য্যন্ত তাহাই প্রবল থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায় ; কাল-স্রোতের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সময় সময় শাসন পদ্ধতি কালোপযোগী করিবার অনুরোধে কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিলেও তদ্বারা মূল নীতির ব্যত্যয় ঘটে নাই। পূর্ব্ব হইতেই সেনাপতিগণের হস্ত হইতে শাসনকার্য্য উঠাইয়া লইয়া, উজীর, মন্ত্রী ও দেওয়ান প্রভৃতি পদে নিয়োজিত কর্ম্মচারীবর্গের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছিল, এই সময়ও সেই প্রথা প্রবল ছিল। প্রয়োজন স্থলে শাসন পরিষদে নিয়োজিত কর্ম্মচারিগণও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য ছিলেন। সুতরাং তৎকালে সৈনিক ও শাসন বিভাগ সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা হইয়াছিল, এ কথা বলা যাইতে পারে না ; তবে, পূর্ব্বের ন্যায় সেনাপতিগণের হস্তে শাসন ও সৈনিক বিভাগের ভার অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যস্ত ছিল না, ইহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে।

শাসন পরিষদের অবস্থা

বিচারকার্য্যের নিমিত্ত এই সময়ও আইন প্রণয়ন বা আদালত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা ছিল না। শাসন কর্ত্তাগণই বিচারের অধিকারী ছিলেন। এই ব্যাপারে অর্থী-প্রত্যর্থী কাহারও কোনোরূপ ব্যয়ের প্রয়োজন হইত না। অভিযোগ উপস্থিত কালে অর্থীকে রাজ্যেশ্বরের নজর বাবত যৎসামান্য ব্যয় বহন করিতে হইত মাত্র। এই প্রথা প্রকৃতিবর্গের পক্ষে হিতকর ছিল ; এবং বিচার কার্য্যও সুনিয়ন্ত্রিত ছিল বলিয়াই বুঝা যায়।

বিচারকার্য্যের অবস্থা

গুরুতর অপরাধের জন্য কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে, প্রকাশ্য স্থানে সর্ব্বসমক্ষে অপরাধীর শিরশ্ছেদ করা হইত। এই সময় অপরাধের গুরুত্ব-লঘুত্ব বিবেচনায় কয়েদের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু জেইলে থাকিবার বিধান ছিল না। কয়েদীগণ সরকারী কর্ম্মচারীর দৃষ্টাধীনে হাজির থাকিয়া, আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিত। এই দণ্ডকালের নিমিত্ত তাহারা সরকার হইতে ভরণ পোষণ ব্যয় পাইত।

অপরাধীর দণ্ড ব্যবস্থা

রাজমালা চতুর্থ লহরের সময়ে পার্ব্বত্য প্রজাগণ, পূর্ব্ববৎ বার্ষিক ভেট ও নির্দ্দিষ্ট রাজকার্য্য সম্পাদন দ্বারা রাজকর পরিশোধ করিত। এই সময়ও তাহাদের মুদ্রা-কর প্রদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সমতল প্রদেশে ভূমির রাজস্ব অতি অল্প হারে গ্রহণ করা হইত। মহারাজ গোবিন্দমণিক্য ভূমির কাণি প্রতি চারি আনা রাজস্ব অবধারণ ও তাহা স্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে সিকি মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় গোবিন্দমাণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে ;—

রাজকর

"চারি আনা কাণি ভূমি করে রাজকর।
চারি আনা নিজ নামে মারিল মোহর ॥" ইত্যাদি।

এই উক্তিদ্বারা জানা যাইতেছে, প্রজাদিগকে করভারে প্রীড়িত করা রাজগণের অভিপ্রেত ছিল না। এই কারণেই মহারাজ গোবিন্দ, কাণি প্রতি চারি আনা কর নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন। কেবল ইহা করিয়াই তিনি নিরস্ত হন নাই, ভবিষ্য রাজগণের যাহাতে এ বিষয়ে দৃষ্টি পতিত হয়, তদ্রূপ ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, আমার বংশে যে ব্যক্তি ভূমির রাজস্ব কাণি প্রতি চারি আনা হারে গ্রহণ করিবেন, তিনি নিজ নামে সিকি মুদ্রা প্রচলন করিতে পারিবেন। এতদতিরিক্ত করগ্রাহী রাজা নিজ নামে সিকি মুদ্রা প্রচারের অধিকারী হইবেন না। * তদবধি ত্রিপুরেশ্বরগণ এই আদেশ বাণী প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন।

মুসলমান প্রভাবের প্রারম্ভকাল হইতেই তাঁহারা ত্রিপুরেশ্বরগণ হইতে কর গ্রহণ করিতে চেষ্টিত ছিলেন। মহারাজ রাজধরমাণিক্য, যশোধরমাণিক্য, দ্বিতীয় কল্যাণমাণিক্য প্রভৃতি রাজগণের শাসনকালে ত্রিপুর রাজ্য হইতে হস্তি-কর গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মুসলমান শাসন- কর্ত্তাগণ বারম্বার চেষ্টা করিয়াছেন, এতদুপলক্ষে যুদ্ধ-বিগ্রহও অনেক হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের শাসনকালে রাজ্যের করস্বরূপ পাঁচটি হস্তী প্রদান করিবার নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়। তন্মধ্যে একটী হস্তীর অর্দ্ধমূল্য ত্রিপুরেশ্বর পাইতেন ৪$\frac{১}{২}$ টী হস্তী মোগল

রাজ্যের কর অবধারণ

---

* "আমা বংশে চারি আনা কাণি কর লয়।
সেই রাজা চারি আনী মারিব নিশ্চয় ॥
আর রাজার সিকির কার্য্য হয়ত যখন।
গোবিন্দমাণিক্যের সিকি করিব তখন ॥
রাজার নিষেধ বাণী শুনহ রাজন।
অন্য রাজা সিকি মোহর না মারে কখন ॥"
গোবিন্দমাণিক্য খণ্ড — ১২ পৃষ্ঠা।

সরকারের প্রাপ্য ছিল। পরবর্ত্তীকালে হস্তীকরের পরিমাণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ৪½ টী হস্তী স্থলে ৫৩টীতে পরিণত হইয়াছিল. পরিশেষে হস্তীর পরিবর্ত্তে মূল্য বাবত প্রতি হস্তীর নিমিত্ত ১০০০৲ (এক হাজার) টাকা প্রদানের ব্যবস্থা হয়। রাজ্যের পশ্চিমাংশ মুসলমানগণের করকবলিত ও ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারীরূপে পরিণত হইবার পর হইতে এই কর প্রদানের প্রথা বন্ধ হইয়াছে। এতদ্বিষয়ক বিশদ বিবরণ প্রাসঙ্গিকভাবে ক্রমশঃ বিবৃত হইবে।

প্রয়োজন স্থলে নরপতিগণ কূটনীতি অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। মহারাজ ধন্যমাণিক্য ও বিজয়মাণিক্যের কূটনীতি অবলম্বনবিষয়ক বিবরণ রাজমালার দ্বিতীয় লহরে পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্য লহরে মহারাজ দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনকালে সৈনিক বিভাগে বিস্তর মঘ সৈন্য স্থানলাভ করিয়াছিল এবং রাজ্যে মঘ প্রজার সংখ্যাও অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহারা সংখ্যাধিক্য বশতঃ দলবদ্ধ হইয়া পদে পদে রাজাজ্ঞায় অবহেলা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহারাজ ধর্ম্ম বুঝিলেন, ইহাদিগকে অচিরাৎ দমন করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু কূটনীতির অনুসরণ ব্যতীত সঙ্ঘবদ্ধ প্রবল শক্তিকে নির্য্যাতন করা সহজসাধ্য হইবে না। তাই, তাহাদিগকে দমনের নিমিত্ত প্রকাশ্যে কোনোরূপ অনুষ্ঠান না করিয়া, সদয় ব্যবহারে রাজভবনে আহারের নিমন্ত্রণ করা হইল। রাজার আমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত সকলেই বিশেষ আগ্রহের সহিত উপস্থিত হইয়াছিল। প্রচুর পরিমাণে মদ্য মাংস প্রদানদ্বারা তাহাদিগকে পরিতোষ করা হইল। তাহারা অতিরিক্ত মদ্যপানে বিহ্বল হইবার পর, সদরদ্বারের কপাট বন্ধ করিয়া, অধিকাংশকে বধ করা হইয়াছিল। যাহাদের কথঞ্চিৎ সংজ্ঞা ছিল, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোক প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পলায়ন করিল। তদ্ব্যতীত সকলেই উলঙ্গ তরবারির মুখে জীবন সমর্পণ করিয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতে মগ প্রজাগণ নির্য্যাতিত ও বশতাপন্ন হইয়াছিল।

কূটনীতির অনুসরণ

সেকালের ত্রিপুরেশ্বরগণ নিতান্ত উদারচেতা ছিলেন। তন্মধ্যে মহারাজ গোবিন্দ-মাণিক্যের নাম সর্ব্বাগ্র উল্লেকযোগ্য। তিনি পিতার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন, কিন্তু তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নক্ষত্ররায় ইহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া মহারাজ গোবিন্দ, ভ্রাতার এই মনোগত ভাব জানিয়াও সরল চিত্তে তাঁহাকে প্রতিনিধির দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিয়োগ করিয়া নবাব দরবারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভ্রাতার রাজ্যলালসা থাকিলেও তদ্দ্বারা তাঁহার কোনোরূপ অনিষ্ট আশঙ্কা থাকিতে পারে, এরূপ সন্দেহকে তিনি মনে স্থান দিতে পারেন নাই। কিন্তু এই কার্য্যদ্বারা নক্ষত্ররায়ের মনোরথ পূর্ণ করিবার পথ সুগম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি এক বৎসর কাল নবাব দরবারে অবস্থান করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

ত্রিপুরেশ্বরগণের ঔদার্য্য

এবং মহারাজ গোবিন্দকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া স্বয়ং রাজ্যলাভের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অল্পকাল মধ্যেই বঙ্গেশ্বরের প্রদত্ত সৈন্যবল লইয়া নক্ষত্ররায় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। গোবিন্দমাণিক্য সময় থাকিতেই এই বার্ত্তা পাইয়াছিলেন। মন্ত্রীবর্গ যুদ্ধোদ্যমের নিমিত্ত বারম্বার অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহারাজ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, —

"ভাই সনে করি যুদ্ধ কিসের কারণ
আত্ম কলহ হইলে প্রজা নষ্ট হয়।
পাপেতে হইব স্থিতি বলিল নিশ্চয়
রাজত্ব করিল আমি বর্ষ পরিমাণ।
এখনি রাজত্ব জান তাহান বিধান"

গোবিন্দমাণিক্য খণ্ড — ৬ পৃষ্ঠ।

রাজর্ষি গোবিন্দ, ভ্রাতৃ রুধিরে অনুরঞ্জিত সিংহাসন ভোগ করা অপেক্ষা রাজ্য ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। তিনি ভ্রাতার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, মহিষীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক নিঃসম্বল অবস্থায় অকাতরে রাজ্য হইতে বাহির হইয়া গেলেন। এই ঘটনা মহারাজ গোবিন্দের সামান্য ঔদার্য্যের পরিচায়ক নহে।

তাঁহার উদারতরা দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজা গোবিন্দমাণিক্যের বিরদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করেন। মহারাজ গোবিন্দ নিতান্ত নিরাশ্রয় অবস্থায়ও শাহ সুজার আপৎকালে তাঁহাকে আশ্রয় দান ও যথোচিত সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বিশেষতঃ ইঁহার নাম স্মরণীয় করিবার নিমিত্ত একটী মসজিদ প্রতিষ্ঠাদ্বারা অলৌকিক ওদার্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তদ্বিবরণ অতঃপর বিবৃত হইবে।

মহারাজ গোবিন্দ দ্বিতীয় বার রাজত্বলাভের পর, স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ছত্রমাণিক্যের (নক্ষত্ররায়ের) পুত্র উৎসব রায়কে নবাব দরবারে প্রতিভূস্বরূপ প্রেরণ করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করেন নাই ; ইহা অসাধারণ ওদার্য্য ও অলৌকিক অমায়িকতার পরিচায়ক নহে কি ?

মহারাজ গোবিন্দ 'জীবে দয়া' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বালিয়া জানিয়াছিলেন। তিনি প্রাণী হিংসা বর্জ্জনোদ্দেশ্যে দেবালয় জীব বলি বন্ধ করেন। চতুর্দ্দশ দেবতার ও ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরের মোহান্ত (চন্তাই) এই কর্য্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন ; তিনি ধর্ম্মনাশের দোহাই দিয়া প্রজাবর্গকে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। রাজার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের রাজ্যলাভের পিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া, তিনি চন্তাইর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন এবং অতঃপর মোগলবাহিনীর সাহায্যে রাজ্য ও

সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। মহারাজ গোবিন্দ স্বচ্ছন্দ চিত্তে রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু তিনি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। এতদুপলক্ষে যুগপৎ অন্তর্বিপ্লব ও বহির্বিপ্লব সঙ্ঘটিত হওয়ায়, রাজ্যের ও নিজের যে দুর্গতি ঘটিয়াছিল, তৎপ্রনিত তিনি দৃক্‌পাত করিলেন না।

এতদ্ব্যতীত রিয়াং সম্প্রদায়ের প্রতি মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য ও তদীয় মহিষী মহারাণী গুণবতী মহাদেবীর দয়া প্রকাশের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তথা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করা হইবে।

গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র মহারাজ রামদেবমাণিক্য অতিশয় উদার ছিলেন। সরাইলের জমিদার নুর মাহামুদের পুত্র নাছির মাহামুদের (১) সহিত রামমাণিক্যের এক কুমারের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। একদা উভয়ে একযোগে মৃগয়ায় বহির্গত হইলে, দৈবাৎ নাছির মাহামুদের বন্দুকের গুলিতে রাজকুমার নিহত হইলেন (২)। নুর মাহামুদ এতদ্বিবরণ অবগত হইয়া, রাজপুত্রঘাতী নাছিরকে রাজদরবারে প্রেরণ করিয়া জানাইলেন,—"আমার পুত্র নাছির মাহামুদ, রাজকুমারকে বধ করিয়াছে। তাহার এই গুরুতর অপরাধের দণ্ড বিধান জন্য মহারাজ সমক্ষে প্রেরণ করিলাম"। এই ক্ষেত্রে উদারচেতা মহারাজের কার্য্য সম্বন্ধে রাজমালা বলিয়াছেন,—

"রামমাণিক্য রাজা পুণ্যের ভাজন।
পুত্রবধী নাছিরকে না মারে রাজন ॥
রাজা বলে তাকে বধি কিবা ফল হবে।
তার ফল পরলোকে সেই যে পাইবে ॥"

রামমাণিক্য খণ্ড — ১৭ পৃষ্ঠা।

মহারাজ মনে করিলেন, এই দুর্ঘটনা নাছিরের ইচ্ছাকৃত নহে, বিশেষতঃ তাহাকে বধ করিলেও মৃত পুত্র ফিরিয়া আসিবেন না। সুতরাং ইহার দণ্ড বিধান করিয়া কোনও ফলের আশা নাই। ইহার কার্য্যের উপযুক্ত ফল ভগবানই প্রদান করিবেন। মহারাজ তাহার কোনোরূপ দণ্ড বিধান করিলেন না। অধিকন্তু, তাহাকে সস্নেহ বাক্যে আশ্বাসিত করিয়া, পিতার নিকট ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

---

(১) নাছির মাহামুদের নাম রাজমালায় "নাছির আলী" লিখিত হইয়াছে।

(২) নিহত রাজকুমারের নাম 'চন্দ্রসিংহ" লিখিত হইয়াছে। বংশাবলী আলোচনায় জানা যায়, রামমাণিক্যের চতুর্থ পুত্র মুকুন্দমাণিক্যের অন্য নাম 'চন্দ্রমণি' ছিল। ইনি পিতার পরলোকগমনের পরে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং নাছির মাহামুদ কর্ত্তৃক ইনি নিহত হন নাই, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সমগ্র অবস্থা আলোচনা করিলে মনে হয়, মহারাজ রামমাণিক্যের চন্দ্রসিংহ নামক অন্য এক পুত্র ছিলেন, তিনিই নাছির মাহামুদের হস্তে নিহত হন। সম্ভবতঃ অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার নাম বংশাবলীতে লিখিত হয় নাই।

নাছির বলিল, — অনিচ্ছাকৃত হইলেও তাহার কার্য্যের দ্বারা রাজপুত্র নিহত হইয়াছেন, সুতরাং তাহার উপযুক্ত দণ্ড হওয়া সঙ্গত। বিশেষতঃ যে পিতা তাহাকে বধার্থ রাজদরবারে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই পিতার আশ্রয়ে পুনর্ব্বার যাইতে নাছির অসম্মত। তাহার অবস্থা দর্শনে রাজার কোমল হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি তাহাকে বিস্তর অর্থ সম্পত্তিদ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন, এবং পিতা হইতে স্বতন্ত্রভাবে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

নাছির মাহামুদ রাজানুকম্পায় লব্ধ অর্থদ্বারা এক নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। ঘর প্রস্তুতের কারিকরগণ কাষ্ঠের সুবৃহৎ ও গুরুভারবিশিষ্ট বহুসংখ্যক খাম বহন করিয়া অতিশয় ক্লিষ্ট হওয়ায়, নিতান্ত দুঃখের সহিত যে কথা বলিয়াছিল, তাহা অদ্যাপি গ্রাম্য ছড়ায় প্রচলিত রহিয়াছে। তাহারা বলিয়াছিল,—

"রাজারে পাইল ভূতে।
ঠুনী* বহাইয়া মারে নুর মামুদের পুতে॥"

এই একটী ঘটনায়ই মহারাজ রামমাণিক্যের ঔদার্য্যের উজ্জ্বল চিত্র আমাদের নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হইতেছে। তাঁহার সরলতা ও উদারতার আরও দৃষ্টান্ত আছে, যথাস্থানে তাহা প্রদান করা হইবে।

মহারাজ রত্নমাণিক্যের (২য়) উদারতার কথা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। ইঁহার রাজত্বকালে, স্বীয় ভ্রাতা ঘনশ্যাম ঠাকুরকে মুরশিদাবাদের দরবারে প্রতিনিধিস্বরূপ রাখা হইয়াছিল। এই সুযোগে ঘনশ্যাম পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিনিধিগণের নীতির অনুসরণ করিলেন, — নবাবকে বশীভূত করিয়া একদল সৈন্যসহ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। এই বার্ত্তা পাইয়া মন্ত্রীবর্গ যুদ্ধের আয়োজন করিতে চাইলেন, কিন্তু রাজা ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাতে সম্মতি দান করিলেন না। এদিকে ঘনশ্যাম সসৈন্যে উদয়পুর আসিয়া রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন এবং রাজাকে হাত ধরিয়া সিংহাসন হইতে টানিয়া নামাইলেন। রত্নমাণিক্য ভ্রাতার এরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত বা বিচলিত হইলেন না। বরং আনন্দের সহিত বলিলেন,—

"রাজা বলে ভাই মহেন্দ্রক্ষণেতে আসিল।
মহেন্দ্রমাণিক্য নাম রাজায় রাখিল॥"

রাজার রক্ষিত নামই স্থিরতর রহিল, ঘনশ্যাম ঠাকুর মহেন্দ্রমাণিক্য নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনারূঢ় হইলেন। তিনি কেবল সিংহাসন অধিকার করিয়াই নিরস্ত হইলেন না, সঙ্গে সঙ্গে রত্নমাণিক্যকে কারারুদ্ধ করিলেন। এই সময় নবীন

---

* ঠুনী—খাম।

ভূপতির নূতন সহচর নীচাশয় চাটুকারগণ প্রভুর প্রীতিবিধানের নিমিত্ত বলিতে লাগিলে,—

"একদেশে দুই রাজা না হয় উচিত।
এক বনে দুই ব্যাঘ্র থাকে কদাচিত॥
এক স্ত্রীতে দুই স্বামী না থাকে কখন।
এক কোষে দুই খড়্গ না হয় পোষণ॥
হেনমতে রাজা স্থানে কুতর্ক জন্মায়।
ভ্রাতৃবধ ভয় রাজা না চিন্তিল তায়॥"

এই মন্ত্রণা, মহেন্দ্রমাণিক্যের রুচিকর হইল, তিনি কারারুদ্ধ রত্নমাণিক্যকে বধ করিয়া সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিলেন। রাজগণের ঔদার্য্য ও সরলতার পরিচয় প্রদান করিতে যাইয়া। প্রসঙ্গক্রমে মহেন্দ্রমাণিক্যের চরিত্র-কথার অবতারণা করিতে হইল। ইহা অশোভনীয় হইলেও, মহারাজ রত্নমাণিক্যের চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য প্রতিপাদনের নিমিত্ত, তৎপার্শ্বে এই কালিমাময় চিত্র উদঘাটনের প্রয়োজন ঘটিয়াছে। উদারচেতা মহারাজ রামদেবমাণিক্যের পুত্রগণের মধ্যে চরিত্রের পরস্পর কত পার্থক্য ঘটিয়াছিল, উক্ত বিবরণ আলোচনা করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

রাজার ও রাজ্যের অবস্থা

রাজমালা চতুর্থ লহরের অন্তর্নিবিষ্ট সময়ের মধ্যে অনেক নৃপতি শান্তির সহিত রাজ্যসুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। অন্তর্ব্বিপ্লব ও বহির্ব্বিপ্লব হেতু সর্ব্বদা তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত। পারিবারিক বিরোধ ও মোগলশক্তির প্রভাবে ত্রিপুরার রাজনীতিকে প্রতিভা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছিল। পশ্চাল্লিখিত বিবরণ আলোচনা করিলে এ বিষয় স্পষ্টতরভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের শাসনকাল

মহারাজ গোবিন্দ-মাণিক্যের রাজ্যলাভের কাল

ত্রিপুরেশ্বর কল্যাণমাণিক্যের লোকান্তর গমনের পর, তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র, গোবিন্দ মাণিক্য ১০৭০ ত্রিপুরাব্দে (১৫৮২ শক) পিতৃসিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। ইনিই রাজমালা চতুর্থ লহরের অন্তর্গত প্রথম রাজা।

নবাব দরবারে প্রতিনিধি নিয়োগ

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মহারাজ গোবিন্দকে কিয়ৎ পরিমাণে মোগলশক্তির আনুগত্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে একজন প্রতিনিধি রাখিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। মহারাজ গোবিন্দ, স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাত্রা নক্ষত্ররায়কে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছিলেন। অগ্রজকে উল্লঙ্ঘন করিয়া রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা

নক্ষত্ররায়ের হৃদয়ে জাগরূক ছিল, ইহা মহারাজ গোবিন্দের সম্পূর্ণ আগোচর ছিল বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু তাঁহার দ্বারা রাজদ্রোহরূপ অনিষ্টকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে, মহারাজের সরল হৃদয়ে বোধ হয় এই সন্দেহ মুহূর্ত্তের জন্যও স্থানলাভ করিতে পারে নাই।

মহারাজ গোবিন্দ-মাণিক্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

এই অবস্থায় এক বৎসরকাল অতিবাহিত হইতে চলিল, কিন্তু নক্ষত্ররায় স্বীয় মনোবাঞ্ছা সাধনের পথ উন্মুক্ত করিয়া লইবার সঙ্কল্প বিস্মৃত হইলেন না। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার অভিষ্টলাভের উত্তম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। দয়ার্দ্রহৃদয় মহারাজ গোবিন্দ, প্রাণীহিংসা মহাপাপ বলিয়া মনে করিতেন ; তিনি দেবালয়ে জীববলির চিরাচরিত প্রথা বন্ধ করিয়া দিলেন। এই সূত্রে দেবালয়ের মোহান্ত (চন্তাই) রুষ্ট হইয়া, রাজার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। সমাজের প্রতি তাঁহার অমোঘ প্রভাব ছিল, তিনি ধর্ম্মলোপের দোহাই দিয়া ভীষণ অর্ন্তব্বীপ্লবের সূচনা করিলেন। এই বিপ্লব কুমার নক্ষত্ররায়ের পক্ষে বিশেষ হিতকর হইয়াছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের ঘটনা লইয়া 'রাজর্ষি' উপন্যাস ও 'বিসর্জ্জন' নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থে উক্ত চন্তাইর নাম 'রঘুপতি' লিখিত হইয়াছে, এই নাম কাল্পনিক। চন্তাইর প্রকৃত নাম নিঃসঙ্কোচে নির্দ্ধারণ করা বর্ত্তমান কালে সহজসাধ্য নহে। শ্রেণীমালা গ্রন্থ আলোচনায় জানা যায়, নক্ষত্ররায়ের (ছত্রমাণিক্যের) অধস্তন চতুর্থ স্থানীয়, রাজা ধনঞ্জয়ের দুহিতাকে খিতং চন্তাইর পুত্র যুধিষ্ঠির বিবাহ করিয়াছিলেন।* স্থানান্তরে পাওয়া যাইতেছে ; উক্ত রাজা ধনঞ্জয়ের অনুজ, রাজা অভিমন্যুর কন্যা মনাই ঠাকুরাণী খিতং চন্তাইর অপর পুত্র বীরমণির হস্তে অর্পিত হইয়াছিলেন।† এই খিতংএর পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘকাল মধ্যে অন্য কোনও চন্তাইর নাম পাওযা যায় না। এতদ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের শাসনকালে ইনিই চন্তাই পদে বরিত ছিলেন, এবং ইনিই বিপ্লববাদী হইয়া রাজ্যে অশান্তির সূত্রপাত করিয়াছিলেন। নক্ষত্ররায়ের বংশধরগণের ইঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের বিষয় চিন্তা করিলেও উক্ত অনুমান সমর্থিত হইবে।

---

* "রাজা ধনঞ্জয় সুত পরশুরাম রাজা।
লক্ষ্মীপ্রিয়া কুমারী যে তাহান অনুজা॥
আরেক ভগিনী কৃষ্ণপ্রিয়া শিষ্টমতি।
চন্তাই খিতঙ্গের পুত্র যুধিষ্ঠির পতি॥"
শ্রেণীমালা।

†"অভিমন্যু রাজকন্যা মনাই ঠাকুরাণী।
চন্তাই খিতঙ্গ পুত্র পতি বীরমণি॥"
শ্রেণীমালা।

চন্তাইর কার্য্যের সহিত কুমার নক্ষত্রের সমানুভূতি থাকা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে। চন্তাইর চেষ্টায়, ধর্ম্মভীরু প্রজাবর্গের হৃদয়ে অতি সহজেই রাজদ্রোহিতার বীজ উক্ত হইয়াছিল। এই সময় নক্ষত্ররায় আর একটী পন্থা অবলম্বন করিলেন। কিয়ৎকাল নবাব দরবারে অবস্থান করিবার পর তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে তদানীন্তন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা (সম্রাট শাহজাহনের পুত্র) শাহসুজাকে বশীভূত করিযা লইলেন ; এবং সুযোগ বুঝিয়া নবাব সদনে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। নবাব সহানুভূতিপরবশ হইয়া কুমার নক্ষত্ররায়ের সাহায্যার্থ বহু সংখ্যক সৈন্য প্রদান করিয়াছিলেন। নক্ষত্ররায় সেই সেনাবাহিনী লইয়া ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

এই বার্ত্তা যথাসময়ে মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের কর্ণগোচর হইল। মন্ত্রীবর্গ যুদ্ধসজ্জা করিবার নিমিত্ত মহারাজকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভ্রাতৃবৎসল, ততোধিক শান্তিপ্রিয় মহারাজ গোবিন্দ, তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন — "ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, হয় স্বীয় প্রাণ আহুতি প্রদান করিতে হইবে, অথবা ভ্রাতৃরুধিরে সমরাঙ্গণ অনুরঞ্জিত হইবে ; এতদ্ব্যতীত প্রজাক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। ভ্রাতার সহিত এবম্বিধ নৃশংস কলহে লিপ্ত হইয়া রাজ্যসুখ উপভোগ করা অপেক্ষা বনবাসী হওয়াও শ্রেয়। আমি এক বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছি, এখন নক্ষত্রের রাজ্যভোগ করাই বিধাতার ইচ্ছা ; সুতরাং অমি যুদ্ধ করিব না।"

এই কথা বলিয়া মহারাজ গোবিন্দ, রাজ্যলোলুপ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া, রাজমহিষী গুণবতী মহাদেবীকে লইয়া, রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন। এই বিপদকালে রাজার কনিষ্ঠ সহোদর জগন্নাথ ঠাকুর, জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম ঠাকুর (পরে রামদেবমাণিক্য), দ্বিতীয় পুত্র দুর্গা ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র (জগন্নাথ ঠাকুরের পুত্র) সূর্য্যপ্রতাপনারায়ণ ও চম্পকরায়, এবং জগন্নাথ ঠাকুরের এক জামাতা সহযাত্রী হইয়াছিলেন।* রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ অনুগামী লক্ষ্মণের ন্যায়, জগন্নাথ ঠাকুর মহারাজ

মহারাজ গোবিন্দের রাজ্যচ্যুতি।

---

* "চট্টগ্রামে চলিলেন সেই ত রাজন।
জগন্নাথ অনুজ সঙ্গে চলে সেই ক্ষণ॥
রামঠাকুর রাজপুত্র সুনীতি প্রচুর।
দ্বিতীয় তাহান ভ্রাতৃ দুর্গা নাম ঠাকুর॥
জগন্নাথ সুত সূর্য্যপ্রতাপ নারায়ণ।
চম্পকরায় আর পুত্র যুদ্ধে বিচক্ষণ॥
জগন্নাথ তনয় ছিলেক আর জন।
পন্থ হৈতে ফিরি আইসে স্বদেশে গমন॥" ইত্যাদি
গোবিন্দমাণিক্য খণ্ড—৮ পৃষ্ঠা।

গোবিন্দের সম্পদ ও বিপদে ছায়ার ন্যায় তাঁহার সহচর ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত জগন্নাথ ঠাকুরের আর এক পুত্র জ্যেষ্ঠতাতের অনুগামী হইয়াছিলেন — পরে কি ভাবিয়া, রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তীনের উদ্দেশ্যে, পথ হইতে রাজার সঙ্গ ত্যাগ করিলেন। জগন্নাথ ঠাকুর পুত্রের এই ব্যবহারে নিতান্তই ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং জামাতাকে বলিলেন, — "শীঘ্র যাইয়া পুত্রকে ফিরাইয়া আন।" জামাতা, কুমারের স্বভাব পরিজ্ঞাত ছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন — "কুমার যদি আসিতে অসম্মত হন, তবে কি উপায় অবলম্বন করিব?" জগন্নাথ আদেশ করিলেন— "আসিতে আপত্তি করিলে, তাহার মস্তক ছেদন করিয়া আনিও।" জামাতা এইরূপ আদিষ্ট হইয়া কুমারের অনুসরণ করিলেন, এবং রাস্তায় পাইয়া, তাঁহাকে পিতার আদেশ জানাইলেন। কুমার, পিতৃআজ্ঞা শ্রবণ মাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া জামাতাকে বধ করিবার নিমিত্ত খড়্গোত্তোলন করিলেন। জামাতা, কুমারকে আঘাত করিবার অবসর না দিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার মস্তক ছেদনপূর্ব্বক ছিন্নমুণ্ড লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহারাজ গোবিন্দ এবং জগন্নাথ ঠাকুর একসঙ্গে উপবিষ্ট আছেন, এই সময় জামাতা উপস্থিত হইয়া, কুমারের মুণ্ড জগন্নাথ ঠাকুরের সম্মুখে রাখিলেন। গোবিন্দমাণিক্য সেই মুণ্ড দর্শনান্তে সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া, বিস্মত ও দুঃখিত হইলেন, এবং এবম্বিধ কঠোর ব্যবহারের নিমিত্ত ভ্রাতাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। রাজমালায় অথবা অন্য কোনো গ্রন্থে এই কুমারের ও জামাতার নামোল্লেখ করা হয় নাই।

এদিকে কুমার নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিপুর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। শাস্ত্রানুমোদিত নিয়মে তাঁহার রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হইল।

মহারাজ গোবিন্দ রাজধানী পরিত্যাগের পর, রাজমহিষী ও অনুচরবর্গসহ রিয়াং জাতির আবাসস্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। * এই স্থান তৎকালে ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল, বর্ত্তমানকালে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের (Chittagong Hill Tracts) সামিল হইয়াছে।

রিয়াং প্রজাগণের দুর্ব্যবহার

সকলেই অবস্থার পূজা করে। রাজ্যভ্রষ্ট মহারাজ গোবিন্দকে রিয়াং সম্প্রদায় শ্রাদ্ধার সহি অভ্যর্থনা করিল না, ইহাতে মহারাজ নিতান্তই মর্ম্মাহত হইলেন। ইহাদের আচরণ

---

* মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের বাসভবনের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যামান আছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কমিশনার লেউইন সাহেব এতৎ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"Far in the jungles on the banks of the Myanee, an affluence of the Kassalong River, are found tanks, fruit-trees, and the remains of masonry building,–evidence that at some bygone period, the land here was cultivated and inhabited by men of the plains. Tradition attributes this ruins to a former Raja of Hill Tipperah who, it is said, was driven from that part of the country."

Lewin's Hill Tracts of Chittagong–p.6.

এত বিরক্তিজনক হইয়াছিল যে, তদ্দর্শনে চির করুণ হৃদয়া রাজমহিষীর মুখ হইতেও রিয়াং জাতির প্রতি অভিসম্পাত বাক্য নির্গত হইয়াছিল।

রিয়াং দেশে অবস্থান কালে, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের প্রতিদ্বন্দ্বী শাহজাদা সুলতান সুজা, স্বীয় ভ্রাতা ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া, প্রাণভয়ে ত্রিপুরায় আগমন করেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মহারাজ ছত্রমাণিক্য তাঁহারই সাহায্যে রাজ্যলাভ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি এই বিপদ কালে নিশ্চয়ই আশ্রায় দান করিবেন। কিন্তু ত্রিপুরায় আগমনের পূর্ব্বেই তিনি সংবাদ পাইলেন, সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে ধৃত করিয়া পাঠাইবার নিমিত্ত মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যকে বন্ধুভাবে এক অনুরোধ পত্র লিখিয়াছেন, এবং সেই পত্র মহারাজ ছত্রমাণিক্যের হস্তগত হইয়াছে। এই বার্ত্তা পাইয়া শাহ সুজা ভীত ও চিন্তিত হইলেন। তিনি মনে করিলেন, সম্রাটের সহিত সৌহার্দ্দ্য রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে শত্রুহস্তে অর্পণ করা, ছত্রমাণিক্যের পক্ষে অসম্ভব হইবে না। এই ভয়ে তিনি রাজধানীতে প্রবেশ না করিয়া, অরণ্যময় পথে আরাকান যাত্রার অভিপ্রায়ে ত্রিপুরার পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন ; এবং পথক্রমে অতর্কিতভাবে, মহারাজ গোবিন্দের রিয়াং দেশস্থ আবাসস্থলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী গোবিন্দ মাণিক্যকে দর্শন করিয়া তিনি অধিকতর ভীত ও চঞ্চল হইয়াছিলেন। সুজা মনে করিলেন, এবার মহারাজ গোবিন্দ নিশ্চয়ই প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিবেন।

শাহসুজা ও মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য

শাহসুজার কার্য্যের দ্বারা যিনি রাজ্য ভ্রষ্ট ও বনবাসী হইয়াছেন, বিধিবিড়ম্বনায় অচিরকাল মধ্যেই সুজাকে ততোধিক বিপন্নাবস্থায় সেই গোবিন্দমাণিক্যের হস্তে পতিত হইতে হইল। উদার হৃদয় মহারাজ গোবিন্দ, সুজার দুরবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইলেন, এবং তাঁহার পূর্ব্ব আচরণ বিস্মৃত হইয়া সম অবস্থাপন্ন জ্ঞানে তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। সুজা, মহারাজের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া, নিঃসঙ্কচিত্তে সেই স্থানে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পর, অবাধ্য রিয়াংগণের সংশ্রবে বাস করা মহারাজ গোবিন্দ অসঙ্গত মনে করিলেন। তিনি স্বীয় বিশ্বস্ত অমাত্য বিশ্বাসনারায়ণের তত্ত্বাবধানে রাজমহিষীকে বগাসাইর পরগণার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে, কুণ্ড চৌধুরীগণের বাড়ীতে রাখিয়া, অনুচরবর্গসহ রিয়াং দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক আরাকানের রাজদরবারে গমন করিলেন। আরাকানরাজ সন্দ-সু-ধর্ম্ম* তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ এবং

গোবিন্দমাণিক্যের আরাকান গমন।

---

* "১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে সন্দ-সু-ধর্ম্ম (চন্দ্রসুধর্ম্ম) আরাকানের সিংহাসনে অধিরোহন করেন। তাঁহার সময়ে শাহসুজা বাঙ্গালা দেশ হইতে আরাকানে পলাইয়া যান। ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।"

চট্টগ্রামের ইতিহাস — ৪র্থ অঃ, ৩৩ পৃষ্ঠা।

বাসোপযোগী ভবন ও প্রয়োজনীয় লোকজন প্রদানদ্বারা বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। মহারাজ গোবিন্দ, আরাকান রাজের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতে লাগিলেন। নিষ্ক্রিয় অবস্থায় একাকী কালযাপন করা নিতান্তই কষ্টকর, এজন্য তিনি অধিকাংশ সময় রাজদরবারে অতিবাহিত করিতেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে প্রায় ছয় বৎসরকাল আরাকানে অবস্থান করিতে হইয়াছিল।

শাহসুজার আরাকান যাত্রা

সুলতান সুজা এই সময় চট্টগ্রামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে সম্রাটের চর বহির্গত হইয়াছিল, এই অবস্থায় সুজা আর চট্টগ্রামে অবস্থান করা নিরাপদ মনে করিলেন না। আরাকানে যাইয়া, অনুকূল বায়ু পাইলেন, সেই স্থান হইতে জলযানে মক্কাযাত্রা করিবার সঙ্কল্প পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার হৃদয়ে পোষিত হইতেছিল, এখন সেই সঙ্কল্পানুযায়ী কার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে আরাকানে গমন করাই কর্ত্তব্য মনে করিলেন।

একদা আরাকান রাজ সন্দ-সু-ধর্ম্ম ও মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য এক সঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া বাক্যালাপ করিতেছেন, তৎকালে সুলতান সুজা তথায় উপনীত হইলেন। মহারাজ গোবিন্দ পূর্ব্ব হইতেই সুজাকে চিনিতেন, তিনি তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া সসম্মানে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক স্বীয় আসনে উপবেশন করাইলেন। এই ঘটনা দর্শনে আরাকান রাজ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মহারাজ গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"ম্লেচ্ছকে এরূপ অভ্যর্থনা করিবার কারণ কি?"

* তখন —

"রাজা বলে নরেশ্বর করি নিবেদন।
এহি ত সুজা বাদশা বিখ্যাত ভুবন॥"
গোবিন্দমাণিক্য খণ্ড — ৯ পৃষ্ঠা।

মহারাজ গোবিন্দ, শাহ সুজার পরিচয় প্রদান ও তাঁহার বিপন্নাবস্থা বর্ণন করিলেন। সমগ্র বিবরণ অবগত হইয়া আরাকান রাজ তাঁহাকে সযত্নে আশ্রয় দান করেন।

শাহ সুজার প্রদত্ত উপহার।

সভাভঙ্গের পর মহারাজ গোবিন্দ ও শাহসুজা এক সঙ্গে রাজভবন হইতে বহির্গত হইলেন। মহারাজের সৌজন্যে সুজা নিতান্ত বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীয় কটিবন্ধস্থিত পারস্য দেশীয় বহু মূল্যবান নিমচা তরবারি ও অঙ্গুলিস্থিত হীরকাঙ্গুরী উন্মোচনপূর্ব্বক গোবিন্দমাণিক্যের হস্তে অর্পণ করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন — "আমি ভারত সম্রাটের পুত্র এবং বঙ্গের শাসনকর্ত্তা হইয়াও বিধিবিড়ম্বনায় আজ পথের ভিখারী হইয়াছি। এই বিপদকালে আপনি আমার প্রতি

---

*"রসাঙ্গের মহারাজা বলিল আপন।
কি কারণে ম্লেচ্ছ রাজা দিছ সিংহাসন॥"
গোবিন্দমাণিক্য খণ্ড — ৯ পৃষ্ঠা।

যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন, তজ্জন্য আপনার নিকট আমি বিশেষ ঋণী। আমার গভীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আপনাকে প্রদান করি, এমন কোনো বস্তু আমার নাই। এই সামান্য বস্তুদ্বয় আপনাকে উপহৃত করিবার অযোগ্য হইলেও স্বীয় সৌজন্যগুণে এই অকিঞ্চিৎকর উপহার গ্রহণ করিলেন আমি অতিশয় আনন্দ লাভ করিব।" মহারাজ গোবিন্দ শাহজাদার প্রদত্ত উপঢৌকন সাদরে গহণ করিয়াছিলেন। সুজার উপহৃত তরবারি ত্রিপুরেশ্বরগণ পুরুষপরম্পরা সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

আরাকানে কিয়ৎকাল অবস্থানের পর, বিশেষ ঘটনাবশতঃ সুলতান সুজা ও আরাকান-রাজের মধ্যে মনান্তর সঙ্ঘটিত হওয়ায়, সুজাকে আরাকান রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে হইয়াছিল ; এতদ্বিষয়ক স্থূল বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে।

শাহসুজার সন্ধান জন্য আরাকানরাজ বিস্তর চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। শাহসুজার ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া, আরাকানরাজ মনে করিলেন, বিদেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে রাজ্যে আশ্রয় দেওয়া নিরাপদ নহে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, বিশেষ শিষ্টাচারের সহিত,—

"গোবিন্দমাণিক্য প্রতি বলেন রাজন।
রাজ্যে যাও নরেশ্বর আপন ভুবন ॥"

মহারাজ গোবিন্দের আরাকান ত্যাগ

মহারাজ গোবিন্দও অতঃপর আর রসাঙ্গে অবস্থান করা সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি অনুচরবর্গসহ আরাকান পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। আরাকান রাজ তাঁহাকে বিদায় উপহার প্রদানদ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। কি কি বস্তু উপহৃত হইয়াছিল, রাজমালায় তাহার এক ক্ষুদ্র তালিকা আছে ;—

" কত ঘর মঘ অষ্ট ধাতু সিংহাসন।
দেব জন্য মঘ রাজা করিল অর্পণ ॥
ঘটি এক ভরটের দ্রব্য নানামত।
এই সব দিয়া রাজা বিদায় রাজ্যত ॥"

গোবিন্দমাণিক্য খণ্ড— ১১ পৃষ্ঠা।

মঘরাজ্যের প্রদত্ত উপঢৌকন দ্রব্যের মধ্যে অষ্টধাতু নির্ম্মিত সিংহাসনখানা অদ্যাপি চতুর্দ্দশ দেবতার ব্যবহারে আছে। এই সিংহাসনের বিশদ বিবরণ রাজমালা প্রথম লহরের ১৪৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

মহারাজ গোবিন্দ, আরাকান রাজ্য পরিত্যাগের পর চট্টগ্রামে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মহারাজ ছত্রমাণিক্যের রাজত্বে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন করা অসম্ভব বলিয়াই চট্টগ্রামে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মহারাজ ছত্রমাণিক্যের শাসনকাল

মহারাজ ছত্রমাণিক্যের রাজ্যলাভের কাল

ভ্রাতৃবৎসল ও শান্তিপ্রিয় মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য রাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পর, নক্ষত্ররায় ১৫৮৩ শকে ছত্রমাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মহারাজ ছত্রমাণিক্যের প্রাসাদ

তাঁহার ছয় বৎসর ব্যাপী রাজত্বকাল মধ্যে সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ ব্যতীত কোনও উল্লেখযোগ্য কার্য হয় নাই। এই প্রাসাদ গোমতী নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী একটী অল্পোন্নত পর্ব্বতের শীর্ষদেশে অদ্যাপি জীর্ণ দেহ লইয়া দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ইহার ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু সুদৃঢ় গাঁথা প্রাচীরের অধিকাংশ অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার আস্তর এত দৃঢ় যে, এখনও তাহা দেওয়ালের অঙ্গচ্যুত হয় নাই। বিশেষতঃ ইহার চুণকামের শুভ্র জ্যোতিঃ সুদীর্ঘকালের রৌদ্রবৃষ্টিতেও বিনষ্ট করিতে পারে নাই। এই অট্টালিকা দ্বিতলবিশিষ্ট ; নিম্নতলের প্রকোষ্ঠগুলি সদর ও অন্দর দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, ইহা সহজ দৃষ্টিতেই হৃদয়ঙ্গম হয়। এই রাজনিকেতন সাধারণতঃ 'পুরাতন রাজবাড়ী' নামে পরিচিত হইতেছে।

এই প্রাসাদ যেই শৃঙ্গে অবস্থিত, সেই শৃঙ্গটী গোমতী নদীর বক্ষ হইতে খাড়াভাবে উত্থিত হইয়াছে। এই উচ্চ শৃঙ্গের উপর দণ্ডায়মান হইলে, চতুর্দ্দিকের বহু দূরবর্ত্তী স্থানসমূহ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। নদী-পরিখা ও পর্ব্বত-প্রাচীর দ্বারা ইহা এরূপ সুরক্ষিত যে, এই প্রাসাদদ্বারা সুরক্ষিত দুর্গের কার্য্য সাধিত হইত।

বিদেশীয় পরিব্রাজকগণ

মহারাজ ছত্রমাণিক্যের শাসনকালে, ফরাসী দেশীয় দুই জন পরিব্রাজক ভারতের নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহাদের একজনের নাম বর্ণিয়ার, তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন ; অপরের নাম টেভার্নিয়ার, ইনি ছিলেন রত্ন ব্যবসায়ী। শেষোক্ত ব্যক্তি ছত্রমাণিক্যের নাম ও তাঁহার প্রচারিত একটী মুদ্রার প্রতিকৃতিসহ ত্রিপুর রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ আলোচনায় জানা যায়, সে কালে ত্রিপুরায় রেশমের চাষ প্রচলিত ছিল এবং খনি হইতে সুবর্ণ সংগ্রহ করা হইত। এই সকল উৎপন্ন বস্তু চীন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে রপ্তানীর ব্যবস্থা ছিল।* বর্ণিয়ারের অল্পকাল পূর্ব্বে, টেভার্নিয়ার ভারতবর্ষে আগমন করিয়া থাকিলেও তাঁহাদের ভ্রমণকালে পরস্পরের দর্শন

---

*Tavernier's Travells in India–Book III, Part II, Chap. XVI

লাভ ঘটিয়াছিল, সুতরাং উভয়ে সমসাময়িক কালে ভারতবর্ষে ছিলেন, ইহা জানা যাইতেছে।*

মহারাজ ছত্রমাণিক্যের খনিত উদয়পুরস্থিত ছত্রসাগরের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার নামানুসারে ত্রিপুর পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম ছত্রচূড়া বা ছাতাচূড়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ছত্রের খিল, ছত্রের কোট, ছত্রপুর প্রভৃতি গ্রামের নাম, মহারাজ ছত্রমাণিক্যের স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে বলিয়াই মনে হয়।

মহারাজ ছত্রমাণিক্যের একটী কীর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মহারাজ বিজয়মাণিক্য 'সাখাসেপ্' ও 'থাঙ্গাচেপ্' আখ্যাত হালামদিগকে অষ্টধাতু নির্ম্মিত একটা হস্তা ও একটী ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্ত্তি প্রদান করিয়াছিলেন।† তৎকালে 'লাঙ্গাই' সম্প্রদায়ের হালামগণ পূর্ব্বোক্তরূপ রাজপ্রসাদ লাভে বঞ্চিত ছিল। সুদীর্ঘকাল পরে, মহারাজ ছত্রমাণিক্যের শাসনকালে ইহারা তদ্রূপ উপহার পাইবার নিমিত্ত প্রার্থী হওয়ায়, মহারাজ এই সম্প্রদায়ের সরদারকে একটী ধাতুনির্ম্মিত অশ্বারোহী যোদ্ধমূর্ত্তি প্রদান করেন। ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী স্বর্গীয় ধনঞ্জয় ঠাকুর মহোদয় এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন,—

মহারাজ ছত্রমাণিক্যের প্রদত্ত শাসন

"সাখাসেপ্ ও থাঙ্গাচেপ্ আখ্যায়িত হালামগণ প্রতিকৃতিদ্বয় পাইবার বহুকাল পরে, সেইরূপ রাজপ্রদত্ত নিদর্শন পাইবার অভিলাষী হইয়া 'লাঙ্গাই' আখ্যায়িত হালামগণ রাজ-সমীপে প্রার্থনা করে এবং উহার বহুকাল পর ঐরূপ ধাতুনির্ম্মিত সুসজ্জিত, তরবারধারী, স-সওয়ার একটী বিস্পষ্ট ও সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট অশ্ব প্রাপ্ত হয়। ঐ অশ্বপৃষ্ঠে, রাজনীতিকুশল বীরবর মহারাজ বিজয়মাণিক্য ও মহারাজ ছত্রমাণিক্য ও যে সরদারকে উহা প্রদান করা হইয়াছিল তাঁহার নাম খোদিত রহিয়াছে।"

উক্ত মূর্ত্তি বর্ত্তমানকালে কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত কমলপুর থানার এলাকাস্থ কচুছড়া নিবাসী ছানাইসন গালিমের হস্তে আছে। মূর্ত্তিটী ৭" ইঞ্চি উচ্চ এবং অশ্বটী লম্বা ৬$^{১}/_{২}$" ইঞ্চি। সোয়ারের বাম হস্তে অশ্বের বল্গা ধরা, দক্ষিণ হস্তে তরবারি। তরবারির ফলকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, গোড়ার ভাগ মাত্র মূর্ত্তির হস্তে আছে।

---

* " The sixth, being arriv'd at a considerable Town, call'd Donapur, six Leagues from *Rage Mehale,* I parted with Monsieur Bernier, who was going to *Casembasar* and thence to *Ogoule* by Land ; for when the River is low, there is no going by water, by reason of a great Bank of Sand that lies before a city call'd *Santiqui."*

Tavernier's Travels in India–Book I, part II, Chap. VIII.

† রাজমালা—২য় লহর, ১৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অশ্বটীর অঙ্গে অনেক কথা লিখিত আছে। এই লিপির ভাষা নিতান্ত অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার মিশ্রণে, বঙ্গাক্ষরে বাক্যগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছে। অশ্বের যে অঙ্গে যে বাক্য খোদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উল্লেখ করা গেল ;—

(অশ্বের বাম পার্শ্বস্থ দুই পংক্তি)
"শ্রীশ্রীযুত বিজ
য় মাণিক্য দেবেন"

(দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দুই পংক্তি)
"যাচিঙ্গাছাকে
স্থাপিতো অশ্বাকৃতি"*

(পুচ্ছ দেশে)
"সেঙ্গচাম"
(গলদেশে দুই পংক্তি)

" x x শাসনের † ত্রিপুর ইন্দ্র
শ্রীশ্রীযুত ছত্রমাণিক্যের স্থাপইরৌ" ††
(বাম পদে)
"সাব্দা ১৫৮৪"

উৎকীর্ণ অক্ষরগুলি ক্ষয়হেতু স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হইয়াছে, অথচ গ্রথিত বাক্য নিতান্তই অসম্পূর্ণ এবং দুর্ব্বোধ্য। বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও নিঃসন্দিগ্ধভাবে পাঠোদ্ধার করা যাইতে পারে নাই। পূর্ব্ব বিবরণ জানা থাকায়, উৎকীর্ণ বাক্যাবলীর এই ভাবোদ্ধার করা যাইতে পারে যে, —শ্রীশ্রীযুত বিজয়মাণিক্য দেব সেঙ্গচাম (সাঙ্গা চেপ) সম্প্রদায়কে যে শাসন প্রদান করিয়াছেন, তদনুরূপ এই অশ্বাকৃতি শাসন, যাচিঙ্গছা নামক সরদারকে ত্রিপুরেন্দ্র শ্রীশ্রীযুত ছত্রমাণিক্য ১৫৮৪ শকে স্থাপন (প্রদান) করিলেন।

ইহা ব্যতীত লিপিদ্বারা অন্য কোনো ভাব উদ্ধার করা যাইতে পারে না। সম্ভবত ঃ উৎকীর্ণকারীর ত্রুটীতে অনেক শব্দ বিকৃত হইয়াছে। 'শকাব্দা' শব্দ স্থলে 'সাব্দা' উৎকীর্ণ করাই ইহার প্রমাণ। এই শকাঙ্ক দ্বারাও মূর্ত্তিটী মহারাজ ছত্রমাণিক্যের প্রদত্ত বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। হালামগণ এই মূর্ত্তিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। গলদেশে উৎকীর্ণ x x চিহ্নিত স্থানের দুইটী অক্ষর অপাঠ্য।

মণিপুরের ইতিহাসে ত্রিপুরার কথা

মণিপুরের ইতিহাসে ১৫৮৪ শকের (১৬৬২—৬৩ খ্রীঃ) বিবরণে লিখিত আছে,— "a messenger arrived from Tipperah with an elephant and a woman" অর্থাৎ একটী হস্তী ও একটী স্ত্রীলোক লইয়া ত্রিপুরা হইতে দূত আগমন করে।

---

* স্থাপিতা অশ্বাকৃতি? † শাসকেন? †† স্থাপইতারৌ?

১৫৮৪ শক মহারাজ ছত্রমাণিক্যের রাজত্বকাল। এই সময় মণিপুরে দূত প্রেরণের কথা রাজমালায় অথবা ত্রিপুরার অন্য কোনো ঐতিহাসিক গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে না।

মহারাজ ছত্রমাণিক্য কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর কাল রাজ্যশাসন করিয়া, বসন্তরোগে লীলা সম্বরণ করেন।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের দ্বিতীয় বারের রাজত্ব

গোবিন্দমাণিক্যের দ্বিতীয় বার রাজ্য-লাভের কাল

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য আরাকান রাজ্য পরিত্যাগ করিবার পর, কিয়ৎকাল চট্টগ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি মহারাজ ছত্রমাণিক্যের লোকান্তরিত হইবার সংবাদ পাইয়া রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ১৫৮৯ শকের (১৬৬৭ খ্রীঃ) শেষভাগে তিনি পুনর্ব্বার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

মহারাজ ছত্রমাণিক্যকে রাজ্য লাভার্থ সাহায্য প্রদানোপলক্ষে মোগলশক্তি ত্রিপুরার প্রতি যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের রাজত্বকালে সেই প্রভাব পূর্ণমাত্রায় কার্য্যকরী হইয়া দাঁড়ায়। এই সময় মোগল শসনকর্ত্তা ত্রিপুরার উপর হস্তি-কর নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে মোগলগণ ত্রিপুরাকে করপ্রদ করিতে সমর্থ হন নাই। মহারাজ গোবিন্দ, বার্ষিক ৪½টী হস্তী করস্বরূপ প্রদান করিতে স্বীকৃত হন।*

হস্তিকর নির্দ্ধারণ

ছত্রমাণিক্যের পুত্র উৎসব রায় শান্তিপ্রিয় ছিলেন। তিনি বুঝিলেন, রাজ্যমধ্যে কলহের বীজ উপ্ত হইয়াছে, এখানে শান্তি বাস করিবার আশা নাই। এই অশান্তির মধ্যে বসতি করা অপেক্ষা, ত্রিপুরেশ্বরের প্রতিনিধিরূপে নবাব দরবারে থাকাই নিরাপদ। এই কার্য্যের দরুণ যে বৃত্তিলাভের ব্যবস্থা আছে, তাহা উপভোগদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই তিনি

নবাব দরবারে উৎসব রায় প্রতিনিধি

"গোবিন্দমাণিক্য পূর্ব্বে রাজা ত্রিপুরার।
কেহ নৃপ নাহি দিছে কর বাদসার॥
গোবিন্দমাণিক্য রাজা পুনর্ব্বার হৈল।
তদবধি নজরানা হস্তিকর দিল॥
বৎসরেতে পঞ্চ হস্তিকর নির্ব্বন্ধিয়া।
তাহা হতে এক হস্তী অর্দ্ধেক মাপিয়া॥
সেই ত অর্দ্ধেক হস্তী রাজকরে যাএ।
আর অর্দ্ধেকের মূল্য নৃপতি যে পাএ॥"

গোবিন্দমাণিক্য খণ্ড—১১ পৃষ্ঠা।

শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। মহারাজ গোবিন্দও প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতার পুত্রকে প্রতিনিধিরূপে দরবারে প্রেরণ সম্বন্ধে দ্বিধাবোধ করিলেন না। পূর্ব্বে সাবেক রতননগর পরগণা প্রতিনিধির বৃত্তিস্বরূপ নির্দ্ধারিত ছিল, উৎসব রায়কে তদ্ধিনিময়ে কাদবা, বেদরাবাদ ও আমিরাবাদ পরগণাত্রয় প্রদান করা হইল। কুমার উৎসব তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া, রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক নবাব দরবারে চলিয়া গেলেন এবং ঢাকায় আবাসস্থান নির্ব্বাচন করিলেন। তাঁহার বংশধরগণের এক শাখা অদ্যাপি ঢাকা নগরে, রাজার দেউরীতে বাস করিতেছেন। উৎসব রায় নবাব দরবারে কখনও ত্রিপুরেশ্বরের অনিষ্টজনক কোন কার্য্য করেন নাই।

ত্রিপুরাধীপ গোবিন্দমাণিক্য ধর্ম্মপ্রাণ রাজা ছিলেন। তাঁহার জলাশয় খনন, দেবায়তন গঠন ও দেবতা প্রতিষ্ঠাদি ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠানের বিবরণ পূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে। তিনি গঙ্গা স্নানোপলক্ষে, গঙ্গাতীরে কনকের তুলাপুরুষ দান ও ব্রাহ্মণদিগকে বিস্তর ভূমি দান করিয়াছিলেন। সেকালে রাজ্যবাসীদিগকে মোগল সম্রাজ্যের ভিতরে যাইতে হইলে, অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। ভিন্ন রাজ্যবাসিগণেরও অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশের অধিকার ছিল না। কোন সময় হইতে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, জানিবার উপায় নাই। মহারাজ গোবিন্দের পরেও দীর্ঘকাল উভয় রাজ্যেই এই নিয়ম প্রবল থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। অল্পকাল পূর্ব্বেও অনেক দেশীয় ভদ্রলোক এবং উংরেজকে ত্রিপুরায় প্রবেশের ছাড়পত্র পাইবার নিমিত্ত সীমান্তবর্ত্তী ঘাটিতে অপেক্ষা করিতে দেখা গিয়াছে। অনুসন্ধান করিলে এখনও অনেকের হস্তে ত্রিপুর রাজ্যের প্রদত্ত ছাড়পত্র পাওয়া যাইবে। ভিন্ন রাজ্যের দেওয়া এই শ্রেণীর একখানা ছাড়পত্র আমরা পাইয়াছি, তাহা ১১৯৭ সনে (১২০০ ত্রিপুরাব্দে) তীর্থযাত্রা উপলক্ষে স্বর্গীয় জয়দেব উজীর মহোদয়কে প্রদান করা হইয়াছিল। এই প্রথা কতটা ব্যাপ্ত ছিল, এবং মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের গঙ্গাস্নানার্থ যাত্রাকালে অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হইয়াছিল কিনা, জানিবার উপায় নাই।

রাজ্যের উন্নতি বিধান এবং প্রজাসাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মহারাজ গোবিন্দের তীব্র দৃষ্টি ছিল। তাঁহার রাজত্বের পূর্ব্বে গোমতী নদীর বন্যায় শস্য বিনষ্ট হইবার দরুণ মেহেরকুল পরগণা আবাদের বিঘ্ন ঘটিতেছিল। মহারাজ বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া নদীর দুই পাড়ে আইল বাঁধিয়া দেওয়ায়, উক্ত সুবিস্তীর্ণ পরগণা আবাদের সুবিধা ঘটিয়াছে। সেই 'গাঙ্গ আইল' অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া মহারাজ গোবিন্দের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। তিনি ভূমির কর হ্রাস করিয়া, কাণি প্রতি ।০ চারি আনা কর অবধারণপূর্ব্বক প্রজাবর্গের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ক বিবরণ পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

মহারাজ গোবিন্দ-মাণিক্যের কীর্ত্তি

গোবিন্দমাণিক্য উদয়পুর নগরীতে গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এবং অন্তঃপুর মহিলাবৃন্দের বড়শী দ্বারা নদীতে মৎস্য ধৃত করিবার স্থান ইত্যাদি দর্শন করিলে ত্রিপুরেশ্বরগণের অতীত সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রাসাদের গাঁথনি অতিশয় মজবুত ছিল ; ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু দেওয়ালগুলি এখনও অক্ষুণ্ণভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রাচীন কালের অট্টালিকাসমূহের তুলনায় এই প্রাসাদ অপেক্ষাকৃত উচ্চ ছিল।

মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের প্রাসাদ

মহারাজ গোবিন্দ আর একটী কার্য্যের দ্বারা স্বীয় নামসহ শাহসুজার নাম স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গোবিন্দমাণিক্য ও শাহ সুজা রাজ্যচ্যুতাবস্থায় আরাকান রাজ্যে একসঙ্গে বাস করিবার কালে, সুজাকর্ত্তৃক মহারাজকে একটী হীরকাঙ্গুরী প্রদত্ত হইয়াছিল। মহারাজ সেই অঙ্গুরীর বিনিময়ে, সুজার নাম স্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে, কুমিল্লায় গোমতী নদীর উপকূলে এক মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই স্থানে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই স্থানের 'সুজাগঞ্জ' নামকরণ হইয়াছে। এই সুপ্রসিদ্ধ ভজনালয় সাধারণ্যে 'সুজা মসজিদ' নামে অভিহিত হইতেছে। * বর্ত্তমান কালেও মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের প্রদত্ত নিষ্কর ভূমির আয়ের দ্বারা এই ভজনালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। প্রয়োজনমতে রাজসরকারী ব্যয়ে ইহার মেরামত কার্য্য সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। ১৩৪১—৪২ ত্রিপুরাব্দে ত্রিপুরার বর্ত্তমান অধীশ্বর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের অনুজ্ঞায় এই মসজিদ পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছে। †

সুজা মসজিদ

---

* এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায়,—

"গোমতী নদীর কুলে মজিদ স্থাপিয়া।
সুজা বদশার নামে মজিদ করিয়া॥
সুজা নামে এক গঞ্জ রাজা এ বৈসাইল।
সুজাগঞ্জ বলি নাম তাহার রাখিল॥"

গোবিন্দমাণিক্য খণ্ড — ১৪ পৃষ্ঠা।

† রাজমালার সংগ্রাহক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ বলেন— শাহসুজা ত্রিপুরা জয় করিয়া, সেই বিজয় বৃত্তান্ত চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে এই মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এরূপ একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। তিনি সেই প্রবাদ বাক্যই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। আবার তিনিই স্থানান্তরে বলিয়াছেন,— নক্ষত্ররায় সুজাকর্ত্তৃক সাহায্য লাভের কথা তিনি বিশ্বাস করেন না ; কারণ, তৎকালে সুজা সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আক্রমণে বিপন্ন ছিলেন। নক্ষত্ররায়কে সুজা সাহায্য করিয়াছিলেন, এ কথা অসম্ভব, অথচ সুজা ত্রিপুরা জয় করিবার উক্তি সম্ভব, এই দুই কথার পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা হইতেছে না। নক্ষত্ররায়ের ত্রিপুরা আক্রমণের অনেক পরে কথিত মসজিদ নির্ম্মিত হওয়া অবিসম্বাদিত সত্য, সুতরাং তৎপূর্ব্বে সুজাকর্ত্তৃক ত্রিপুরা আক্রান্ত হইয়া থাকিলেও তৎকালে মসজিদ প্রস্তুত করা হয় নাই, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ কৈলাসবাবুর কথিত প্রবাদবাক্যের বিষয় অন্য কেহ অবগত আছেন, এরূপ জানা যায় না।

মহারাজ গোবিন্দ, স্ত্রীর দরবারে সম্পাদিত সনন্দ ইত্যাদি দলিলে ব্যবহারের নিমিত্ত এক নূতন আকারের মোহর (ছাপ্) প্রচলন করেন। এতজ্জাতীয় মোহর অদ্যাপি 'পদ্মমোহর' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ইহার চতুর্দ্দিকে মৃত্তাকারে মহারাজ গোবিন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ জন রাজার নাম এবং মধ্যস্থলে স্বীয় নাম অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তদবধি ত্রিপুরেশ্বরগণ সকলেই আপন আপন নামের পদ্মমোহর প্রস্তুত ও ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। শিল্পকলা নিপুণ মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের শাসনকালে এই মোহরের আকৃতিগত উন্নতি হইয়াছে। তিনি, একটী পঞ্চদল পদ্মের এক একটী দলে, ধারাবাহিকরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী এক একজন রাজার নাম অঙ্কন ও মধ্যস্থলে স্বীয় নাম উৎকর্ণ করিয়াছিলেন। তদবধি পরবর্ত্তী নৃপতিগণ এই নীতিই অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। এতদ্ব্যতীত রাজগণের আর এক প্রকারের মোহর প্রচলিত আছে, তাহাকে 'আজ্ঞামোহর' বলা হয়। এই সকল মোহরের বিস্তৃত বিবরণ যথাস্থানে প্রদান করা হইবে।

রাজার প্রচলিত মোহর বা ছাপ

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য, রাজ্যে সমাগত জনৈক বণিক হইতে হস্তীর বিনিময়ে লবণ ক্রয় করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।* যে রাজ্যে হস্তীর বদলে লবণ গ্রহণ করা হয় সেই রাজ্যে লবণের দুর্ভিক্ষ ছিল, সাধারণতঃ ইহাই অনুমিত হয় ; বস্তুতঃ এরূপ অনুমান সঙ্গত হইবে না। সে কালে ত্রিপুরায় বিদেশীয় লবণের ন্যায় পরিষ্কৃত ও সুদৃশ্য লবণের অভাব থাকা অসম্ভব নহে, কিন্তু তখন লবণের কার্য্য সাধনোপযোগী অনেক উপাদান ছিল। বঙ্গোপসাগর, রাজধানী উদয়পুর হইতে অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না ; এতদ্ব্যতীত উদয়পুরের অতি সান্নিধ্য স্থানে এবং রাজ্যের নানা অংশে লবণের খুলী (আকর), ও লবণাক্ত জলময় অনেক ছড়া বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদুপলক্ষে লবণছড়া নুনছড়া, হাজাছড়া ও রামভদ্রছড়া প্রভৃতি নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল ছড়ার উজানে লবণের খনি আছে। মহিষ, গবয় (গয়াল) হরিণ, গণ্ডার ও হস্তী প্রভৃতি বন্য পশুগণ সর্ব্বদা সেই সকল স্থানে, লবণাক্ত কর্দ্দমময় মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহা হইতে লবণ বাহির করিয়া লওয়া কষ্টসাধ্য হইলেও অসম্ভব নহে। অনেক ছড়ার লবণাক্ত জল জ্বাল দিলে লবণ পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান কালেও পার্ব্বত্য লোকগণ মুলি বাঁশের কচি ডোগা এবং কোনো কোনো শ্রেণীর বনজ গুল্ম-লতা পোড়াইয়া তাহার ক্ষার হইতে লবণ বাহির করিতে জানে। সুতরাং মহারাজ গোবিন্দ লবণের অভাবপ্রযুক্ত হস্তীর বিনিময়ে লবণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন মনে হয় না। বিদেশীয় লবণ পরিষ্কৃত, সুদৃশ্য, তীব্র আস্বাদ বিশিষ্ট এবং ব্যবহারের পক্ষেও সুবিধাজনক, বিশেষতঃ তৎকালে ত্রিপুরায় ইহা

হস্তীর বিনিময়ে লবণ ক্রয়

---

* গোবিন্দমাণিক্য খণ্ড — ১৩ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য।

এক অভিনব বস্তু বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকিবে, এজন্যই উক্ত লবণ বিশেষ আগ্রহের সহিত গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের শাসন বিবরণী আলোচনা করিলে জানা যায়, তিনি ন্যায়বান, ধর্ম্মপরায়ণ, দেব-দ্বিজে শ্রদ্ধাশীল এবং প্রজাবৎসল নরপতি ছিলেন। রাজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি অনেক কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার শাসনকালে বিস্তর জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি, রাজানুকম্পায় কৃষিক্ষেত্রে পরিমত হওয়ায়, রাজকোষে অর্থ সমাগমের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। ত্রিপুরা জেলায় গোবিন্দপুর নামে অনেকগুলি গ্রাম বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশই মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আর একটী গ্রামের নামকরণের বিবরণ এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারীর অন্তর্গত দক্ষিণশিক পরগণায় একটী জঙ্গলাবৃত গ্রামের 'আঁধার' নাম ছিল। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য উদয়পুর হইতে চন্দ্রনাথ তীর্থে গমন কালে, এই গ্রামের পথপার্শ্বস্থ একটী বিশাল বটবৃক্ষমূলে শিবিকা রাখিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন ; এই সময় গ্রামস্থ বহু ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতবর্গ উপস্থিত হইয়া মহারাজের সম্বর্দ্ধনা করেন। মহারাজ তাঁহাদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন — "এই গ্রামের 'আঁধার' নামের সহিত আমার উপাধি 'মাণিক্য' শব্দ যোগ হইয়া, আজ হইতে "আঁধার মাণিক" নাম হইবে!" তদবধি সেই নামেই গ্রামটী পরিচিত হইয়া আসিতেছে। উক্ত গ্রামের পুরুষাণুক্রমিক অধিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইনি প্রাচীনবয়স্ক এবং বংশানুক্রমে ত্রিপুরেশ্বরের অনগত প্রজা। এক কালে ইঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তিও যথেষ্ট ছিল।

মহারাজ গোবিন্দ, কেবল ধার্ম্মিক ও রাজনীতিকুশল ছিলেন, এমন নহে। তিনি ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্টভাবে বঙ্গবাণীর সেবাব্রতেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ইঁহারই অনুজ্ঞায় রাজমালার তৃতীয় লহর রচিত হইয়াছে. এতদ্ব্যতীত ইনি পণ্ডিত-মণ্ডলীর দ্বারা বৃহন্নারদীয় পুরাণের যে বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে তাহা বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। এই গ্রন্থের স্থূল বিবরণ পূর্ব্বে প্রদান করা গিয়াছে।

মহারাজ গোবিন্দের সংশ্রবে বঙ্গসাহিত্য

মহারাজ গোবিন্দের কীর্ত্তি-কণিকা লইয়া, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় 'রাজর্ষি' উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ রচনার প্রথম সূত্রপাত কিভাবে হইয়াছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথের আত্মবাক্যেরই প্রকাশ পাইবে তিনি বলিয়াছেন,—

"— দুই এক সংখ্যা 'বালক' বাহির হইবার পর, একবার দুই এক দিনের জন্য দেওঘরে রাজনারায়ণবাবুকে দেখিতে যাই। কলিকাতায় ফিরিবার সময় রাত্রের গাড়ীতে ভিড় ছিল ; ভাল করিয়া ঘুম হইতেছিল না — ঠিক চোখের উপর আলো জ্বলিতেছিল। মনে করিলাম ঘুম যখন হইবেই না, তখন এই সুযোগে বালকের জন্য একটা গল্প ভাবিয়া

রাখি। গল্প ভাবিবার ব্যর্থ চেষ্টার টানে গল্প আসিল না, ঘুম আসিয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিলাম, কোন এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্ত চিহ্ন দেখিয়া বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে —বাবা, একি! এ যে রক্ত! বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভাণ করিয়া কোনো মতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে। —জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া 'রাজর্ষি' গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালকএ বাহির করিতে লাগিলাম।"

জীবন-স্মৃতি —১৯১—১৯২ পৃষ্ঠা।

বিগত ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দের ফাল্গুন মাসে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আগরতলা রাজধানীতে পদার্পণ করেন। তৎকালে আগরতলা কিশোর-সাহিত্য সমাজ কর্ত্তৃক আহূত সম্বর্দ্ধনা সভায় তিনি স্বকীয় অভিভাষণে 'রাজর্ষি' উপন্যাস রচনা সম্বন্ধীয় যে দুই একটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে জানা যায়, ত্রিপুরেশ্বর স্বর্গীয় বীরচন্দ্রমাণিক্য হইতে তিনি উক্ত গ্রন্থ রচনার ঐতিহাসিক উপাদান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজ বীরচন্দ্রের প্রসঙ্গোত্থাপন উপলক্ষে বলিয়াছিলেন ;—

"— এরপর থেকে নানা সময়ে নানা উপদেশ এবং বিশেষ করে 'রাজর্ষি' লিখিবার সময়ে 'রাজমালা' থেকে সংস্কৃত বিষয়গুলি ছাপিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তার থেকে আমি গোবিন্দমাণিক্যের প্রকৃত ইতিবৃত্ত জানতে পেরেছিলুম।"

এই বিবরণ সংগ্রহ উপলক্ষে মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য ও কবি-সম্রাটের মধ্যে যে পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, বিগত ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দের (১৩৩৮ সাল) রবীন্দ্র-জয়ন্তীর কলিকাতাস্থ প্রদর্শনীতে রাজসরকার হইতে তাহা প্রেরিত হইয়াছিল ; তখন অনেকেই তাহা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পত্রখানা নিম্নে প্রদান করা গেল।

ওঁ

"২৩শে বৈশাখ, ১২৯৩ সন,
বুধবার।

"যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

" আপনাদের রাজপরিবারের সহিত আমাদের পরিবারের পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় আছে এইরূপ শুনিতে পাই — সেই জন্য সাহসী হইয়া মহারাজকে পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের পূর্ব্বকার সম্বন্ধ মহারাজের স্মরণে আসে এই আমার অভিপ্রায়।

"মহারাজ বোধ করি শুনিয়া থাকিবেন যে, আমি ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া 'রাজর্ষি' নামক একটি উপন্যাস লিখিতেছি। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহার কারণ, ইতিহাস পাই নাই। এজন্য আপনাদের কাছে মার্জ্জনা প্রার্থনা বিহিত বিবেচনা করিতেছি। এখন যদিও অনেক বিলম্ব হইয়াছে, তথাপি মহারাজ যদি গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁহার ভ্রাতার রাজত্ব সময়ের বিশেষ ইতিহাস আমাকে প্রেরণ করিতে অনুমতি করেন, তবে আমি যথাসাধ্য পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করি। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য তাঁহার নির্ব্বাসন দশায়

চট্টগ্রামের কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থায় ছিলেন যদি জানিতে পাই ; তবে আমার যথেষ্ট সাহায্য হয়। প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের এবং ঐতিহাসিক ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানের ফটোগ্রাফ যদি পাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলেও আমার উপকার হয়।"

"এই পত্রের উত্তর পাইলে এবং মহারাজের সহিত আলাপ হইলে আমি সৌভাগ্য জ্ঞান করিব।"

৬নং দ্বারকাঠাকুরের লেন
যোড়া সাঁকো।
কলিকাতা।

প্রণতঃ—
শ্রীরবীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ।

বর্ত্তমানে ১৩৪২ ত্রিপুরাব্দ (১৩৩৯ সন) চলিতেছে। পত্রখানা ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন। সেই সময়ের হস্তলিপির সহিত তাঁহার বর্ত্তমান কালের হস্তাক্ষরের কত পার্থক্য ঘটিয়াছে, পত্রখানা দর্শন করিলে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। এই প্রত্রের উত্তরে মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাও এই স্থলে প্রদান করা যাইতেছে।

শ্রীহরি।

সদ্‌গুণান্বিতেষু—

আপনার পত্র পাইয়া যারপরনাই সুখী হইলাম। লিখিয়াছেন, আমাদের পরিবারের সহিত আপনাদের পরিবারের যে সম্বন্ধ ছিল তাহা স্মরণ করিয়া দেওয়াই আপনার উদ্দেশ্য। সে সুখের সম্বন্ধ আমি ভুলি নাই, আপনি পুনরায় তাহার গৌরব করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তজ্জন্য বিশেষ আপ্যায়িত ও বাধিত হইলাম। ভরসা করি, মধ্যে মধ্যে আপনার অবসর মতে এরূপ অমায়িক ভাবপূর্ণ পত্র পাইব।

'মুকুট ও 'রাজর্ষি' নামক দুইটী প্রবন্ধই আমি পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে যে যে স্খলন হইয়াছে, তাহা সংশোধন করা আপনার বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না।

'রাজরত্নাকর' নামে ত্রিপুর রাজবংশের একখানা ধারাবিহক সংস্কৃত ইতিহাস আছে। এই গ্রন্থ ধর্ম্মমাণিক্যের রাজত্ব সময়ে সঙ্কলিত হইতে আরম্ভ হয়। ধর্ম্মমাণিক্য "জীবারিবসুমানে" ত্রৈপুরাব্দে অর্থাৎ ত্রিপুরা ৮৬৮ সনে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এখন ত্রৈপুর ১২৯৬ সন। উক্ত রাজরত্নাকরে আর একখানা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'রাজমালার' উল্লেখ আছে; কিন্তু সেই প্রাচীন রাজমালা এখন কোথাও অনুসন্ধান পাওয়া যায় না।* 'রাজমালা' বলিয়া যাহা প্রচলিত, তাহা রাজরত্নাকর হইতে সংক্ষিপ্ত ও সংগৃহীত, এবং বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত। সাধারণে পাঠ করিয়া যেন অনায়াসে বুঝিতে পারে, এই অভিপ্রায়েই দ্বিতীয় 'রাজমালা' রচিত হইয়াছে। ইহাতে মহারাজ দৈত্যের জীবনবৃত্ত বর্ণিত আছে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনেক রাজার ইতিহাস নাই। দ্বিতীয় বাঙ্গালা রাজমালা লেখককে আমি বালক বয়সে দেখিয়াছি।† এতদ্ভিন্ন ঐরূপ বাঙ্গালা কবিতায়

---

* এই গ্রন্থ পরে আগরতলাস্থ উজীর ভবনে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। —রা, স,

† রাজমালা প্রথম লহরের পূর্ব্বভাষে (৯০ পৃষ্ঠায়) মহারাজের এই উক্তির আলোচনা করা হইয়াছে; এ স্থলে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

কেবল ঁকৃষ্ণমাণিক্য মহারাজার চরিত্র অবলম্বন করিয়া একখানা ইতিহাস আছে, উহার নাম 'কৃষ্ণমালা'। পার্ব্বতীয় প্রজাগণের মধ্যে এরূপ প্রথা আছে যে, তাহারা নিজ নিজ ভাষায় রচনা করিয়া মহারাজগণের জীবন চরিতের কোনো বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে গান করিয়া থাকে। সেই গানগুলি হইতে অনেক বিবরণ সংগৃহীত হইবার সুবিধা আছে, বলা বাহুল্য।

আপনি যে ত্রিপুর ইতিহাস অবলম্বন করিয়া নবন্যাস লিখিতে যত্ন করিয়াছেন, ইহাতে আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। যে যে স্থলে ইতিহাসের প্রয়োজন হয় — আমি আদরের সহিত পূর্ব্বোক্ত নানা মূল হইতে তাহা সঙ্কলন করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। আপনার অপর অপর বিষয়ে প্রশংসিত প্রবন্ধগুলিতে ইতিহাসের যথাযথ ব্যাখ্যা থাকে, ইহা আমারও একান্ত বাসনা। ঐতিহাসিক কোনো বিশেষ ভাগের সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ সময় মধ্যে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে কেবল রাজরত্নাকর হইতে যে সহায়তা পাওয়া যায়, তাহাই দিতে পারিব। একটুকু সময় থাকিতে জিজ্ঞাসা করিলে স্থানীয় অবস্থা সংগ্রহ করিয়াও জানাইতে চেষ্টা করিব। বোধ হয় শেষোক্ত প্রণালী আপনার সন্তোষজনক হইবে।

আমার পূর্ব্বপুরুষগণের উদয়পুর ব্যতীত ধর্ম্মনগর, কল্যাণপুর, অমরপুর প্রভৃতি স্থানেও রাজধানী ছিল। সেই সেই স্থলেও অনেক কীর্ত্তিকলাপের চিহ্ন পাওয়া যায়। আপনার প্রয়োজন হইলে সে সকল স্থানেরও ইতিহাস জানাইতে পারিব।

উদয়পুরের যে কয়েকখানা ফটোগ্রাফ আছে, তাহার বিবরণ লিখিয়া ইহার পর, তাহা আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব।

রাজরত্নাকরে গোবিন্দমাণিক্যের ও তাঁহার ভ্রাতা ছত্রমাণিক্যের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা নকল করানো হইয়াছে, সত্বর ছাপানো যাইতে পারে কিনা, উদ্যোগ করিতেছি। মুদ্রাঙ্কন শেষ হইলে আপনার নিকট পাঠানো যাইবে।* 'রাজর্ষির' কোন্ কোন্ স্থলে ইতিহাস রক্ষিত হয় নাই, তাহা রাজরত্নাকরের উক্ত উদ্ধৃত ভাগ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

'রাজরত্নাকর' ছাপাইবার উদ্যোগে আছি, সমুদয় আয়োজন হইয়া উঠে নাই। যদি ইশ্বর ইচ্ছায় ছাপা হইতে পারে তবে আপনাকে একখণ্ড পাঠাইয়া দিব।

রাজরত্নাকরে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক দুই ভাগ আছে. পৌরাণিক ভাগে মহারাজ দৈত্য প্রভৃতির জীবনচরিত এবং ঐতিহাসিক ভাগে যখন বাঙ্গালা যবনাধিকারে ছিল — সেই সময়ের অনেকানেক ভাগ নিতান্ত সুন্দর। সেই অংশ অবলম্বন করিয়া আপনি নবন্যাস লিখিলে অপেক্ষাকৃত অনেক প্রশংসনীয় হইবে, এরূপ আমার বিশ্বাস।

এথাকার কুশল, আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীণ নিরাময় সংবাদ দানে সুখী করিবেন, ইতি। ১২৯৬ ত্রিপুরা—তাং ১৮ই জ্যৈষ্ঠ।

প্রণত—

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা।

---

* এই মুদ্রিতাংশ আমাদের হস্তে আছে. নিষ্প্রয়োজন বোধে তাহা এ স্থলে প্রদান করা হইল না। আগরতলা 'কিশোর' সাহিত্য সমাজের অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথও এই মুদ্রিত বিবরণ প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

উদ্ধৃত পত্রদ্বয়ের একটী ভাব বিশেষ লক্ষ্যণীয়। রবীন্দ্রনাথের পত্রে, তাঁহার নাম স্বাক্ষরের পূর্ব্বে "প্রণত' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি মহারাজকে পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন, এজন্যই ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয় নরপতির প্রতি ঐরূপ শব্দ প্রয়োগে দ্বিধাবোধ করেন নাই। পক্ষান্তরে, মহারাজ বীরচন্দ্র দেব-দ্বিজে অসাধারণ শ্রদ্ধাবান ছিলেন, সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে স্নেহভাজন জ্ঞান করিলেও স্বীয় নাম স্বাক্ষরের পূর্ব্বে "প্রণত" শব্দের প্রয়োগদ্বারা ব্রাহ্মণ্য-মর্য্যাদা পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়াছেন। সমাজে এরূপ মধুর ভাবের আদান প্রদান অতি অল্পই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

'রাজরত্নাকর' গ্রন্থের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা সন্দেহের ভাব পোষণ করেন, মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের পত্র পাঠ করিলে তাঁহাদের সন্দেহ নিরাসিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

উদ্ধৃত পত্রদ্বয়ের সহিত 'রাজর্ষি' উপন্যাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং 'রাজর্ষি' দ্বারা মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের মধুর চরিত্র বিশ্লিষ্ট হইয়াছে, এই কারণেই গোবিন্দমাণিক্য প্রসঙ্গে সেই সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করিতে হইল। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জ্জন' নাটকও মহারাজ গোবিন্দের চরিত্র অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের সময় হইতে ত্রিপুরার রাজা ও রাজপরিবারের সহিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, তাহা অল্প কথায় বলা যাইতে পারে না, বিশেষতঃ এস্থলে বলিবার নহে। শ্রীভগবানের কৃপায় যদি মহারাজ বীরচন্দ্রের এবং তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণের বিবরণ বর্ণনের সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে, তবে তৎকালে এ বিষয় আলোচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের ন্যায় তদীয় মহিষী মহারাণী গুণবতী মহাদেবীও ক্ষমাশীলা এবং দয়ার্দ্রহৃদয়া ছিলেন। তিনি রিয়াং সম্প্রদায়ের প্রতি যে অপরিসীম দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সুপ্রাচীন প্রথানুসারে ত্রিপুরেশ্বরগণ প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে নদীর উপর গঙ্গাপূজা করিয়া থাকেন। এই পূজা উপলক্ষে, পূজার সাত দিবস পূর্ব্বে মুলী বাঁশের বেতীদ্বারা পাকানো রজ্জুর দুই মাথা নদীর দুই পাড়ে বন্ধন করিয়া নদীপথ রুদ্ধ করা হয়। পূজা সমাপ্তির পূর্ব্বে সেই রজ্জু ছিন্ন বা অপসারণ করা নিষিদ্ধ। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের শাসনকালে একদা গঙ্গাপূজার নিমিত্ত গোমতী নদীর জলপথ পূর্ব্বোক্তরূপে বন্ধ করা হইয়াছিল। এই সময় রিয়াংগণ বিস্তর মুলী বাঁশ ভেলা বাঁধিয়া বিক্রয়ার্থ নদীস্রোতে ভাসাইয়া নিতেছিল, দৈবযোগে সেই ভেলা খরস্রোতে প্রবলবেগে আসিয়া, জলপথ অবরোধক রজ্জু ছিন্ন করিয়া ফেলে। রিয়াংগণ বহু চেষ্টায়ও ভেলার বেগ সম্বরণ করিতে সমর্থ হইল না। এই সূত্রে রাজকর্ম্ম-

রিয়াং সম্প্রদায়ের প্রতি মহারাণী গুণবতী মহাদেবীর দয়া